তাজের স্বপ্ন

তাসের ফাঁদ

নারায়ণ সান্যাল

সাহিত্য প্রকাশ
৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা অগ্রহায়ণ ১৩৬৩

প্রকাশক ঃ প্রবীর মিত্র ঃ ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট ঃ কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ ঃ গৌতম রায়

মুদ্রাকর ঃ শ্রীবাদলচন্দ্র পাল ঃ এস্ এম্ প্রিন্টিং ঃ ১৯ডি, গোয়াবাগান স্ট্রীট ঃ
কলিকাতা-৬

হিন্দি চলচ্চিত্র জগতে মহারথীর অভাব নেই, অভাব সারথীর।
সে অভাব পূরণ করছেন যিনি, সেই দরদী শিল্পরসিক বোম্বাই প্রবাসী

শ্রীহৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়কে

কালো রঙের সিডান-বডি গাড়িটা বড় রাস্তা ছেড়ে স্টেশনের প্রবেশপথে পোর্টিকোর নিচে এসে অবশেষে থামল।

ভাল করে তখনও ভোর হয়নি। কুয়াশার অবগুণ্ঠনে দূরের গাছপালা সব অস্পষ্ট। রাস্তার ধারে একপায়ে-খাড়া বিজলি বাতিগুলো রাত-চরা মাতালের ঘোলাটে চোখ মেলে চেয়ে আছে ঘন কুয়াশার দিকে। তারই আবছা-আলোয় সামনের দিকে কিছুটা পর্যন্ত নজর চলে। পুব-আকাশের একটা কোণা ক্রমশঃ ফর্সা হয়ে আসতে শুরু করেছে। রাত-আঁচলের আড়ালে যা-কিছু সঙ্গোপন ছিল, ক্রমে ক্রমে রূপে-রেখায় তা ফুটে উঠতে শুরু করেছে, এখানে-ওখানে। গাড়ির কাচে জমেছে শিশির,—চিক্‌চিক্ করছে স্টেশন-বাড়ির প্রতিফলিত আলোয়। মিউনিসিপ্যালিটির ঝাড়ুদারের দল নাকে ফেট্টা জড়িয়ে ধুলোর ঝড় তুলেছে রাস্তায়।

কালো গাড়িখানায় তিনজন যাত্রী, ড্রাইভার ছাড়া। চালকের পাশে মাঝ বয়সী একজন ভদ্রলোক। সর্বাঙ্গ কালো ভারকোটে ঢাকা। কানের পাশে চুলগুলোয় পাক ধরেছে। পিছনের সীটে একজন সুটধারী বৃদ্ধ। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল চেহারা। দেখলেই বোঝা যায় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। গুরুদায়িত্ব বয়ে বেড়াবার মত ব্যক্তিত্ব আছে তাঁর চেহারায়। একমাথা প্ল্যাটিনাম-রঙা সাদাচুল, পিছনে ফেরানো। ঠোঁট দুটি চাপা, গোঁফ-দাড়ি কামানো। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়েছিলেন পাশে-বসা গাড়ির তৃতীয় যাত্রীটির দিকে।

স্টেশনচত্বরে গাড়ি এসে দাঁড়ায়। ওঁরা নামলেন। ট্রেন আসার সময় হয়েছে। শীতের সকাল। কলগুঞ্জন জেগেছে শীতকাতুরে স্টেশনের বুকে। মাথামুখ পাগড়ির ফেট্টিতে ঢাকা জন-দুই কুলি এগিয়ে আসে গাড়ির দিকে। ড্রাইভার পিছনের কেরিয়ারের ঢাকনাটা খুলে দেবার উপক্রম করতেই রাশভারী বৃদ্ধ ভদ্রলোক হঠাৎ সেই তৃতীয় যাত্রীটির দিকে ফিরে বলেন, এর ভিতর কি আছে প্রিয়?

বৃদ্ধ যাকে প্রিয় সম্বোধন করলেন, গাড়ির সেই তৃতীয় যাত্রীটির চেহারাখানা দেখবার মত। সুন্দর, সুগঠিত ইত্যাদি বিশেষণে যেন তার আকৃতির

বৈশিষ্ট্যটাকে পুরোপুরি বোঝানো যাবে না। দীর্ঘায়ত পেশীবহুল দেহাবয়বের উপর মুখখানা বেমানান; বেমানান এজন্য যে, তার পিঙ্গল অবিন্যস্ত চুলে, তার উদাস অর্থহারা চাহনিতে কেমন যেন একটা কৈশোরের ছাপ। যেন মনটা তার যথেষ্ট পরিণতি লাভ করেনি দেহের সঙ্গে। তার দৃষ্টি যেন প্রত্যক্ষকে দেখছে না, প্রত্যক্ষকে পার ক'রে দেখছে। যেন রীতিমত ছেলেমানুষ সে। গাড়ি থেকে নেমে একপাশে দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে কী যেন ভাবছিল এতক্ষণ; দীর্ঘ আট বছর পর এ দেশ ছেড়ে চিরদিনের মতো চলে যেতে হচ্ছে তাকে; তাই বোধহয় ভাবাবেগে একটু অভিভূত হয়ে পড়েছে। বৃদ্ধের হঠাৎ প্রশ্নে একটু বিব্রত বোধ করে। গলার টাইটা ঠিক করে নিয়ে বলে, আমার হোল্ড-অল, ট্রাঙ্ক, এ্যাটাচি-কেসটা, আর ও হ্যাঁ, আমার পেইন্টিং কিট্‌স্।

—ফুল-মার্কস্!—হেসে ওঠেন বৃদ্ধ, পাইপটা ধরাতে ধরাতে।

ওঁর চোখের ইঙ্গিতে ড্রাইভার ততক্ষণে খুলে ফেলেছে পিছনের ঢাকনাটা। কুলিরা মালপত্র তুলছে মাথায়। জলন্ত দেশলাইয়ের কাঠিটা পায়ের নিচে পিষে ফেলে দিয়ে বৃদ্ধ এবার ওভারকোটের পকেট থেকে বার করে আনেন একটা মোটা ওয়ালেট। তার গায়ে ছোট্ট সোনালী অক্ষরে লেখা ডাঃ ভি. সদারঙ্গনী। এম, ডি; এম, এম, এস, এন, অক্ষরগুলো লেখা নেই তাতে। একগোছা একশটাকার নোটের ভিতর থেকে খান-দুই নোট বার করে প্রিয়র দিকে এগিয়ে ধরে বলেন, দিল্লীর একখানা টিকিট কিনে আনো।

মাঝবয়সী অবাঙালী ভদ্রলোকটি সসম্ভ্রমে এগিয়ে আসেন; আমাকেই দিন স্যার, আমি টিকিট কেটে আনছি।

ডাঃ সদারঙ্গনী কোন জবাব দিলেন না! ভৎর্সনাপূর্ণ দৃষ্টিতে শুধু একবার তাকালেন সহকর্মীর দিকে।

প্রসারিত হাতটা টেনে নিয়ে অপ্রস্তুত এ্যাসিসটেন্টটি অস্ফুটে শুধু বলেন—আয়াম সরি।

টাকাটা প্রিয়ই নিল হাত বাড়িয়ে। গট্ গট্ করে এগিয়ে গেল স্টেশন-কাউন্টারের দিকে। স্টেশনের বড় ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখল একবার। দেখল চেয়ে দেরিতে-আসা ট্রেনের খবর-লেখা কালো-বোর্ডটার দিকে। ঠিক সময়েই আসছে ট্রেন। সহজ গতিতে এগিয়ে গেল কাউন্টারের দিকে।

পাশাপাশি দুটি খোপ। কি যেন ভাবল এক মুহূর্তে, তারপর এগিয়ে গেল আপার ক্লাস-লেখা খোপটার দিকে। সেকেণ্ড ক্লাস টিকিট চাইল একখানা। নয়াদিল্লীর। টিকিট এবং চেঞ্জ পরখ করল, গুণে দেখল ভাঙানি নোটগুলো।

অবশেষে যখন ফিরে এল ওঁদের কাছে ততক্ষণে কালো-গাড়িটা পার্ক করা হয়ে গেছে। স্টেশনে ঘন্টি বাজল, আগের স্টেশন ছাড়িয়েছে প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা। মালপত্র নিয়ে কুলিরা চলে গেছে ভিতরে। ওর সঙ্গে যে দুজন এসেছেন ওকে ট্রেনে তুলে দিতে তাঁরা অপেক্ষা করছেন কোলাপ্‌সিব্‌ল্‌ গেটের কাছে।

এতক্ষণে প্রিয় টিকিটখানা সযত্নে রেখেছে তার বুক পকেটে।

ভাঙানি টাকার নোটের বাণ্ডিল ডাঃ সদারঙ্গনীর হাতে দিয়ে হেসে বলে, আজ তাহ'লে নিতান্তই চললাম স্যার?

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বৃদ্ধ নির্বিকারভাবে সংক্ষেপে শুধু বলেন, নো!

প্রিয় চম্‌কে ওঠে। ওর অর্ধস্ফুট ওষ্ঠাধর ভেদ করে বেরিয়ে আসে যে শব্দটা ছাপার অক্ষরে তার অভিধা—'?'

ডাক্তার সদারঙ্গনী শুধু বলেন, কুলিদের ডাক, টিকিটখানা ফেরত দাও।

আর কিছু বলেন না। জোরে জোরে পা ফেলে বেরিয়ে যান প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে—সোজা গিয়ে বসেন কালো-রঙের সেই গাড়িখানার পিছনের সিটে। প্রিয় রীতিমতো হতাশ হয়েছে। মাথার পিঙ্গল অবিন্যস্ত চুলগুলোর মধ্যে আঙুল চালিয়ে কি-যেন ভাবল খানিক; মাঝবয়সী ভদ্রলোকের দিকে ফিরে বললে, কী হ'ল বলুন তো ত্রিবেদী সা'ব?

ত্রিবেদী হাত দুটো উল্‌টে দিয়ে কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিলেন শুধু। অর্থাৎ ভাবখানা—কি জানি!

কিন্তু ওঁরা দুজনেই জানতেন এ আদেশ অমোঘ। এর আর নড়চড় নেই, আজ যাত্রা স্থগিত রাখতে হবে—কারণটা যাই হোক-না কেন। ফিরিয়ে আনা হল কুলিকে। ফেরত দেওয়া হল টিকিটখানা। ফেলের-খবর-পাওয়া ছাত্র যেমন মুখ নিচু করে মাথা গলায় বাড়ির খিড়কির দরজায়—তেমনিভাবে মাথা নিচু করে প্রিয়দর্শী গুটি গুটি আবার গাড়িতে উঠে পড়ে। ডাক্তার-সাহেবের পাশের আসনে নিশ্চুপ গিয়ে বসে। চোরা-চাহিনিতে একবার তাকিয়ে দেখে তাঁর দিকে। গম্ভীরভাবে বসে আছেন তিনি—সামনের দিকে তাকিয়ে। আবার মালপত্র ওঠানো হল পিছনের কেরিয়ারে। প্ল্যাটফর্মকে পিছনে ফেলে গাড়ি ফিরে চলে পিচমোড় সড়ক ধরে এঁকে বেঁকে।

বাইরেটা এতক্ষণে বেশ ফর্সা হয়ে এসেছে। মানুষজনের চলাচল শুরু হয়েছে ঝিমন্ত-রাস্তার বুকে। পিচমোড়া সড়ক ছেড়ে ক্রমে গাড়ি নামল লাল কাঁকরে রাস্তায়। অবশেষে এসে থামল সেই চিরপরিচিত বড় গেটটার সামনে, যার দু-পাশের দুটি পিলারকে যুক্ত করে খাড়া করা আছে একটি সাইন-বোর্ডের

সাঁকো—করুণাময়ী স্যাঙচুয়ারি।

দ্বারপাল ছুটে এসে সেলাম করে; তালা খুলে গাড়িটাকে ঢুকবার জন্য উন্মুক্ত করে দিল লোহার গেটটা। পাঁচিল-ঘেরা কম্পাউণ্ডে গাড়িটা প্রবেশ করা মাত্র আবার বন্ধ হয়ে গেল লোহার গেট।

সেই পরিচিত পরিবেশ। দারোয়ানের গুমটি, লাল কাঁকরে রাস্তা, ফুলের কেয়ারি, পাম আর লতাবাহারের টব। বাগানে খানকয়েক কংক্রিটের বেঞ্চ পাতা। ডানদিকের পথটা চলে গেছে প্রধান বাড়িটার দিকে। একতলায় থাকেন অতিথিরা। অফিসও সেখানে। দ্বিতলে ডাক্তার সদারঙ্গনীর কোয়ার্টার্স এবং লাইব্রেরী। দ্বিতল বাড়িটাকে বাঁ হাতে রেখে এগিয়ে গেলে একটা বাঙলো-প্যাটার্ণ এতকলা টালির বাড়ি। প্রিয়দের ডর্মিটারি। তারই সামনে এসে অবশেষে গাড়িটা থামল। প্রিয় এতক্ষণ কোন প্রশ্ন করেনি, বারে বারে চোরা চাহনিতে দেখছিল নির্বিকার ডাক্তার-সাহেবকে। মালপত্র নামানো হচ্ছে দেখে আর থাকতে পারল না। বললে, স্যার?

তার চোখের দৃষ্টিতে যে প্রশ্নটা ফুটে উঠল তারই জবাবে বৃদ্ধ বললেন, এক নম্বর, তুমি কুলির নাম্বার প্লেট লক্ষ্য করনি; দু-নম্বর, তুমি যখন টিকিট কাটতে গেলে তখন লক্ষ্য করনি কুলিটা মালপত্র নিয়ে কোনদিকে চলে গেল; তিন নম্বর, আজ দুজন ভদ্রলোক তোমাকে সী-অফ্ করতে স্টেশানে গিয়েছিলেন—তোমার উচিত ছিল তাঁদের জন্য দু'খানি প্ল্যাটফর্ম টিকিট কেনা। তাই নয়?

অপরাধীর মত মাথা নিচু করে প্রিয়দর্শী বলে, ঠিককথা, আয়াম রিয়ালি সরি, স্যার।

—বেটার ল্যাক্ নেক্সট্ টাইম!—ওর পিঠটা চাপড়ে ডাক্তার-সাহেব এগিয়ে গেলেন দ্বিতল বাড়িটার দিকে। সহকর্মী ত্রিবেদী সাহেবও গেলেন পিছু পিছু। গাড়ি গ্যারেজে উঠল।

আবার একটি দিনের মত পিছিয়ে গেল যাত্রা। প্রিয়দর্শী ফিরে এল কলকোলাহল-মুখর সেই পরিচিত ডার্মিটারিতে।

নাম 'করুণাময়ী স্যাঙচুয়ারি' হলেও এটা যে আসলে একটা উন্মাদ-আশ্রম প্রিয়দর্শী তা বুঝতে শিখেছে অনেকদিন। প্রথম যখন এখানে আসে, সে আজ বছর আষ্টেক আগেকার কথা, তখন অবশ্য এত কথা ভাববার মতো মানসিক অবস্থাই ছিল না ওর। ক্রমে ক্রমে সে অনেক কিছুই বুঝতে শিখেছে। ও জানে ঐ দ্বিতল বাড়িটার একতলার যারা থাকে তাদের অবস্থা অনেক খারাপ।

তাদের মানসিক অবস্থার পারদচিহ্ন স্বাভাবিকতার অনেক নিচে। ঐ বাড়ির দ্বিতলে থাকেন ডাক্তার সদারঙ্গনী, এ আশ্রমের যিনি প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণ। বিশেষজাতের রোগীদের রাখেন কাছে কাছে, সর্বদা যেন তাঁদের চোখে চোখে রাখেন। যারা ক্রমশঃ সেরে ওঠে তাদের স্থানান্তরিত করা হয় সংলগ্ন ডর্মিটারিতে। তিন কামরার বাঙলো-প্যাটার্ণ টালির বাড়িটায়। প্রতি ঘরে তিনজন করে রোগী। না রোগী নয়, রোগী শব্দটায় ডাক্তার-সাহেবের ঘোর আপত্তি! প্রতি ঘরে তিনজন করে আবাসিক। এই ডর্মিটারিতেই প্রিয়দর্শী আজ তিন-চার বছর বাস করছে। সেখানেই পায়ে পায়ে ফিরে আসে। সামনের বাগানে বেতের চেয়ারে শীতের রৌদ্রে মিস্টার পাণ্ডে ইংরাজি দৈনিক সংবাদপত্র পড়ছিলেন একাগ্রভাবে। দুনিয়ার যাবতীয় খবর পাণ্ডে-সাহেবের নখাগ্রে। দু-তিনখানা দৈনিকপত্র তাঁর পাশে থাক দেওয়া। একে একে সবগুলিই পড়বেন তিনি। আদ্যন্ত। তারপর লাল-নীল পেনসিলে দাগ দেওয়ার পালা। প্রিয় জানে, তারপর কাগজগুলো গুটিয়ে নিয়ে উনি যাবেন নিজের ঘরে। কাঁচি দিয়ে বিশেষ বিশেষ সংবাদগুলি কেটে আটা দিয়ে সেঁটে রাখবেন তাঁর বিভিন্ন ফাইলে। পাণ্ডে-সাহেব পূর্বজীবনে ছিলেন সাংবাদিক।

ভেঙ্কটেশ্বরম্‌ও তাঁর নিত্যকর্মপদ্ধতিতে নিযুক্ত। খুরপি, জলের ঝারি, কোদাল নিয়ে বাগানে নেমে পড়েছেন। বাগান করার সখ ভেঙ্কটেশ্বরমের। আপন খেয়ালে গাছ-গাছড়া নিয়ে আছেন। তাদের সঙ্গেই তাঁর সুখদুঃখের গল্প। আপন মনে একটা চারাগাছকে কি যেন বোঝাচ্ছিলেন তিনি। গাছের চারাটা মাদ্রাজী ভাষা যতটা বোঝে প্রিয়দর্শী তার চেয়ে বেশী বোঝে না। হল্‌-কামরা থেকে গানের সুর ভেসে আসছে; রেডিও বাজছে সেখানে। গানের দিকে কান নেই কারও, থাকেও না। একমাত্র ব্যতিক্রম পাণ্ডে-সাহেব। তিনিই রেডিওটা খুলেছেন। অবশ্য তিনিও শুনছিলেন না, তিনি শুধু অপেক্ষা করছিলেন গানটা কখন থামবে। গান থামলেই শুরু হবে নিউজ। ওটা তাঁর শোনা চাই-ই।

বাগানের ওপ্রান্তে একটা ভাঙ্গা মোটর-গাড়ির সম্মুখভাগটুকু দেখা যাচ্ছে। শুধু ড্রাইভারের সীটটা আছে, সামনের চাকা দুটো কাদায় পোতা। দূর্বাঘাস জন্মেছে রবার-টায়ারহীন মরচে-ধরা লোহার রিমদুটো ঘিরে। গাড়িটার পশ্চাদভাগ নেই। ঐ ড্রাইভারের ছোবড়া-ওঠা গদিতে বসে আছেন মিস্টার ডেভিড। প্রাত্যহিক কাজে লেগে গেছেন সকালবেলাতেই। ফুলস্পিডে গাড়ি চালাচ্ছেন তিনি, ষ্টিয়ারিঙ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। মুখ দিয়ে শব্দ

করছেন অদ্ভুতভাবে—প্রচণ্ড বেগে গাড়ি চলার শব্দ। মাঝে মাঝে নিজেকেই উৎসাহ দিচ্ছেন আবার—বাক্ আপ্ ডেভিড! চিয়ারিও!

বারান্দাটা অতিক্রম করে প্রিয়দর্শী অবশেষে এসে পৌঁছাল তার নিজের ঘরে। ইতিপূর্বেই তার মালপত্র চলে এসেছে ওর সীটে। প্রিয়র প্রত্যাবর্তনে ঘরের বাকি দুজন বাসিন্দা কিন্তু বিচলিত হলেন না বিশেষ। অবিনাশবাবু, ওর রুমমেট একবার মুখ তুলে দেখলেন শুধু—তারপর আবার নির্বিকারভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন খাতায়। অতি মনোযোগের সঙ্গে কি-যেন লিখে চলেছেন উনি একটা বাঁধানো খাতায়। ওদের তিন-বাসিন্দা কামরার তৃতীয় আবাসিক মিস্টার ভাণ্ডারী এই সাত-সকালেই রান্না চড়িয়েছেন। আলু-মূলো-কপি-টম্যাটো বিছিয়ে বসেছেন তরকারি কুটতে। পাশেই স্টোভে বসিয়েছেন ভাতের ডেক্‌চি। ভাত ফুটছে তাতে। উপকরণের কমতি নেই। হাতা-খুন্তি-সাঁড়াশি, চাল-ডাল-নুন-তেল। সাত সকালেই ওঁকে রান্না বসাতে হয়। ব্যাচিলর মানুষ—সকাল সকাল স্নপাক দুটি নাকে-মুখে গুঁজে নটার মধ্যে অফিস যেতে হয় তাঁকে। বহুদিনের অভ্যাসটা আজও ছাড়তে পারেন নি। অফিস বসে অবশ্য দশটায়; কিন্তু ঘণ্টাখানেক আগেই উনি বরাবর অফিসে হাজিরা দেন। নিরিবিলিতে গতকালকার এরিয়ারগুলো সেরে ফেলতে সুবিধা হয় তাতে। তাছাড়া অন্যান্য কর্মচারীদের কাজটা বণ্টনও করে রাখেন অফিস বসার আগেই। যাতে ওরা এসেই কাজে বসে যেতে পারে। অত্যন্ত নিয়মানুগ পদস্থ কর্মচারী ভাণ্ডারী-সা'ব।

প্রিয় নিজের খাটে গিয়ে বসে। সেই ছোট্ট ঘরখানি। তিনদিকে তিন-খানা খাট পাতা, তিনটি টেবিল, তিনটি চেয়ার। তিনজনের আলাদা লকার। সেই পুবের জানলা দিয়ে ঘরে এসেছে সকালের রোদ। এই ঘরে ঐ দুজন প্রতিবেশীকে জড়িয়ে তার সংক্ষিপ্ত জীবনের তিন-তিনটে বছর কেটে গেছে। তার আগে আরও বছর চার-পাঁচ ছিল দ্বিতল বাড়িটায়। কাল রাত্রে বিদায়ের প্রস্তুতি হিসাবে যখন জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছিল তখন কেমন যেন একটা মমতাবোধ জেগেছিল করুণাময়ী আশ্রমের এই ছোট্ট ঘরখানির জন্য। আফটার-কেয়ার ডর্মিটারির এই তিন-বাসিন্দা টালির ঘরখানির জন্য। একে ছেড়ে যেতে কেমন যেন মন সরছিল না। অথচ এই ঘরে ফিরে এসেও তার ভাল লাগল না। আজ সকালে যখন যাত্রা করে, অবিনাশবাবু তখন অঘোরে ঘুমাচ্ছেন। ভাণ্ডারী-সাহেব অবশ্য তার আগেই উঠেছিলেন। খুব ভোরে ওঠা ওঁর অভ্যাস—না হ'লে একা-হাতে নটার মধ্যে রান্না-খাওয়া সেরে ঠিক

সময়ে অফিসে হাজিরা দেওয়া কি সোজা কথা? যাওয়ার সময় ভাণ্ডারীর দুটি হাত ধরে প্রিয়দর্শী বলেছিল, চললাম।

ভাণ্ডারী জবাবে বলেছিলেন, বেশ, বেশ! বড়সাহেবকে বলবেন আমার ট্রান্সফারের কথাটা।

প্রিয় ঘাড় নেড়ে বলেছিল—বলব। আপনিও অবিনাশদাকে বলবেন আমি চলে গেছি।

ভাণ্ডারীও বলেছিলেন, বল্‌ব।

অথচ ওকে ফিরে আসতে দেখে দুজনের কেউই বিশেষ বিচলিত হলেন না। এতদিনের রুমমেটের যাত্রা স্থগিত রাখতে হয়েছে শুনে ওঁদের কেউ উৎফুল্ল হয়েছেন কিনা তাও বোঝা গেল না। অবিনাশের কলম চলতেই থাকে খস্ খস্ করে। ভাণ্ডারী ভাতের ঢাকনাটা খুলে হাতা দিয়ে নেড়ে দেন—তলাটা না ধরে যায়। একটু জল ঢেলে দেন পিতলের ঘটি থেকে।

রামদাস প্রাতরাশ নিয়ে এল। প্রিয়দর্শীকে দেখে সে কিন্তু সত্যই খুশী হয়ে ওঠে, বলে, ফিন লৌটায়া?

প্রিয়দর্শীও এতক্ষণে খুশী হয়ে উঠবার সুযোগ পায়। তার প্রত্যাগমনে তাহলে অন্তত একজন খুশী হয়েছে। বলে, হ্যাঁ রামদাস, আজ ফেল হয়ে গেলাম! কার আবার চেষ্ট করে দেখা যাবে।

টোস্ট-পোচ আর চায়ের সরঞ্জাম নামিয়ে রেখে রামদাস সহানুভূতি দেখায়, কাল হো জা'গা সায়েদ্।

মিস্টার ভাণ্ডারীকে ডাকা বৃথা, তিনি প্রাতরাশ খান না। সকাল নটার মধ্যে ভাত খেয়ে যাকে অফিস ছুটতে হয়, তার আবার প্রাতরাশ! প্রিয়দর্শী ডাকে, অবিনাশদা, সকালে কিছু খেয়েছেন নাকি?

বাঁ হাতটা তুলে অবিনাশবাবু ওকে গোল করতে বারণ করেন। রামদাস বলে, উন্‌হিকো' বাস্তে লায়া থা, আপ্‌কা নাস্তা আভি লাদেতা হুঁ।

প্রিয় অবিনাশবাবুকে তাগাদা দেয়, আরে বন্ধ করুন আপনার লেখা। আসুন, খেয়ে নেবেন আসুন।

—আহ্! বিরক্ত হয়ে উঠে আসেন অবিনাশ সেন। প্রৌঢ় মানুষ, লম্বা ব্যাকব্রাশ চুল, ছোট্ট কপাল, ঘোলাটে দৃষ্টি! কলমটা বন্ধ করে উঠে আসেন, বলেন—দিলেন তো মুডটা নষ্ট করে?

সে কথার জবাব না দিয়ে প্রিয় বলে, আজও আমার যাওয়া হলনা অবিনাশদা।

অবিনাশ টোস্টে একটা কামড় দিয়ে প্রশ্ন করেন, কোথায় ?

—বা-রে ! কালকে আপনাকে বললাম না সব কথা ? বললাম না যে, আমাকে এরা ছেড়ে দিচ্ছে, আমি চিরদিনের মতো চলে যাচ্ছি ?

হো হো করে হেসে ওঠেন কবি অবিনাশ সেন, বলেন, বদ্ধ পাগল মশাই আপনি। এখনও বিশ্বাস করেন ঐ বুড়ের কথায় ? সদারঙ্গনী আসলে একটি বাস্তুঘুঘু। মিথ্যা স্তোকবাক্যে ভুলিয়েছে আপনাকে। ওর নামে একটা কবিতা লিখেছি শুনবেন ?

প্রিয়দর্শী জবাব দেয় না। জানে, জবাব দেওয়া বৃথা। গত চার বছরে অন্তত চার হাজার কবিতা শুনতে হয়েছে তাকে। সবই অবিনাশের স্বরচিত। আপত্তি করে লাভ নেই, সম্মতি জানাবারও প্রয়োজন নেই। কবি অবিনাশ সেন অভুক্ত প্লেটটা সরিয়ে রেখে টেনে নেন কবিতার খাতাখানা।

দেখতে দেখতে কেটে গেল শীতের ছোট্ট দিনটা।

পরদিন প্রত্যুষে আবার নবোদ্যমে তৈরি হয়ে নিল প্রিয়দর্শী ! আজ আর একসঙ্গে নয়। একটা ট্যাক্সিতে ওঠানো হল ওর মালপত্র। ডাক্তার সাহেব বসলেন পিছনের কালো গাড়িটায়। সেটা চলল পিছু পিছু। প্রিয় নিজের মনে বলে, আজ আর কোন ভুল করব না আমি, কিছুতেই না।

সেই ছায়া-ছায়া কুয়াশা। ঘোলাটে দৃষ্টিমেলা একপায়ে-খাড়া ল্যাম্প পোস্টের সারি। ট্যাক্সির কাচে জমা শিশির চিক্ চিক বিজলি বাতির প্রতিফলিত আলো। প্রিয় গম্ভীরমুখে বসে আছে ড্রাইভারের পাশে।

ট্যাক্সি এসে দাঁড়ায় স্টেশন-চত্বরে। মিটার দেখে ভাড়া মিটিয়ে দেয়। কুলিতে মালপত্র নামায়—কুলির নম্বর লক্ষ্য করতে ভুল হয় না আর আজ। ভুল করে না প্লাটফর্ম টিকিট কাটতে। কুলির পিছন পিছন ওরা তিনজনে এসে প্রবেশ করে বিশ্রামাগারে। ডাক্তার সদারঙ্গনী বলেন, গাড়ি কি লেটে আসছে নাকি ?

প্রিয় হেসে বলে. না স্যার, লক্ষ্য করেছি তাও ; রাইট টাইম।

বৃদ্ধও হাসলেন ওর হাসির ধরন দেখে।

বিশ্রামাগারের প্রবেশপথে উঁকি মারে—চাগর্ম্।

—চা খাবেন নাকি স্যার, যা শীত !

—খাওয়াও এককাপ !

তিন পেয়ালা চায়ের বরাত দিল প্রিয়। মনি-ব্যাগ খুলে পয়সা মিটিয়ে দেয়। ব্যাগটা বন্ধ করে পকেটে রাখবার সময় দেখে নিল টিকিটটা ঠিক আছে

কিনা। বৃদ্ধ একটা সিগার ধরলেন। একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, সত্যিই চল্‌লে তাহ'লে ?

প্রিয় আবার হেসে বলে, সেটা আপনার উপর নির্ভর করছে এখনও।

—আমার উপর ? কেন ?

—এখনই বলে বসতে পারেন, ফিরে চল, তুমি অনেক কিছু লক্ষ্য করনি, এক নম্বর কুলিটার বাঁ-চোখটা ট্যারা কিনা, দু-নম্বর টিকিটবাবু উল্টো করে জামার বোতাম লাগিয়েছেন কিনা, তিন নম্বর চা-গরমের চিবুকে একটা জরুল-চিহ্ন আছে কিনা !

প্রাণখোলা হাসি হাসলেন ডাক্তার-সাহেব। প্রিয়র পিঠে একখানা হাত রেখে বলেন, না, আর ভয় নেই। তুমি একেবারে স্বাভাবিক। তুমি একজন নর্মাল মানুষ। এবার নির্ভয়ে এগিয়ে যাও সামনের পথে, মাথা উঁচু করে, বুক টান করে। কিন্তু তোমাকে যা যা বলেছি, সব মনে আছে তো ?

ঘাড় নেড়ে প্রিয় জানায়, আছে।

—প্রেমচাঁদ সিংজীকে যে চিঠিখানা দিয়েছি যত্ন করে রেখেছ তো ?

এবারও প্রিয়দর্শী নীরবে ঘাড় নেড়ে সায় দেয়।

ট্রেনের ঘণ্টা বাজল। একটু ইতস্ততঃ করে শেষ পর্যন্ত মনস্থির করে ফেলেন। বলেন, একটা কথা তোমাকে বলা হয়নি। আজ না হোক, কিছুদিন পরে হয়তো তোমার মনে কতকগুলো প্রশ্ন জাগবে। আমাদের শাস্ত্রে বলে, সে সব প্রশ্ন যতদিন তোমাব মনে না জাগছে ততদিন তা অযাচিত তোমাকে জানানো ঠিক নয়। অথচ হয়তো তোমার মনে যেদিন সে সব প্রশ্ন জাগবে সেদিন আমাকে কাছে পাবে না। ওদিকে কি দেখছ ? তুমি আমার কথা শুনছ না। শোন এদিকে—

প্রিয়দর্শী মুখ ফেরায় না। কিন্তু নেতিবাচক ভঙ্গিতে মাথাটা নাড়ে।

ডাক্তার সাহেব ওর হাতটা টেনে নিয়ে বলেন, অমন মনমরা হয়ে পড়েছ কেন ? আজ তো তোমার আনন্দের দিন !

অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করে প্রিয়দর্শী বলে, একটা কথা বল্‌ব স্যার ?

ডাক্তার সাহেব হেসে বলেন, একটা ছেড়ে একশটা কথা বল না, কে আপত্তি করছে ? কিন্তু মুখখানা অমন প্যাঁচামার্কা করে রেখেছ কেন ?

—আপনি আমাকে চিঠিপত্র লিখতে বারণ করলেন কেন ?

ডাক্তারবাবু একেবারে লাফিয়ে ওঠেন, আরে বাপ্‌স ! না, না, ও সব সৌখীন সখ আমার নেই। পেন-ফ্রেণ্ড শব্দটাতেই আমার কেমন একটা

এ্যালার্জি আছে। কারও চিঠি এলেই আমার কেমন গা-হাত-পা-চুলকায়।

প্রিয়দর্শী গম্ভীর হয়েই বলে, এ সব কৌতুক আপনি আগেও করেছেন। কারণটা না জানাতে চান, বেশ থাক্।

সদারঙ্গনী এবার হাসি থামিয়ে বলেন, তুমি তো দেখেছ কত ব্যস্ত থাকতে হয় আমাকে। সময়ই পাই না। অপ্রয়োজনে চিঠির কাগজে খেজুরে আলাপ করার মত আমার সময় কোথা ?

—আমি তো বলিনি আপনাকে জবাব দিতে হবে। কিন্তু আমি যদি মাঝে মাঝে চিঠি লিখে আমার খবরাখবর জানাই তাতে আপনার এত আপত্তি কেন ? চিঠি পড়তে আর কতটুকু সময় লাগে ?

একমুহূর্ত চুপ করে থাকেন সদারঙ্গনী। কেমন যেন বিষণ্ণ লাগে তাঁকে। কি একটা ভেবে নিয়ে শেষে বলেন, তুমি একটা কথা ভুলে যাচ্ছ প্রিয়। তোমার মত অনেক অনেক রুগীকে আমি চিকিৎসা করেছি। যতদিন তারা আমার হেপাজতে ছিল ততদিন তারা আমার খুবই স্নেহের পাত্র ছিল, নিজের বুকের পাঁজরের মত দেখতাম তাদের। কিন্তু রোগমুক্তির পর যেদিন তারা এখান থেকে ফিরে গেল সেদিন থেকে তারা আমার কাছে শুধু—ও একজন লোক। না হলে অযথা ভারে পীড়িত হতে হ'ত আমাকে। হেডমাষ্টার মশাই যদি সব প্রাক্তন ছাত্রের গ্রামার সিনট্যাক্সের দিকে নজর রাখবার শুভ বুদ্ধিতে সবাইকে চিঠিপত্রে যোগাযোগ রাখতে উৎসাহ দেন তার অনিবার্য ফল হবে —বর্তমান বৎসরের ছাত্রকুল আগামীবছরে আর প্রাক্তন হবে না। রোগমুক্তির পরেও যদি রুগীর জীবনের জের আমাকে টেনে চলতে হয়, তাহলে আমার জীবনও দুর্বিসহ হয়ে উঠবে।

এবার বেদনবিধুর হয়ে ওঠে প্রিয়দর্শীর সুন্দর মুখখানা। বোধকরি তার মনে একটা ধারণা জন্মেছিল যে, আর পাঁচজন আবাসিকের চেয়ে সে ডাক্তার-সাহেবের হৃদয়ে নিবিড়তর আসন পেতেছে। পুত্রের মতো যাকে কৈশোর থেকে হাত ধরে পায়ে পায়ে পৌঁছে দিলেন যৌবনের সিংহদ্বারে, সেই আকৈশোরের খেলার সাথী, শিক্ষার গুরু, বস্তুত সেই পিতৃস্থানীয় ডাক্তার-সাহেব যে বিদায়মুহূর্তে এই জাতীয় রূঢ় ভাষায় কথা বলতে পারেন সেটাই ছিল প্রিয়দর্শীর আশঙ্কাতীত। আর সবচেয়ে সে আহত হয়েছে 'রুগী' শব্দটায়। করুণাময়ী আশ্রমে কোন আবাসিককে রুগী বলা হয় না, তার একমাত্র কারণ ডাক্তার-সাহেবের নিষেধ। প্রিয়দর্শী জানত, 'স্যাডচুয়ারি' শব্দটা ডাক্তার-সাহেবেরই চয়ন করা। ওরা আশ্রমিক, ওরা বোর্ডার—পেসেন্ট নয়। আজ

ডক্তার-সাহেব যেন নিজের ভুলে গেছেন নিজের অরোপিত আইন। ল-মেকার নিজেই আজ ল-ব্রেকার। প্রিয়দর্শী কোন জবাব দেয় না। দূর-দিগন্তের যে প্রান্তটার দিকে ছুটে গেছে রেলের লাইন দুটো সেই দিকেই তাকিয়ে থাকে অবোধ দৃষ্টি মেলে।

মনোজগত নিয়েই যাঁর কারবার তিনি কি বুঝতে পারেন না, প্রিয়দর্শী কী পরিমাণ আহত হয়েছে তাঁর এ রূঢ় ভাষণে? ডাঃ ত্রিবেদী পর্যন্ত বিস্মিত। অথচ এর পরেও সদারঞ্জনী বলেন, তোমার চিকিৎসার জন্য যে অর্থ আমাকে দেওয়া হয়েছিল তা নিঃশেষ হয়ে গেছে বহুদিন। তুমি তো জান আমাদের অর্থের কত অভাব। যা কিছু করতে যাই, টাকায় ঠেকে যায়। শেষের দু-তিন বছর বস্তুত তুমি ছিলে আমাদের লায়াবেলিটি; এর পরেও যদি ডাকাগুল আদায় কর বেয়ারিঙ চিঠি পাঠিয়ে--

হো হো করে বেখাপ্পা হাসি হাসেন ডাক্তার-সাহেব।

ত্রিবেদী আর নিজেকে সামলাতে পারে না। ডাক্তার-সাহেব তো আর পাগল নন, পাগলের ডাক্তার—তিনি কি বোঝেন না? বলে, স্যার।

—জানি ত্রিবেদী। বিদায়-মুহূর্তে এসব রূঢ় সত্য কথাগুলো না বললেও চলত। কিন্তু মিথ্যা তো বলছি না আমি! প্রিয়দর্শী আমার ঘাড় থেকে নেমে যাওয়ায় একটা সীট যে খালি হল এটা তো তুমিও অস্বীকার করতে পার না।

ত্রিবেদী যেন মরমে মরে যায়।

প্রিয়দর্শীও যেন পাথরের মূর্তিকে পরিণত হল। তার চিকিৎসার জন্য কে টাকা দিয়েছিলেন তা সে জানে না। সে অর্থ নিঃশেষিত হওয়ায় ডাক্তার-সাহেব নিজের পকেট থেকে যে এখন খরচ করছেন এতে তার বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ নেই। আদিযুগের সেই অজানা পরোপকারীর কাছেই বরং ওর সঙ্কোচ আছে, ডাক্তার-সাহেবের কাছে ওর আর লজ্জা কি? এই যে দিল্লীর টিকিট উনি কেটে দিলেন, পকেটে গুঁজে দিলেন খানকয় নোট এতে তো কোন সঙ্কোচ বোধ করেনি সে। বাপের কাছে হাত পাততে ছেলের কি সঙ্কোচ হয়?

কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়ল প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা। মানুষজনকে নিয়ে যায় এ ঘাট থেকে ও ঘাটে—এক পরিচ্ছেদের উপর যবনিকা টেনে দিয়ে মানুষ খুলে বসে নূতন অধ্যায়। প্রিয়দর্শীর জীবনেও এই গয়া প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা আজ নূতন সূচনা বয়ে এনেছে। এখনই ফেরিওয়ালার হাকডাকে সচকিত রাঁচি স্টেশনকে পিছনে ফেলে ট্রেনটা রওনা হয়ে পড়বে নূতন দিগন্তের সন্ধানে।

যাত্রীর ভীড়, কুলিদের ছোটাছুটি, একটু আশ্রয়ের সন্ধান। দ্বিতীয় শ্রেণীর একটা কামরায় উঠে পড়ে প্রিয়দর্শী। জানালার ধারে জায়গা পায় বসতে। মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে কুলিটাকে বিদায় দেয়। ডাক্তার-সাহেবের ব্যবহারে সে মর্মাহত হয়েছে নিঃসন্দেহে, তবু এই শেষ মুহূর্তে তার তরফ থেকে সে কোন দুর্ব্যবহার করবে না। মালপত্র গুছিয়ে রেখে ফিরে আসে। দাঁড়ায় ডাক্তার-সাহেবের কোল ঘেঁষে। হুইসিল বাজল। ট্রেন ছাড়বে এবার। ত্রিবেদী এক পা এগিয়ে এসে করমর্দন করে বিদায়ী আশ্রমিকের সঙ্গে, অস্ফুটে বলে, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

প্রিয়দর্শী মৃদু হাসল। হাতটা ছাড়া পেতেই হঠাৎ কি ভেবে নিচু হয়ে ডাক্তার-সাহেবের পায়ের ধুলো নিয়ে বসে। সদারঙ্গনী বোধকরি এজন্য প্রস্তুত ছিলেন না। অভিভূত হয়ে পড়েন হঠাৎ।

গাড়ি ছাড়ল। প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে ট্রেনটা। প্রিয়দর্শী জানালা দিয়ে মুখ বাড়ায়। কয়াশাটা ক্রমশঃ পাতলা হয়ে আসছে। তবু ক্রমশঃ দূরে সরে গিয়ে অস্পষ্টতর হয়ে যাচ্ছে কলমখরিত রাঁচি স্টেশন। ভীড়ের মাঝখানে মিলিয়ে গেল ডাক্তার-সাহেবের রুমাল-নাড়া হাতখানি।

ওর জীবন-নাট্যে একটা অঙ্কে যবনিকা পড়ল। এ অঙ্কের একটি ছোট গর্ভাঙ্ক কিন্তু বাকি ছিল, যেটুকু অভিনীত হল প্রিয়দর্শীর প্রস্থানের পর।

বাঁকের মুখে ট্রেনটা মিলিয়ে যেতেই ডাঃ ত্রিবেদী বলে ওঠেন, যাবার সময় ঐ রূঢ় সত্য কথাগুলো নাই বলতেন স্যার!

সদারঙ্গনীর চোখে বোধহয় কয়লার গুঁড়ো পড়েছিল। রুমাল দিয়ে চোখটা মুছতে মুছতে বলেন, য়ু আর এ্যান ওল্ড ফুল ডক্টর! রূঢ় সত্য আবার আমি কখন বললাম? ওগুলো তো নির্জলা মিথ্যা! আমার বুকের একখানা পাঁজরা খসে গেল আজ। নাও চল—

কিন্তু যাবার কোন লক্ষণ নেই ত্রিবেদীর। অবাক কণ্ঠে বলে, নির্জলা মিথ্যা! তাহলে—

লম্বা লম্বা পা ফেলে সদারঙ্গনী গেটের দিকে এগিয়ে যান। যেন নিজের মনকেই প্রবোধ দেন, হি উড নাউ হেট মি! আমাকে ঘৃণা করতে শুরু করলেই সে এ জীবনটাকে ভুলতে পারবে!

যাত্রীবোঝাই দ্বিতীয়শ্রেণীর কামরার জানালায় মাথা রেখে প্রিয়দর্শী ভাবছিল তার ফেলে-আসা জীবনের কথা। ঐ করুণাময়ী আশ্রমের স্মৃতিচারণ।

ডাক্তার সাহেব ওকে বারে বারে বলেছেন, এ-জীবনের কথাটা ভুলে যাবার চেষ্টা করতে, বলেছেন করুণাময়ীর প্রতি কোন করুণাই যেন সে না রাখে। ও যে কখনও এখানে ছিল এই স্থূল কথাটাই বিস্মৃত হতে পারলে ওর পক্ষে মঙ্গল। তাহলেই সে সহজ স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। ভুলবার চেষ্টা সে করবে। ক্রমে ভুলে যাবেও—কিন্তু এখন এই মুহূর্তটির সঙ্গে যে পূর্ব-জীবনের নাড়ির যোগ রয়েছে। সদ্য হারানো জীবনের কথা কি কেউ ভুলে যেতে পারে।

কবে কেন কী-ভাবে সে এসে এই উন্মাদ আশ্রমের বন্দরে নৌকা ভিড়িয়েছিল তা তার মনে নেই। জ্ঞান হওয়া পর্যন্তএই পরিবেশটাকেই সে নিজের বলে জেনেছে। বাপ-মা-ভাই-বোন আর সকলের যেমন থাকে হয়তো তারও তাই ছিল, আছে। সে জানে না। তাকে জানানো হয়নি। সে জানে রামদাস বেহারাকে, ত্রিবেদী সাহেবকে, নার্স অলকাদিকে—চেনে অন্যান্য আবাসিকদের—সংবাদ বিশারদ পাণ্ডে, উদ্যানোন্মাদ ভেঙ্কটেশ্বরম্, হিসাব-পাগল ভাণ্ডারী, কবি অবিনাশ আর গতির অগতি ডেভিড ড্রাইভারকে। আর চেনে ডাক্তার সদারঙ্গনীকে। যিনি ছিলেন ওর সখা সচিব ও গুরু। ডাক্তার সদারঙ্গনী ওকে শুধু জীবনই দেননি, দিয়েছেন জীবিকাও। তাঁরই দেওয়া পরিচয়পত্রখানি বুকে করে সে চলেছে নূতন জীবনের সন্ধানে। নূতন জীবন? হ্যা, তাই তো। এখান থেকেই তার জীবন শুরু হল। কে তার জনক? নিঃসন্দেহে আধুনিক মনোবিজ্ঞান; কিন্তু সে কথা অনুধাবন করবার মতো মানসিক প্রস্তুতি ছিল না এতদিন। আজ হয়েছে। তবু ও কথাটা মেনে নিলেও মনে নেয়নি—কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে তা সত্ত্বেও। সান্ত্বনা পায় না। ডাক্তার সাহেব ওকে বারে বারে নিষেধ করেছেন, অতীতের কথা নিয়ে সে যেন বেশী না ভাবে; কিন্তু তা কি সত্যি পারা যায়? আরোগ্যলাভের প্রথমাবস্থা থেকে সব কিছুই স্পষ্ট মনে আছে তার। ডর্মিটারিতে উঠে এসেছে এই ক'বছর আগে। তার আগের জীবনটা ধোঁয়াটে। অথচ এই ডর্মিটারিতে এসে পড়ার পর সব কথাই মনে আছে ওর। এটার নাম 'আফটার-কেয়ার ডর্মিটারি'; অর্থাৎ এখানে তাদেরই থাকতে দেওয়া হয়, যাদের অবস্থা অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। যাদের মনের জট অনেকটা খুলে এসেছে। ছোট্ট একখানি ঘর, পুবের জানালা ঘেঁষা ওর খাট। তিনজন বাসিন্দা। ভাণ্ডারী-সাহেব সাত সকালে উঠে রান্না চাপিয়ে দেন। রামদাস সকাল ছয়টার মধ্যে নিয়ে আসেবাজার—আলু-বেগুন-ভিণ্ডি-বোদি—শীতকালে কপি-টম্যাটো। নিরামিষাশী মানুষ। ভাণ্ডারী রামদাসের কাছ থেকে বাজারের

হিসাবটা নিতেন—নয়া পয়সায় গলতি হলেও ক্ষেপে উঠতেন তিনি। লিখে রাখতেন খাতায়। জমা-খরচ না মিললে রাত্রে ঘুম হত না। তারপর তরকারি কোটা, রান্না চাপানো এবং বেলা নটা বাজতে না বাজতেই আহারাদি মিটিয়ে অফিসে ছোটা। খেলাঘরের সে অফিসের জন্য অবশ্য ট্রাম-বাস ধরতে হয় না। অফিস কাছেই—এ বাড়ির দক্ষিণের বারান্দায় পাতা আছে তাঁর টেবিল, চেয়ার। পাশেই হোয়াট-নট। র‍্যাকে সাজানো আছে মোটা মোটা খাতা, ফাইল, লেজার-বুক, ক্যাশবুক, কন্ট্রাক্ট-এ্যাকাউন্ট, স্টক-লেজার, ট্রান্সফার এন্ট্রি-অর্ডার বই ইত্যাদি ইত্যাদি। রাজ্যের হিসাব নিয়ে বসতেন। কোথা দিয়ে কেটে যেত কর্মক্লান্ত দিন। ত্রিবেদী-সাহেবের নির্দেশমত রামদাস মাঝে মাঝে নিয়ে আসত ডাক-প্যাড। তাতে নানানজাতের নির্দেশ দেওয়া চিঠি আসত। ভাণ্ডারী সেগুলি ডকেট করতেন, ফাইলে নোট দিতেন, ড্রাফ্‌ট দিতেন। রামদাস আবার সেই কাগজগুলি দিয়ে আসত রামাইয়াকে। রামাইয়া ছিল পূর্ব-জীবনে টাইপিস্ট-কাম-ক্লার্ক। সে বসে বসে চিঠিগুলো টাইপ করত, ভাণ্ডারী কম্পেয়ার করে ইনিসিয়াল দিয়ে দিতেন অফিস কপিতে। তারপর সেগুলি চলে যেত আবার ত্রিবেদীর কাছে। সাহেবের সই চাই। ত্রিবেদী ছিলেন ওদের খেলাঘরের অফিসের সাহেব। সদাশিব ভাণ্ডারীর কাছে তিনি হচ্ছেন ডিভিশনাল এঞ্জিনিয়ার এবং রামাইয়ার কাছে তাঁর পরিচয় হেডমাষ্টার মশাই। তার কারণ সদাশিব ভাণ্ডারী পূর্ব-জীবনে ছিলেন ডিভিশনাল এ্যাকাউন্টেন্ট এবং রামাইয়া ছিল বুঝি কোন হাইস্কুলের টাইপিষ্ট-কাম-ক্লার্ক। রামাইয়ার গোটা ইতিহাসটা জানা নেই—কিন্তু এক ঘরের বাসিন্দা সদাশিব ভাণ্ডারীর ব্যাপারটা প্রিয়দর্শী ভালভাবেই জানতে পেরেছিল। ত্রিবেদী সাহেবই বলেছিলেন ওকে। সদাশিব ব্যাচিলর। বছর ত্রিশ-পয়ত্রিশ বয়স হবে। কনফার্মড-ব্যাচিলর নন, কিন্তু তিনি ছিলেন সেণ্ট্রাল পি. ডব্‌লু. ডি.-র একজন কনফার্মড ডিভিশনাল একাউন্টেন্ট। বরাবর সুনাম কিনেছেন যেখানে গেছেন। বাৎসরিক সি. সি. আর.-এ বারে বারে লেখা হয়েছে হাইলি কোয়ালিফায়েড, এক্সিডিংলি এফিশিয়েণ্ট, অভ আনকোশ্চেনেবল্ ইন্টিগ্রিটি! উন্নতি আসন্ন, কয়েক মাসের মধ্যেই এ. জি. সি. আর-এ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হয়ে যাবার কথা। গ্রেডও বাড়বে। ভাণ্ডারী-সাহেবের বাবা চিঠিতে জানালেন যে, একটি সুলক্ষণা কন্যাকে পছন্দ হয়েছে তাঁর, মেয়েটি ভাণ্ডারীর অপরিচিতও নয়—ভাণ্ডারী যেন ছুটি নেওয়ার চেষ্টা করে। বিবাহের দিন স্থির করতে চান তিনি। সদাশিব অনুমানে বুঝলেন কন্যাটির পরিচয়।

করণ তার ভগ্নীর চিঠিও তিনি পেয়েছিলেন, জবাবে উনি লিখে পাঠালেন মার্চ মাস পার না করে, এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহের আগে তাঁর পক্ষে যমের আহ্বানে সাড়া দেওয়ারও সময় নেই, তা প্রজাপতি তো কোন ছার। শুভদিনটা এপ্রিলে ঠেলে দেওয়ার সুপারিশ করলেন তিনি। তাই স্থির হল। সহকর্মীরা লক্ষ্য করে কর্মব্যস্ত সদাশিব ভাণ্ডারী কাজের অবসরে মাঝে মাঝে গুন্ গুন্ করে গান ভাঁজছেন। খুশিয়াল হয়ে উঠেছেন রঙীন দিনের স্বপ্নে। ঠিক এই সময়েই নেমে এল বজ্র। ক্যাশিয়ার নিল ছুটি। সদাশিবকে নিতে হল দ্বৈত-দায়িত্ব। কোথা দিয়ে কী যে হল টের পেলাম না—হঠাৎ দেখলাম ক্যাশে আট হাজার আটশ' বত্রিশ টাকার ঘাটতি। মার্চ ফাইনাল চলেছে—রাত দশটা পর্যন্ত কাজ করে বিল পাশ করেছেন দক্ষ কর্মচারী। কোন ছিদ্র পথে কর্মক্লান্ত মানুষটার অসাবধানতায় ক্যাশ চেস্টে প্রবেশ করেছিল শনি। থানা-পুলিশ-ভিজিলেন্স! শেষ পর্যন্ত সদাশিব ভাণ্ডারী এসে আশ্রয় নিলেন রাঁচির করুণাময়ী স্যাঙচুয়ারিতে। প্রিদর্শীর রুমমেট হিসেবে।

টম ডেভিডের পূর্ব ইতিহাসটাও জানা আছে ওর। মোটর গাড়ির সুদক্ষ ড্রাইভার সে। বিশ বছরের নিদাগ লাইসেন্স। হেভি এবং লাইট ভেহিক্লসের। ওর নিয়োগকর্তার কি দুর্মতি হল, নাম লেখালেন দূর-পাল্লার একটি প্রতিযোগিতায়। এণ্ডিওরেন্স ড্রাইভ। কলকাতা থেকে রাঁচি। নিয়তিই যেন টানছিল তাকে, কলকাতা থেকে রাঁচির দিকে। কলকাতা থেকে প্রচণ্ড বেগে দুজনে এসে পৌছালেন রাঁচির কাছাকাছি; কিন্তু শেষরক্ষা হল না। কোন এক বাঁকের মুখে লুকিয়েছিল একটা মারাত্মক পরিহাস। দুর্ঘটনায় শেষ হয়ে গেল একজনের দূর-পাল্লায় পাড়ি জমাবার সখ—দূরতর পাল্লার পথ ধরলেন তিনি। আর ডেভিড এসে আশ্রয় নিল করুণাময়ী নিকেতনে। বাতিল গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে সে আজও গাড়ি চালায়; চাকা চলে না—কিন্তু ওর মন চলে। মাঝে মাঝে অদ্ভুত রকম শব্দ করে মুখ দিয়ে। দ্রুত গতিতে গাড়ি চলার শব্দ। নিচু হয়ে পড়ে হাওয়ার দমক—উৎসাহ দেয় নিজেকেই—থাক্ আপ ডেভিড! ড্রাইভ এ্যালং! বর্‌র্‌র্‌র্‌...

অবিনাশদারও নিশ্চয় ঐ ধরনের কোন পূর্ব ইতিহাস আছে। আর শুধু অবিনাশ সেন বা কেন, ভেঙ্কটেশ্বরম্, পাণ্ডে, বাহাদুর, রামাইয়া, স্বরূপ সিং, জীবনলাল ওদের সকলেরই আছে এমনি একটা-না-একটা ইতিকথা। স্বাভাবিক সুস্থ সাধারণ মানুষ হয়েই ওরা এসেছিল এ দুনিয়ায়। তারপর নিয়তি ওদের নিয়ে উদ্ভট একটা খেলা খেলেছে—ধাক্কা লেগেছে ওদের

মস্তিষ্কে! মুহূর্তে বদলে গেছে দুনিয়ার রূপ, ওদের চোখে। রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ স্পর্শময় এ পৃথিবী আদ্যন্ত বদলে গেছে ওদের মানসলোকে। ওরা কী ভাবে, কী করে কিছুরই ঠিক-ঠিকানা নেই। আমরা আর ওদের নাগাল পাই না—আর আমরা যে ওদের বুঝি না এই সোজা কথাটাকে অস্বীকার করার জন্য আমরা সহজ সমাধানের আড়ালে আত্মগোপন করি, বলি—ওরা পাগল!

ভারি সুন্দর একবার জবাব দিয়েছিল এ প্রশ্নের, প্রিয়দর্শী নিজেই। মাঝে মাঝে আবাসিকদের আত্মীয়স্বজন আসেন আশ্রম দেখতে। যাঁর ছেলে বা যাঁর স্বামী এই আশ্রমে এসে আটকে পড়েছে তাঁরা এসে সেই নিকট আত্মীয়কেই শুধু দেখে যান, অন্যসব পাগলদের দেখবার মত মনের অবস্থা তাঁদের থাকে না—চোখের জলে দৃষ্টি তাঁদের ঝাপসা হয়েই থাকে। কিন্তু অনেক সময়ে তাঁদের সঙ্গে আসেন এমন কেউ কেউ—যাঁরা 'পাগল' দেখতে আসেন। এঁরা হচ্ছেন সেই জাতের জীবন-রসিক যাঁরা চিড়িয়াখানায় গিয়ে হিপ্পোর হাঁ-তে থান ইট ফেলে দিয়ে হো-হো করে হাসেন, অন্তরীণ শিম্পাঞ্জির বন্দী আবাসে জলন্ত সিগারেট ছুঁড়ে দিয়ে মজা দেখেন।

এমনি একজন জীবন-রসিক এসেছিলেন অবিনাশদার স্ত্রীর সঙ্গে। তিনি নাকি অবিনাশদার শালী। দিদির সঙ্গে তিনিও এসেছিলেন জামাইবাবুর পাগলামী দেখতে। ত্রিবেদী-সাহেব নিয়ে এসেছিলেন ওদের। অবিনাশদার স্ত্রীর দু-চোখে জল—কোনদিকে তাকিয়ে দেখার মত অবস্থা ছিল না তাঁর। কিন্তু কৌতূহলী শ্যালিকা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন ভাণ্ডারীর রন্ধনকার্য আর প্রিয়দর্শীর নিশ্চুপ শুয়ে থাকার ভঙ্গিমা। ওদের সামনেই অনায়াসে তিনি ত্রিবেদীকে সহজ ভাষায় প্রশ্ন করলেন—এ দুজনের পাগলামি কি ধরনের?

ত্রিবেদী লজ্জা পেলেন। ভাণ্ডারী অবশ্য কানেই তোলেননি এ প্রশ্ন। তিনি তখন অন্য রাজ্যে—অফিস টাইমের ব্যস্ত মানুষ! কিন্তু আপাদমস্তক জ্বলে উঠেছিল প্রিয়দর্শীর। ভাণ্ডারীর তরকারি কাটা ছুরিটা তুলে নিয়ে এক লাফে এসে পড়েছিল সামনে, বলেছিল, আমি হচ্ছি খুন-পাগল!

ত্রিবেদী বিচলিত হননি। তিনি জানেন প্রিয়দর্শী সম্পূর্ণ স্বাভাবিক;—মহিলাটির অশালীন প্রশ্নে সে ক্ষেপে গেছে। হেসে সরে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। চীৎকার ক'রে খাটের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়েছিলেন অবিনাশদার শালী—আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে দু-হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়ে। ছুরিখানা ভাণ্ডারীকে ফেরত দিয়ে প্রিয়দর্শী হেসে বলেছিল, জামাইবাবুর পাগলামি

দেখবার সখ হয়েছে ভালকথা, অন্য সকলের দিকে নজর কেন ? মজা দেখবার সখ থাকে, সার্কাস যাবেন, চিড়িয়াখানায় যাবেন—জেলখানা অথবা পাগলা-গারদ দেখতে আসবেন না! বুঝেছেন?—তারপর ত্রিবেদীর দিকে ফিরে বলেছিল, ডাক্তার-সাহেবকে বলবেন, কোন বোর্ডারের আত্মীয়স্বজন এলে এরপর থেকে অফিসে ইণ্টারভিয়ুর ব্যবস্থা করতে!

মরমে মরে গিয়েছিলেন অবিনাশদার শালী।

কিন্তু এর পর থেকে অফিসঘরের মধ্যেই ভিজিটার্সদের দেখাশোনা করার ব্যবস্থা হয়েছিল। কড়া হুকুম জারী করেছিলেন সদারঙ্গনী। এমন কি খবরের কাগজের একদল রিপোর্টার একবার এসেছিল ওঁর চিকিৎসা-পদ্ধতির বিষয় অনুসন্ধান করতে—তাদেরও ভিতরে আসতে দেওয়া হয়নি।

কি যেন ভাবছিল সে? হ্যাঁ, সকলেরই আছে একটা করে অতীত ইতিহাস;—মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার একটা মূল কারণ। এ থেকে সহজ অনুসিদ্ধান্তে এসেছিল সে, যে তার নিজেরও নিশ্চয় একটা ইতিহাস আছে। সতের বছর বয়সে সে যখন করুণাময়ী উন্মাদ আশ্রমে প্রথম আশ্রয় নিয়েছিল, তখন সেও নিশ্চয় সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল ঐ জাতীয় একটা অতীত ইতিহাস। কী তা? প্রশ্ন করেছে—উত্তর মেলেনি। ত্রিবেদী-সাহেব পরে এসেছেন, কিন্তু ডাক্তার সদারঙ্গনী তো এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। ডাক্তার-সাহেব নিশ্চয় জানেন ওর আদিযুগের কথা। বলেননি। তিনি বলতেন, পিছনের দিকে তাকিও না প্রিয়—পিছনের কথা ভুলে থাকার মধ্যেই আছে তোমার মঙ্গল, তোমার মুক্তি।

অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত ডাক্তার সদারঙ্গনীকে। এখনও করে। এই সেদিনও বলেছিল, আপনার সঙ্গে চিঠিপত্রে যোগাযোগ রাখব, যখনই আঘাত পাব জীবনে, আপনার কাছে ফিরে আসব।

চমকে উঠে ডাক্তার-সাহেব বলেছিলেন না! তোমাকে বারে বারে বারণ করেছি, তবু মনে থাকে না তোমার? আমার সঙ্গে কোন যোগসূত্র রাখবার চেষ্টা কর না। তুমি যে এখানে কোনদিন ছিলে এই ভুল কথাটাকেই ভুলে যেতে চেষ্টা কর।

ডাক্তার-সাহেবের প্রতিটি উপদেশ ও অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলার চেষ্টা করে—শুধু এই একটি বিষয়ে ও সংযত করতে পারে না নিজের মনকে। নির্জন আকাশে সে ঘুরে ফিরে ভাবতে বসত তার হারিয়ে যাওয়া অতীত ইতিহাসের কথা। আস্তে আস্তে হাত বুলাতো বাম ভ্রূর উপর কাটা দাগটায়।

ওর দৃঢ় বিশ্বাস এই কাটা দাগটার সঙ্গে ওর অতীত ইতিহাস নিবিড়ভাবে জড়িত। ওর ধারণা, যে কঠিন আঘাতে অতীত জীবনটাই হারিয়ে গেছে ওর স্মৃতি থেকে, সেই আঘাতের চিহ্নটাই জেগে আছে বাম ভ্রূর উপরে। প্রিয়দর্শীর নামকরণ কে করেছিলেন তা সে জানে না; কিন্তু অনেকের চোখের আয়নায় ও দেখেছে, অনেকের দৃষ্টির নীরব ভাষায় ও বুঝতে শিখেছে যে, সে নামকরণ সার্থক। সত্যই দেবদুর্লভ শান্ত সৌম্য চেহারা তার। শুধু কপালের ঐ গভীর ক্ষতচিহ্নটা—হ্যাঁ, সেই চিরপুরাতন উপমাটাই মনে পড়িয়ে দেয়—যেন চাঁদের কলঙ্ক। আজও ট্রেনের জানালায় মাথা রেখে কপালের কাটা দাগটায় হাত বুলাতে বুলাতে ভাবছিল,—এ দাগটা এল কোথা থেকে, এল কেমন করে? ওর পক্ষে সবচেয়ে মুশ্‌কিল এই যে, পিছনের দিকে তাকিয়ে ও বড় অল্পদূর পর্যন্ত দেখতে পায়! খানিকটা আলো-আঁধারি—তারপরই সব ঝাপ্‌সা। তোমার-আমারও তাই—এ পৃথিবীতে সব জাতের মানুষই যে পরিচয়টার উপর ভিত্তি করে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়, সেই পরিচয়টার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই তার হাতে। সেই পরিচয়টা তার শোনা-কথা মাত্র। মেনে-নেওয়া সত্য। প্রমাণাতীত স্বতঃসিদ্ধান্ত। আমি অমুক বংশের, তুমি অমুক গোত্রের। পিছন ফিরে মানুষ তিন চার বছরের ঘটনা পর্যন্ত মনে করতে পারে। ফ্রক পরে কার সঙ্গে পুতুল খেলেছ, অথবা নিকার-বোকার পরে কার কাঁধে চড়ে বেড়াতে গিয়েছি। ব্যাস্। ঐ পর্যন্ত। তার ওপারে? সেখানে শুধুই শোনা-কথা মেনে নেওয়া। কিন্তু ধর, যেখানে শোনা-কথা নেই? যেখানে তোমার আপনজন এসে তোমার কপালে চুমু খেয়ে গেল না? সেখানে কে তুমি? যেখানে 'খোকা'—বলে কেউ আমাকে ডাকল না—সেখানে কে আমি? প্রিয়দর্শীর অবস্থাটা তার চেয়েও করুণ—বাল্য পর্যন্তও তার নজর চলে না! দূর-অতীতের যে দিগন্তটা আজও ওর মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে, সেটা তার অতিক্রান্ত কৈশোরের যুগ। এই করুণাময়ী আশ্রমের বাতাবরণ। তার ওপরে বিস্মরণের কুয়াশা শুধু। সেই ঘন কুয়াশার মধ্যে একটিমাত্র মৃদু লণ্ঠনের আলো—বাম ভ্রূর উপর ঐ কাটা দাগটা। ডাক্তার-সাহেবকে একবার সরাসরি প্রশ্ন করেছিল, এটা এল কেমন করে? উত্তরে উনি হেসে বলেছিলেন, মাধ্যাকর্ষণের মূল উৎস কোথায়, পৃথিবীতে প্রাণ এল কেমন করে, মানুষ মরে গেলে তার আত্মা বেঁচে থাকে কি না, এসব কথা না জেনেও যদি কোটি কোটি মানুষের হাজার হাজার বছরের জীবন কেটে গিয়ে থাকে, তাহ'লে কপালের ঐ ছোট দাগটা তোমার বরাতে কেমন করে

জুটেছিল তা না জেনেও তোমার একটা জীবন কেটে যাবে।

ভুল বলেছিলেন তিনি। হ্যাঁ, নিছক ভুল। তখন মাথাটা এত পরিষ্কার-ভাবে খেল্‌ত না। না হ'লে প্রিয়দর্শী এভাবে এড়িয়ে যেতে দিত না তাঁকে। তখন কিন্তু এত কথা ভাববার মত ক্ষমতা ছিল না তার. ভাবতে পারলেও ভাষায় প্রকাশ করে গুছিয়ে বলতে পারত না। পারলে সে বলত—বনিয়াদের ভারবাহী ক্ষমতাটা জানা না থাকলে মন্দিরশীর্ষে মঙ্গল কলস বসানোর হিম্মৎ হবে কি করে? চিত্রপটটা ক্যানভাস, কাগজ না টেরাকোটা জানা না থাকলে শিল্পীর বার্ণিকাভঙ্গ কোন কাজে লাগবে?

কিন্তু আজ আর সে প্রশ্ন করবার উপায় নেই। বনিয়াদের কথা আর জানা যাবে না। গাঁথনি যে অনেকদূর এগিয়ে গেছে। বনিয়াদের কালো গর্তটা ভরে গেছে নিরেট অন্ধকার মাটির স্তূপে।

আবছা আবছা মনে পড়ে কয়েকটা বিচ্ছিন্ন দৃশ্য···নদীর ধারে সারি সারি পাষাণ রাণা ··শিবের মন্দির···সরু গলি. পাথর-বাঁধানো, পাথরের গাঁথনির দেওয়াল, কার্নিসে অসংখ্য পায়রা—ডান হাতি পাষাণ প্রাচীরে একটা ঢুণ্ডি-গণেশ। মূর্তিটার গায়ে টাটকা রক্তের মত চাপ চাপ সিঁদুর, তেল গোলা সিঁদুর। পাশ দিয়ে আরও একটা অন্ধ গলি। গলির মুখে বসে ভিক্ষা করে অন্ধ বুড়ি একজন···

কিন্তু এসব কি সত্যিই ওর দেখা দুনিয়ার ছবি? এই চিত্রপটে সত্যিই কি একদিন সশরীরে বিচরণ করেছে সে? কি জানি। অবিনাশবাবুর তাগাদায় ওকে মাঝে মাঝে গল্প লিখতে হত। অবিনাশদার মাসিক পত্রিকায় ছাপা হত সে সব গল্প। এখন অবশ্য বুঝতে পারে, কোনদিনই সে সব ছাই-পাঁশ ছাপাখানার মুখ দেখেনি। ওরা ভুলে গেলে রামদাস সেসব কাগজ ফেলে দিয়ে এসেছে বাইরের ডাস্টবিনে। অথচ তখন ওরা রাত জেগে গল্প-কবিতা লিখত। মাসের পয়লা যাতে পত্রিকাটা ঠিকমত বার করা যায়। প্রিয়দর্শী কভারডিজাইন করত, কবিতা লিখত, গল্পের হেড-পীস আঁকত। সেইসব গল্পের পটভূমিগুলিও ওর মনে তালগোল পাকিয়ে গেছে। সেইসব গল্পের প্লট ওর চিন্তাজগতে জটিলতার সৃষ্টি করেছে নানান ভাবে। উত্তম পুরুষে যে শিকারের গল্প লিখেছিল, মনে ভাবে সেই শিকারের পরিবেশে ও সত্যিই গেছে বুঝি একদিন। আগে খুব অবাক হ'ত। আজকাল আর হয় না। এখন সে অনেককিছু বুঝতে শিখেছে। মনোবিজ্ঞানের খানকয় পপুলার বই ত্রিবেদী-সাহেবের কাছ থেকে নিয়ে পড়েছে। ও জানে একে বলে 'প্যারামনেশিয়া'।

কৈশোরে অথবা বাল্যের অনেক বই-পড়া অভিজ্ঞতাকে ওর মনে হয় বুঝি নিজের জীবনের ঘটনা। অনেক নিজের লেখা গল্পকে মনে হয় জীবনেতিহাসের অংশ।

তা সে যাইহোক। কি যেন ভাবছিল সে? হ্যাঁ, সেই পাথর-বাঁধানো সরু গলিটার কথা। এই গলিতেই থাকত নাকি ওরা? বিরাট বড় একখানা দোতলা বাড়ির একতলার কুঠুরির ছবি মনে পড়ে। স্যাঁৎসেতে, অন্ধকার একটা গর্ত যেন। জানালা ছিল না ঘরটায়। চৌকা পাথরের হিম-হিম মেঝে। ইঁদুর আর আরশোলার রাজত্ব। ঐ ঘরেই ছিল একটা শিবলিঙ্গ। বোধহয় ঠাকুরঘর ছিল কোন যুগে। এই অন্ধ কুঠুরিখানিই ছিল ওদের ঘর। এখানেই থাকত প্রিয়দর্শী আর তার মা!

মা! তার মা! সব ভুলে গেলেও মায়ের কথা সে ভোলেনি—ভুলতে পারবে না। মায়ের চেহারাটা স্পষ্ট মনে আছে ওর। অন্তত পঁচিশ বছর আগেকার মায়ের চেহারাটা! মায়ের মূর্তিটার উপর বিস্মরণের কুয়াশা নামতে পারেনি। কারণও আছে। ঐ স্মৃতিটুকু জিইয়ে রাখার মত একটা উপকরণও ও পেয়েছিল। প্রিয়দর্শীর হারিয়ে-যাওয়া অতীতের সিংহদ্বারের ঐ একটি চাবি কাঠি সে পেয়েছে ডাক্তার সদারঙ্গনীর কাছ থেকে। মায়ের একখানা ছবি। ফটো, তবে মায়ের ফটো নয়, তেলরঙে আঁকা ছবির ফটো। ক্যানভাসের উপর আঁকা তেলরঙের একটা অপূর্ব পোর্ট্রেট। কার আঁকা তা জানার উপায় নেই। ছবির নিচে চিত্রকরের নামের দুটি আদ্য অক্ষর শুধু পড়া যায়: এইচ. আর.! আর আছে একটা তারিখ। সেটা নিয়ে গবেষণা করলে বোঝা যায়, ছবিটার বর্তমান বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। অর্থাৎ প্রায় প্রিয়দর্শীর সমবয়সী ছবিটা মায়ের কুমারী জীবনের আলেখ্য। ফলে প্রিয়দর্শী এটুকু অনুসিদ্ধান্তে এসেছে যে, মায়ের বিবাহিত জীবনের একেবারে প্রথম পর্যায়ে ওর জন্ম। ভাই-বোন ওর আর কেউ আছে কিনা, তা সে জানে না। কিন্তু এটুকু আন্দাজ করেছে তা যদি কেউ থাকে তবে সে তাদের বড়দা! তবু, যে মাকে ও হারিয়েছে মাত্র সতের বছর বয়সে, যে মায়ের অস্পষ্ট আকৃতি ও আজও মনে করতে পারে, তার সঙ্গে ঐ ছবিটার আশ্চর্য সাদৃশ্য। ফটোটা পোস্টকার্ডের মাপে। কিন্তু মনে হয় মূল প্রতিকৃতিটা ছিল ছোটখাট একটা জানলার মাপে। ফটোতে শুধু সাদা আর কালো—বুঝবার উপায় নেই কী রঙের শাড়ি পরেছিল তার মা, কী রঙের ব্লাউস; যেমন জানবার উপায় নেই, কেন তার ঠোঁটের কোণায় ঐ লাজুক বাঁকা হাসি। মূল প্রতিকৃতিটা কোথায় আছে

কে জানে। কোনদিন হয়তো জানাই যাবে না সে কথা। তবে ঐ অজ্ঞাত চিত্রকরের উদ্দেশে মনে মনে মাথার টুপি খুলেছে প্রিয়দর্শী আর্টিস্ট। অপূর্ব দক্ষতা ছিল সেই অজানা চিত্রকরের। হুবহু অনুকরণ মাত্র নয়, মায়ের চরিত্রের যে ব্যঞ্জনা, তাঁর ব্যক্তিত্বের যে মূল প্রতিবেদন—তা অতি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে তুলির প্রতিটি নিখুঁত টানে। চাপা ঠোঁটের কোণায় চাপা হাসি, না ঠিক ঠোঁটের কোণাতেও নয় কাজলকালো চোখের দৃষ্টিতে। ওস্তাদজী বলতেন, এ ছবি যার তুলিতে পয়দা হয়েছে তিনি তোমার-আমার মতো মামুলী পটুয়া নন, তিনি ভ্যান গগ্-মানে-মাতিসের স্বগোত্র।

ওস্তাদজী ওর গুরু। ডাক্তার-সাহেবের অনুরোধে তিনি প্রিয়দর্শীকে ছবি আঁকা শেখাতে আসতেন। ভবঘুরে মানুষ। দু-চার মাস অন্তর এসে বলতেন, কই হে, কী কী এঁকেছ ইতিমধ্যে বার কর।

হয়তো দুচার মাস থেকে যেতেন রাঁচিতে। গুরু-শিষ্য দুজনে দিবারাত্র ছবি আঁকতেন ডর্মিটারির বারান্দায় বসে। ওস্তাদজী ওর পূর্বকথা কতটা জানতেন প্রিয়দর্শী তা জানে না। প্রশ্ন করলে বলতেন, আর বেটা, কাঁহাসে আয়া ঔর কাঁহা ভাগ্ না হৈ বহ্ কৌন জানতা? বলতেন, ছবির বেলা কি করিস? তার এ-পাশেও কাঠের ফ্রেম ও পাশেও কাঠের ফ্রেম—ফ্রেমের বাইরে কি আছে তা নিয়ে তোর কী দরকার? চার-কাঠের ফ্রেমের মধ্যে যেটুকু ক্যানভাস দিয়েছেন খোদাতালা সেটুকু যাতে রূপে-রসে-রঙে ভরে ওঠে এইটুকুই তো দেখতে হবে পটুয়াকে? না কি বল্?

প্রিয়দর্শী প্রতিবাদ করত, কিন্তু ছবিখানা কে আঁকল তাও তো জানতে হবে?

—তোবা তোবা!—প্রতিবাদটা একেবারে উড়িয়ে দেন ওস্তাদজী! তশ্‌বিরের কিস্মত কি তশ্‌বিরকারের নামের জোরে? মোটেই না! যে দেখছে তার আনন্দলাভের নিক্তিতে তার ওজন। ধর্ না কেন এই ছবিখানা। কে এঁকেছেন জানি না, কার ছবি এঁকেছেন জানি না—কিন্তু তবু ওর কিস্মত তো একতিলও কমেনি।

ওস্তাদজীর কাছে এ ছবি একটি উৎকৃষ্ট পোর্ট্রেট বই আর কিছু না। কিন্তু প্রিয়দর্শীর কাছে যে তার অতীত কিছু। এটাই যে তার হারানো জগতের চাবিকাঠি। এ যে তার মায়ের ছবি!

ছবিখানা সে রোজ দেখে। সময় পেলেই দেখে। মনে মনে বিশ্বাস করে—ঐ পোস্টকার্ড-মাপের ছবিখানা থেকেই একদিন বেরিয়ে আসবে ওর মা—

যে মাকে ও হারিয়েছে মাত্র সতের বছর বয়সে। হ্যাঁ, হারিয়েছে বৈকি। এটুকু নির্মম সত্য জানাতে কার্পণ্য করেন নি ডাক্তার-সাহেব। বলেছিলেন, ওর মা মারা গেছেন। কোথায় কেমন করে, কী ভাবে—তা অবশ্য বলেননি।

একটা বিশেষ রাত্রির কথা ওর আবছা মনে পড়ে। ভয়ঙ্কর একটা রাত্রি। কতকগুলো টুকরো ছেঁড়া ছবি···মাঝে মাঝে ফাঁক···কিন্তু সে ঘটনা কি সত্যই ওর জীবনে ঘটেছিল? না কি সেগুলোও ওর কল্পনাপ্রবণ মনের বিকার? কোন ভুলে-যাওয়া গল্প-উপন্যাসের খণ্ডচিত্র? হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। ও মনে করে এটা ওরই জীবনের ঘটনা—যদিও সেটা সম্পূর্ণ অসম্ভব বর্তমান শতাব্দীতে।

কতই বা বয়স তখন ওর? পনের-ষোলো। বাইরে প্রচণ্ড কোলাহল··· ঝড়?···না কি যুদ্ধ হচ্ছে বাইরে? ··ওগুলো কি কামানের গর্জন? বন্ধ ঘরের মধ্যে আটক পড়েছে ওরা। ও ছাড়া আর যারা আছে তারা সবাই স্ত্রীলোক। ওরই অতি নিকট আত্মীয় সব—বোন-বৌদি-মাসী, আর তাদের মাঝখানে ওর মা। অপূর্ব সুন্দরী ছিলেন ওর মা। মায়েরই রূপ পেয়েছে প্রিয়দর্শী। স্পষ্ট হয়ে ওঠে ছবিটা ক্রমশঃ। আগুনের মত গায়ের রঙ ছিল মায়ের, মাথার চুলগুলো ছিল ঘনকৃষ্ণ মেঘের মতো। কপালে টকটকে লাল সিঁদুরের ফোঁটা। মায়ের পরনে চওড়া লালপাড় গরদের শাড়ি। সর্বাঙ্গে ঝলমল করছে জড়োয়া গহনা। হাতে বালা, রতনচুড়, বাজু-বন্ধ—গলায় শতনরীর চন্দ্রহার, মাথায় মুকুট· চুনি-পান্না-পোখরাজ হীরের উপর আগুনের লেলিহান শিখার প্রতিফলন! · আগুন জ্বলছে ঘরের ঠিক মাঝখানে। বিরাট একটা অগ্নিকুণ্ড। মেয়েদের উদ্দেশ করে ওর মা চিৎকার করে কি-যেন বললেন··প্রিয়দর্শী সব কথা শুনতে পায় না ·বাইরে কামান দাগছে কারা ·· তবু বুঝতে পারে ওর মা অন্যান্য সব মেয়েদের বলছেন যবনসৈন্য তাদের দেহস্পর্শ করার আগেই সকলকে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। জহরব্রত! চিৎকার করে বারণ করতে গেল প্রিয়দর্শী, বলতে চাইল তার প্রাণ থাকতে কেউ পারবে না ওঁদের গাত্রস্পর্শ করতে· ·কিন্তু চিৎকার ওর করা হল না। বিরাটকায় একটা কালো হাবশি এসে চেপে ধরল ওর মুখ···দম বন্ধ হয়ে যাচ্চে কিশোরটির···হঠাৎ সশব্দে ভেঙে পড়ল রুদ্ধদ্বার ··ওদিককার প্রচণ্ড চাপ বুঝি আর সহ্য করতে পারল না। বন্যা-স্রোতের মত শত্রুসৈন্য প্রবেশ করছে দুর্গে। ওর চোখের সামনেই ওর মা ঈশ্বরের নাম নিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে! মা! মা! মা! সংজ্ঞা হারালো প্রিয়দর্শী!

—বাবুজি! আপ্ বৈঠে হুয়ে খোয়াব দেখ্‌তে হেঁ ক্যা?

সহযাত্রীর ভর্ৎসনায় সম্বিত ফিরে পায় প্রিয়দর্শী। পাগল না কি সে? রেলের কামরায় বসে আছে যে। যাবে দিল্লি। প্রেমচাঁদ সিংজীর স্টলে ছবি আঁকতে।

গয়া স্টেশনে ট্রেন বদল করে যে এক্সপ্রেস গাড়িটা ধরার কথা তার আগেই একখানা গাড়ি পাওয়া গেল। উত্তর-ভারতে কী একটা মেলা হচ্ছে—সে বাবদে স্পেশাল ট্রেন দিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। ভীড় হয়নি কিন্তু তেমন একটা। দ্বিতীয় শ্রেণী তো রীতিমত ফাঁকা। মাঝখানের বেঞ্চিতে একটি বিহারী পরিবার। ও পাশের বেঞ্চি দখল করে চলেছেন একজন বৃদ্ধ এবং একটি অল্পবয়সী মেয়ে। ভদ্রলোকের ধুতি-পাঞ্জাবীই শুধু নয়, তাঁর পাশে পড়ে থাকা বাঙলা সংবাদ-পত্রটাই তাঁর বাঙালিত্বের বিঘোষিত বিজ্ঞপ্তি। প্রিয়দর্শী বসল ওদের বেঞ্চির শেষপ্রান্তে। মালপত্র গুছিয়ে নিতে নিতেই ট্রেনটা ছাড়ে। হুইলারের স্টল থেকে ছবিবহুল একটা পত্রিকা কিনেছিল—সেখানেই নাড়াচাড়া করল কিছুক্ষণ। মন বসল না। একই বেঞ্চির অপর দুজন সহযাত্রীর দিকে নজর যাচ্ছে বারে বারে। ভদ্রলোক বৃদ্ধ, মাথায় চকচকে টাক। ধুতি-পাঞ্জাবীর উপর র‍্যাপার জড়িয়েছেন। বসেছেন তিনি দুজনের মাঝখানে। বেঞ্চির ও-প্রান্তে বসেছে মেয়েটি, ওঁরই মেয়ে হবে বোধ হয়। বৌমা নন, কারণ বিবাহিতা নন মহিলা। উঠবার সময়েই এক ঝলক নজর পড়েছিল মেয়েটির দিকে। আশ্চর্য সুন্দর মেয়েটি, আরও আশ্চর্য ওর চোখ দুটি। সেই একঝলকের দৃষ্টিতেই দেখে নিয়েছিল মেয়েটির সীমন্ত সাদা। একবারমাত্র চোখাচোখি হয়েছিল। তারপর থেকে সে এদিকে পিছন ফিরে বসে আছে, জানলায় মাথা রেখে। খোলা জানলার অশান্ত বাতাসে চুলের কয়েকটি গুচ্ছ হাওয়ায় দুলছে উদ্যতফণা নাগিনীর মতো। মিশ্‌কালো রঙের একটা সিল্কের শাড়ি ওর পরনে, মাঝে মাঝে রুপালি জরির চুম্‌কি। পিঠের দিকে বোতাম লাগানো মানানসই কালো রঙেরই একটা খাটো জ্যাকেট। গরম জামা নেই গায়ে। নীবিবন্ধের কাছে খানিকটা গজদন্তশুভ্র উন্মুক্ত অংশ। বোধ করি নিজের গৌর গাত্রবর্ণ সম্বন্ধে মেয়েটি যথেষ্ট সচেতন, ও জানে কালোরঙের ব্যাকগ্রাউণ্ডে ওকে আরও বেশী করে মানায়। মুখখানা ভাল করে দেখা হয়নি, কিন্তু গড়নটি চমৎকার। যে কোন আর্টিস্ট ওকে মডেল করতে পারলে ধন্য হয়ে যাবে, মনে হল প্রিয়র।

ভদ্রলোকের সঙ্গে বার কতক চোখাচোখি হল; কিন্তু বোধ করি ওর বিজাতীয় পোশাকের জন্য আলাপচারিতে বাধা পাচ্ছিলেন উনি। গয়া

স্টেশনেই প্রিয়দর্শী মধ্যাহ্ন আহার সেরে নিয়েছিল। একটু ঘুম ঘুম পাচ্ছে। ওপাশের বাঙ্কটা খালি আছে। জুতো জোড়া খুলে বাঙ্কে উঠে পড়ে। সুটকেশ থেকে স্যাপার বার করে আপাদমস্তক মুড়ি দেয়।

ঘুম কিন্তু এল না। নিঃসাড়ে অনেকক্ষণ পড়ে থাকার পর ওর ইচ্ছে হল জানতে মেয়েটি কি এখনও ঐ একই ভঙ্গিমায় বসে আছে নাকি, জানলার বাইরে দৃষ্টি মেলে? কৌতূহলটা জাগতেই চাদরটা একটু ফাঁক করে সে তাকায় মেয়েটির দিকে, এবং তখনই অনুভব করে মেয়েটিও তার দিকে তাকিয়ে বোধকরি দেখছে ও ঘুমিয়েছে কিনা! তাড়াতাড়ি আবার আপাদমস্তক মুড়ি দিল প্রিয়দর্শী। কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে যায়। চোখাচোখির জন্য ততটা নয়, যতটা তার ঐ চুরি করে তাকানোটা ধরা পড়ে যাওয়ায়।

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল মেয়েটির অভিভাবক নেশা করেন; কিন্তু নেশার সরঞ্জামের ঠিক থাকে না। দেশলাইয়ের জন্য এ পকেট সে পকেট হাতড়ে শেষ-বেশ উন্মোচন-উন্মুখ সিগারেটের প্যাকেটটা আবার পকেটে চালান দেবার উদ্যোগ করতেই চট করে উঠে বসে প্রিয়দর্শী। বাঙ্ক থেকে নিচু হয়ে বাড়িয়ে ধরে টেক্কা-মার্কা চতুষ্কোণটি; বলে, আসুন!

সে নিজে আর্টিস্ট, আপনভোলা মানুষ। নেশার সময় বিব্রত হওয়া যে কতবড় বিড়ম্বনা তার তিক্ত অভিজ্ঞতা ওর অজানা নয়। আর তাছাড়া তারও কেমন যেন নেশা ধরে আসছিল।

ধন্যবাদের ধার দিয়েও গেলেন না ভদ্রলোক, প্রত্যুত্তরে বলেন, সেকি! আপনি বাঙালী?

প্রিয় হেসে বলে, আপনি কি ভেবেছিলেন? মদ্র?

একটুও অপ্রতিভ না হয়ে বৃদ্ধ বলেন, আজ্ঞে না, আমি ভেবেছিলাম আপনি কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ।

এ কথার পর বাধ্য হয়েই মেয়েটি ঘুরে বসে।

—কতদূর যাবেন আপনি?—প্রশ্ন করেন বৃদ্ধ।

—নয়া দিল্লী।

—ওখানেই চাকরি করেন বুঝি?

—না চাকরি নয়। এমনি একটা কাজে যাচ্ছি।

তারপর যেমন হয়ে থাকে। আবহাওয়া থেকে রাজনীতি, সিনেমা থেকে মোহমুদ্গর এবং শেষ পর্যন্ত বাঙলাদেশে খাদ্যদ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতা থেকে সব ব্যাটাই মুখখোর! প্রিয়দর্শী খবরের কাগজ পড়ে নিয়মিত। পাণ্ডেজীর

কল্যাণে দুনিয়ার মোটামুটি খবর তার জানা আছে—শুধু নিজের কথাটা বাদে। ফলে আলাপচারিতে প্রিয়দর্শী সক্রিয় অংশ নিতে পারে।

তৃতীয়পক্ষ কিন্তু শুধু জানলায় ঝুঁকে থাকলেন,—এসব কচকচির চেয়ে বোধকরি নাড়ামুড়োভরা কাটা-ফসল বিস্তৃত ধানের ক্ষেতেই তিনি বেশী আনন্দ পাচ্ছিলেন।

খানিক পরে বৃদ্ধ বলেন, কী শুয়ে আছেন বাঙ্কের উপর দিনের বেলায়, নেমে আসুন। দাবা খেলতে জানেন?

—অল্পস্বল্প!

—তাতেই হবে। নেমে আসুন তাহলে। সময়টা তো কাটবে।

সুটকেশ খুলে দাবা-বড়ে বার করে ফেলেন তৎক্ষণাৎ। ভেঙ্কটেশ্বরমের পাল্লায় পড়ে মোটামুটি দাবা খেলাটাও শিখতে হয়েছিল ওকে। কাজে লেগে গেল সে বিদ্যা। দুজনে তন্ময় হয়ে যায় খেলার মধ্যে। মাইলের পর মাইল, স্টেশনের পর স্টেশন গেল পার হয়ে। সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ে—বাতি জ্বলে ওঠে গাড়িতে। দুজনের কারও খেয়াল নেই। গজ-ঘোড়া-নৌকার রণাঙ্গনে সন্তর্পণে শত্রুব্যূহের মধ্যে অগ্রসর হচ্ছেন ওঁরা দুজনেই।

তৃতীয়পক্ষ সারাদিন কি করল তা কারও খেয়াল নেই।

হঠাৎ দৈববাণীর মত কানে গেল, আসুন!

দুটি ডিসে কিছু নিমকি, পাকাকলা আর কাঁচাগোল্লা। ব্যস্ত হয়ে বৃদ্ধ বলেন, না না, আমাকে আবার কেন মা? রাত্রে ওসব খেলে আমার হজম হবে না। আর কি সে বয়স আছে?

প্রিয়দর্শীও প্রথামাফিক প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল;—কিন্তু তার আগেই মেয়েটি বলে, আপনারও কি কাকাবাবুর মত বয়স গেছে নাকি?

কী মিষ্টি কণ্ঠস্বর! প্রিয়দর্শীর মুখের দিকে তাকায়নি, দৃষ্টি তার খাবারের পাত্রেই নিবদ্ধ, কিন্তু চাপা হাসিতে টোল পড়েছে গালে। প্রিয় সামলে নিয়ে বলে, বয়স গিয়েছে কিনা হিসেব রাখিনি; তবে দুর্ভাগার বরাতে এমন তৈরী স্বর্গ বড় একটা মেলে না। তাই বিশ্বাস করতে তরসা হচ্ছিল না যে, সাজানো থালাটা আমারই উদ্দেশ্যে নিবেদিত। ভাগ্যলক্ষ্মীর এমন দানটার অমর্যাদা করব না, কিন্তু ভাবছি শেষে আপনার ভাগটাই না—

হেঁসেলের খবর মেয়েরা বাইরের লোককে জানায় না।—বলে মেয়েটি নিজের সরিয়ে-রাখা ভাগ থেকে নির্বিবাদে এক টুকরো মুখে পোরে।

প্রিয় নিজের কৃতিত্বে নিজেই চমকে গেছে। অপরিচিতা এই বয়সের

মেয়ের সঙ্গে এভাবে আলাপের সৌভাগ্য তার ইতিপূর্বে হয়নি। করুণাময়ী স্যাণ্ডচুয়ারিতে নার্স অলকাদি ছাড়া আর কোন মেয়ে ছিল না। রামদাসের বৌ অথবা জমাদারনীদের কথা বাদ দিলে। ত্রিবেদী-সাহেব এবং অন্যান্য কর্মচারীরা বাইরে থেকে আসতেন। ওঁদের পরিবারভুক্ত কেউ কেউ কখনও কখনও হাসপাতালে এসেছেন অবশ্য। ভিজিটার্সদের সঙ্গেও মহিলা দর্শনার্থী আসতেন—কিন্তু ওদের সঙ্গে তাঁদের বিশেষ দেখা-শোনা হত না। রোগমুক্তির একেবারে শেষ পর্যায়ে অবশ্য ডাক্তার-সাহেব ওকে নিয়ে যেতেন রাঁচির দু-একটি পরিচিত পরিবারে। অজানা পরিবেশে প্রিয়দর্শী কেমন ব্যবহার করে তাই পরখ করতেই বোধহয়। অভিজ্ঞতা ওর সামান্যই। তবু এই অপরিচিতা মেয়েটির সঙ্গে প্রথম আলাপে তার তো কোন আড়ষ্টতা এল না। প্রায় উপন্যাসের ভাষাতেই সে বেশ গুছিয়ে বলতে পেরেছে মনের কথা।

প্রিয়দর্শী খুশী হয়ে ওঠে নিজের উপর। নিজের পিঠে হাত যায় না, না হ'লে সে বোধহয় টম ডেভিডের মত নিজের পিঠ চাপড়ে নিজেকেই উৎসাহ দিত—বাক্‌আপ প্রিয়! ড্রাইভ এ্যালং!

অনতিবিলম্বে প্রিয়দর্শী তার প্লেটটা শেষ করে ফেলে। কাকাবাবুর উদর সামান্য একটু কাঁচাগোল্লা ছাড়া আর কিছুকেই ছাড়পত্র দিল না।

—আহার আর নিদ্রা, বুঝেছেন, বার্ধক্যের প্রারম্ভেই এদুটো গড়বড় শুরু করেছে। আহার তবু কিছুটা করি, কিন্তু নিদ্রাটা একেবারেই হয় না। তাই তো আপনাকে ঘুমন্ত দেখে ডাকতে মায়া হচ্ছিল। অথচ আপনার সিগারেট কেসটা দেখেই বুঝেছি আগুনের আয়োজনও আছে আপনার কাছে। যে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছিলেন আপনি।

প্রিয়দর্শীর দৃষ্টি আপনা থেকেই কাকাবাবুর ভাইঝিটির দিকে ফিরল। ঠোঁটে নয়, কৌতুকে মেয়েটির দুই চোখে হাসি উপছিয়ে পড়ছে।

ক্রমে ঘনিয়ে এল রাত। ইতিমধ্যে প্রিয় জেনে নিয়েছে যে, ওঁরাও দিল্লী যাচ্ছেন। গাড়িতে ভাগ্যক্রমে তিনজনেরই শোবার মত স্থান জুটল। বিছানা খুলে পেতে দিতে সাহায্য করল সে। মেয়েটিও হাত লাগালো তাতে—কথাবার্তা হল না কিছু। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে লাভ নেই। এক আকাশ তারা ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। কাকাবাবু অনেকক্ষণ শুয়ে পড়েছেন। মেয়েটি তখনও জানালায় মাথা রেখে বসে আছে অন্ধকারের দিকে চোখ মেলে। কী এমন দেখছে সে বাইরে? প্রিয়ও লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে। ব্যাটাই ঘুম আসছিল না। ভাবছিল সহযাত্রীদের কথাই। ভদ্রলোকের নাম

বনবিহারী মুখোপাধ্যায়। রেলেই কাজ করেন। বর্তমানে দিল্লীতে পোস্টেড। ডি. এস্. অফিসে। পরিবারস্থ সকলেই সেখানে। ভাইঝিটির নাম জানা হয়নি। আন্দাজ করেছে তাকে নিয়ে যাবার জন্যই উনি এসেছিলেন রেলের 'পাসে'। কলকাতার কোন কলেজে পড়ে বোধহয় ভাইঝিটি। হয়তো কলেজের ছুটি হয়ে গেল। না, নভেম্বর মাসে কলেজের লম্বা ছুটি হবে কেন? তবে হয়তো ও কলেজে পড়ে না, হয়তো···

কিন্তু এ 'হয় তো'র কি শেষ আছে? কাকাবাবু এত অনর্গল বক্‌বক করে গেলেন সারাদিন ধরে, অথচ ভাইঝিটি রয়ে গেল যে তিমিরে সেই তিমিরেই। প্রিয়দর্শী মনে মনে ভাবে কাল সকালে বনবিহারীবাবুর দিল্লীর ঠিকানাটা জেনে নিতে হবে। সুবিধামত একদিন দেখা করবে গিয়ে। প্রবাসে এভাবেই তো বাঙালীদের মেলামেশা হয়। আর কিছু নয়, মেয়েটির একটু গভীরতর পরিচয় জানার জন্য দুরন্ত কৌতূহল হচ্ছিল ওর। আচ্ছা, কি নাম ওকে মানায়?

হঠাৎ মুখের চাদরটা সরিয়ে কাকাবাবু বলেন, নাঃ, আজও ঘুম হবে না দেখছি—আসুন একটু গল্পই করা যাক।

প্রিয়দর্শী উঠে বসে।

আবার খানিকক্ষণ এলোমেলো আলোচনার পর বনবিহারীবাবু বলেন, দিল্লীতে থাকবেন কতদিন?

—ঠিক নেই। মাসখানেক হবে বোধহয়।

—একদিন আসুন না আমাদের কোয়ার্টার্সে।

—সে তো ভালই। ঠিকানাটা লিখে নেব কাল।

ভাইঝিটি জানলায় মাথা দিয়েই শুয়ে আছে। ঘুমাচ্ছে কিনা কে জানে।

—আচ্ছা প্রিয়বাবু, আপনি কি করেন?

—করি না বিশেষ কিছু, মাঝে মাঝে ছবি-টবি আঁকি।

—না, মানে···আমি বলছিলাম

—ও! আমার অন্নসংস্থানের ব্যবস্থার কথা বলছেন? একটা লোকের যা প্রয়োজন তা ও ছবি এঁকেই চলে যায়। এই দেখুন না দিল্লী-এক্‌জিবিশনে একজন জুয়েলার ভদ্রলোকের আহ্বানে যাচ্ছি তাঁর স্টলে কয়েকটা স্কেচ এঁকে দেব বলে। তার মজুরিতেই আগামী কয়েকটি মাস স্বচ্ছন্দে কেটে যাবে।

—আপনার বাবা-মা এবং স্ত্রী-পুত্র—

—বাবা-মা আমার রোজগারের আশায় অপেক্ষা করতে ভরসা পাননি,

বাল্যেই আমার জীবন থেকে বিদায় নিয়েছেন। আর স্ত্রী-পুত্র? তাঁরাও বোধকরি সাহস করে আমার জীবনে এসে হাজির হননি ঐ একই আশঙ্কায়।

আবার কিছুটা চুপচাপ! কাকাবাবুই নীরবতা ভঙ্গ করে বলেন, কিন্তু শুনেছি artists are just supposed to entertain and die! ঐ সঙ্গে আরও কিছু করেন না কেন?

—করি তো! মাঝে মাঝে কবিতা গল্প লিখি। গানও গাই, তবে শুধু বাথরুমে!

কাকাবাবু প্রিয়দর্শীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। বলেন, আচ্ছা প্রিয়বাবু আপনার লেখা একটা গল্পই বলুন শুনি।

—সে কি! তার চেয়ে এবার ঘুমোবার চেষ্টা করুন।

—ঘুম আসছে না। শুরু করুন বরং—

বিনা প্রতিবাদে আবার একটা সিগারেট ধরিয়ে প্রিয়দর্শী শুরু করে তার গল্প,

এ গল্পটা যখন রচনা করেছিলাম আমার বয়স তখন ষোলো সতেরো। অনভিজ্ঞ কাঁচা হাতের লেখা বলে এই কাহিনীটা যেন আমার লজ্জার বোঝাই হয়েছিল এতদিন। কখনও কোথাও প্রকাশ করিনি। আজ অনেকদিন পরে গল্পটার অনেকখানি ভুলে গেছি। তবু যতটা মনে আছে বলব —

মনে করুন নায়কের নাম কুন্তল। পাড়াগাঁয়েই তার বাল্যকাল কেটেছে। সে ছিল ভাবুক প্রকৃতির। তার বন্ধুবান্ধবেরা যখন মাঠে মাঠে ডাংগুলি খেলে, মাছ ধরে অথবা আম চুরি করে কাটিয়েছে সে তখন নির্জন বাগানে বসে লক্ষ্য করেছে কাঠবিড়ালীর গৃহস্থালীর সঞ্চয়, দেখেছে দূরের জলাটায় কেমন করে পানকৌড়ি ডুবে ডুবে গুগ্‌লি খায়। তার মনটা ছিল ভারি নরম, বাড়ির পোষা বেড়ালটা মরে যেতে সে তিনদিন খায়নি, লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদে বেড়িয়েছে। একবার শহরে সার্কাস দেখতে গিয়ে সে উঠে চলে আসে। মা গো, অমনি করে জানোয়ারগুলোকে চাবুক দিয়ে মারবে, আর তাই কি বসে বসে দেখা যায়? বন্ধুমহলে ওর এই দুর্বলতার কথাটা গোপন থাকে না। সার্কাস দেখতে যে ছেলের ভাল লাগে না, সে নিজেই তো সার্কাসের মত একটা দর্শনীয় বস্তু। ওরা ফড়িঙের পিঠে কাঠি বিঁধে ওকে দেখাতো, দেখাতো দড়ি-বাঁধা ইঁদুরকে পথে ছেড়ে দিলে কুকুরে কেমন তাকে তাড়া করে গিয়ে ধরে। কুন্তল হতভাগ্য জানোয়ারগুলোর জন্যে বিছানায় মুখ লুকিয়ে কাঁদত শুধু। বাপ-মা হারা ছোট ছেলেটি দূর সম্পর্কের মামা মথুরাবাবুর বাড়িতে

মানুষ হচ্ছিল। মামাতো ভাইদের কাপড় কেচে, বাজার করে সে যেত চরণ পণ্ডিতের পাঠশালায় পড়তে। বিনা বেতনের এই মেধাবী ছাত্রটিকে চরণ পণ্ডিত ভালবেসেই তাঁর পাঠশালায় ঠাঁই দিয়েছিলেন। অথচ এই ব্যাপারটা ওর মামী বা মামাতো ভাইয়েরা কিছুতেই সহ্য করতে পারছিল না। নানা ছুতায় এই অপরাধে ওর ভাগ্যে নানান নির্যাতন জোটে।

মামী দোক্তার টিপ্ মুখে ফেলে পড়শীদের কাছে টিপ্পনী কাটতো, ও হতভাগা ছোঁড়াকে চরণ পণ্ডিত জজ্-ম্যাজিস্টর করবে—

শুনে সবাই হাসত, আর সবার চেয়ে বেশি করে হাসত ওর মামাতো ভাই। তার আঁক কষে দিয়ে, হাতের লেখা লিখে দিয়ে কিছুতেই এই ভাইটির মন জোগাতে পারেনি কুন্তল। কথায় কথায় চড়টা-চাপড়টা ছিল তার নিত্য বরাদ্দ। ছেলেবেলা থেকেই ওর ছিল আঁকার বাতিক। আর ওর মামাতো ভাইটি জানত কুন্তলের ছবি আঁকার খাতার পাতা ছিঁড়ে দেবার মত মজা আর কিছুতে হয় না। মামীর ভবিষ্যৎবাণী অনুসারে জজ-ম্যাজিস্ট্রেট অবশ্য কুন্তল হতে পারেনি—সম্ভবত প্রতিভার অভাবে, অথবা পারিপার্শ্বিকতার প্রতিকূলতায়; কিন্তু যেবার ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি পেল কুন্তল সেই বছরই পরীক্ষোত্তীর্ণের তালিকায় তার মামাতো ভাইটির নামটা খুঁজে পাওয়া গেল না। কুন্তলের এতবড় নির্লজ্জ ব্যবহার ক্ষমার অযোগ্য। আড়ালে পেয়ে মামাতো ভাই ওর পিঠে সেদিন চ্যালাকাঠ ভাঙলো। পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে কুন্তল সেদিন তার অদেখা মায়ের জন্য কাঁদতে বসেছিল।

মথুরাবাবু তাঁর অবিবেচক ভাগ্নের এতবড় অন্যায়ে মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ হলেন, কারণ তাঁর ধর্মপত্নী তাঁকে সহজেই বুঝিয়ে দিতে পেরেছিল যে, দণ্ডমান পরীক্ষকেরা তাঁর পুত্রের নম্বরগুলিই ঐ অকালকুষ্মাণ্ডের খাতায় পাচার করেছিলেন, মথুরাবাবুর মাথাটা হেঁট করে দেবার শুভবুদ্ধিতে! ব্যাপারটা এতই সহজ যে, কূটবুদ্ধি মথুরাবাবুর বুঝতে কোনও অসুবিধা হয় না। তিনি জানেন গ্রামের মধ্যে তেজারতি কারবারে যেদিন থেকে নেমেছেন সেদিন থেকেই গ্রামসুদ্ধ লোক তাঁকে জব্দ করতে পারলে আর কিছু চায় না। তা তো চাইবেই না—গ্রামসুদ্ধ লোকের ঘটি-বাটি-জমি-জায়গা কিছু না কিছু যে তাঁর খেরোখাতায় বন্ধী আছে। ফলে তাঁর পুত্রের প্রাপ্যটা ভাগিনেয়ের ভাগে লিখে দিতে পারলে মাস্টারমশাইরা ছাড়বেন কেন? মথুরাবাবু তৎক্ষণাৎ রায় দিলেন, পরদিন থেকে কুন্তলকে মামার সঙ্গে ভাগাদায় বের হতে হবে। পাঠশালা যাওয়া তার বন্ধ।

কিন্তু এ রায় কার্যকর করা হয়নি। মথুরাবাবু নিজেই আপিলে খালাস দিয়েছিলেন তাঁর আসামীকে। কারণ ছিল। মুখচোরা ভীতু ছেলেটা যখন তার জলপানির সব কটা টাকাই মামার পায়ে নামিয়ে দিয়ে মোক্ষম এক পেন্নাম ঠুকে দিল তখন মথুরাবাবুর মনটাও গেল ঘুরে। যাক, পড়ুক না হয় ছেলেটা। না পড়লে জলপানি বন্ধ!

এমনি করে চরণ পণ্ডিতের আশীর্বাদে কুন্তল তার প্রাণের সজীবতাটুকু বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিল। গ্রামবাসীরা মথুরাবাবুর ব্যবহারে বিস্মিত হয়নি। বিনা বেতনের এমন একটি সর্বক্ষণের ভৃত্য পাওয়া সৌভাগ্যের পরিচয় বই কি। মথুরাবাবু কিন্তু আরও গভীর জলের মাছ। তাঁর আসল উদ্দেশ্যটা জানা গেল যেদিন দেখা গেল ঐ নাবালকটির মাথায় টোপর চড়িয়ে সদলবলে মথুরাবাবু চলেছেন ভিনগাঁয়ের একটি নোলকপরা মেয়েকে ঘরে আনতে। নিজ কৌলিন্য হারালেও এই কুলীন কুমারটি সম্বন্ধে তিনি বাজারদর যাচাই করেই কাজে হাত দিয়েছিলেন।

কুন্তল তার অভাবনীয় সৌভাগ্য স্তম্ভিত হয়ে গেল। তারও যে বিয়ে হতে পারে—লাল চেলিতে সর্বাঙ্গ মুড়ে তার কল্পনাকুমারী যে সত্যই কোনদিন ওর মামাবাড়িতে এসে দাঁড়াতে পারে এবং সবচেয়ে বড় কথা মামী যে তাকে বরণ করে ঘরে তুলতে রাজী হবে এটা তার স্বপ্নেরও অগোচর।

চেলির জোর চড়িয়ে, টোপর মাথায়, চন্দনের ফোঁটায় সেজে কুন্তল এল বিবাহবাসরে। হৈ-হুল্লোড়—শঙ্খধ্বনি, হুলুরবের মধ্যে কত লোক আসছে যাচ্ছে। দুর্বোধ্য ভাষায় পুরোহিত কত কি যে বলে যাচ্ছেন। প্রতিগৃহ্নামি ··প্রতিগৃহ্নামি! সব কথা ওর কানেও আসছিল না ছাই। পাঠশালায় শেখা গণ্ডায়-আণ্ডা-দেওয়া পদ্ধতিতে সে ঠেকা দিয়ে যাচ্ছিল ঠিকই। ও শুধু দেখছিল একখানা হাত। ঠাণ্ডা, সাদা, সুতোবাঁধা, নরম ছোট্ট একখানা হাত। সর্বাঙ্গ লাল চেলিতে ঢাকা। 'বৈশাখে মাসি শুক্লে পক্ষে মেষরাশীস্থে ভাস্করে' · হ্যাঁ ভাস্করে,—নববধূকে একেবারেই দেখা যাচ্ছে না—শুধু দেখা যাচ্ছে ওর আয়নামোর চুড়ি-পরা কবুতরের বুকের মত নরম একটা হাত। জীবনসঙ্গিনী তার আমন্ত্রণ লিপি পাঠিয়ে দিয়েছে সুতোবাঁধা হাত বাড়িয়ে। না দেখেই ঐ হাতের মালিককে ভালবেসে ফেলল বোকা ছেলেটা। মুখে বলল 'বাৎস্য গোত্রায়া প্রমাতামহী যথা নাম্নি দেব্যা' আর মনে মনে বললে, তোমার হাতে হাত দিলাম। তুমি আমার বউ! কখনও তোমার মনে কষ্ট দেব না আমি।

হঠাৎ কোথা দিয়ে কি যেন হয়ে গেল। মামা ছুটে এসে কুন্তলের হাত

ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেলেন সভামণ্ডপের বাইরে। ছিঁড়ে গেল ফুলের মালা, টোপরটা গেল পড়ে—কে যেন ভিড়ের মাঝে থেৎলে দিল সেটা। ও পক্ষের বহু অনুরোধের বিনিময়ে এরা দিয়ে এলেন অজস্র গালাগাল ও অপমান। প্রতিশ্রুত বরপণের সমস্তটা দাখিল করা হয়নি এটাই মথুরাবাবুর অভিযোগ। অথচ কন্যাকর্তা করজোড়ে বারে বারে বলেছেন, এই কথাই তো হয়েছিল দাদা! আপনি হঠাৎ এখন আরও পাঁচশ টাকা চড়িয়ে দিচ্ছেন!

হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন মথুরাবাবু, এখনও চড়াইনি মশাই, কিন্তু চড়িয়ে দিতেই ইচ্ছে হচ্ছে আমার! মিথ্যাবাদী জোচ্চোর!

কুন্তল প্রতিবাদের একটা প্রচেষ্টা করতেই নিরুদ্ধ বাসনাটা চরিতার্থ করবার একটা মোক্ষম সুযোগ হয়ে গেল মথুরাবাবুর!

গাড়ির গতি মন্দ হয়ে আসে। সামনেই বুঝি কোন স্টেশন অথবা সিগন্যালে লালবাতির সঙ্কেত। প্রিয়দর্শী হঠাৎ সম্বিত পেয়ে চুপ করে যায়। তাকিয়ে দেখে ওর শ্রোতা কখন গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়েছেন। শুধু তাই নয়, অতটা অভিভূত না হয়ে পড়লে ও নিশ্চয় শুনতে পেত কাকাবাবুর নাসিকা তাঁর নিদ্রামগ্নতা সরবে ঘোষণা করছে।

প্রিয়দর্শী আবার শুয়ে পড়ে। চাদরটা টেনে নেয় ফের।

—কই আপনার গল্পটা শেষ করলেন না?

—আমায় বলছেন?—চমকে উঠে বসে প্রিয়দর্শী।

—হ্যাঁ, আপনার গল্পটা শেষ করুন। ঠিক তেমনিভাবে অন্ধকারের দিকে তাকিয়েই জানলায় মাথা রেখে বলে মেয়েটি।

—কী আশ্চর্য! আপনি এই ঘুমপাড়ানি গল্পটা এতক্ষণ শুনছিলেন নাকি?

—হ্যাঁ। বলুন।

—আমার গল্পের তো ঐখানেই শেষ।

—সে কি? কুন্তলের পরবর্তী জীবন?

—জীবন তো গল্প নয়। গল্পের ঐখানেই শেষ।

—কুন্তল আর বিয়ে করেনি?

—এ প্রশ্ন অবৈধ।

—সে ছবি আঁকত না তারপর?

—কী আশ্চর্য! এসব প্রশ্ন যে অবান্তর! এর পর গল্প আর নেই। ছোট গল্পের এমনি ভাবেই তো শেষ হয়।

—তা হবে। আমি তো ছোটগল্প লিখি না, তাই জানি না। কিন্তু যদি এটা ছোট গল্প না হয়ে উপন্যাস হত ?

—তাহলে অবশ্য লিখতে হত কুন্তল আর বিয়ে করেনি।

—কেন ?

—কেন, তা যেই বলতে পারত, বলত না। বন্ধুরা প্রশ্ন করলে বলত, প্রথমবার যে বিয়ে করতে যায়, তাকে বলে বর ; আর বারবার যে বিয়ে করতে ছোটে তাকে বলে বর্বর !

মেয়েটি ঘুরে বসে। বিছানাটা ঠিক করতে করতে বলে, আপনার গল্পের কি নাম দিয়েছিলেন ?

—নাম কি দিয়েছিলাম তা মনে আছে, কিন্তু সেটা আমার ঠিক পছন্দ হয়নি। আপনিই রুচিসম্মত একটি নাম দিন না।

—আমি ? আমি হলে নাম দিতাম 'একটি কাপুরুষের কাহিনী।'

—ও নামে একটি বিখ্যাত ছোট গল্প আছে কিন্তু !

—তা হবে। আমি তো ছোটগল্প লিখি না, তাই জানি না। তাছাড়া অন্য কোন নামকরণ তো আমার মনে আসছে না।

প্রিয়দর্শী জবাব দেয় না।

—নিন, শুয়ে পড়ুন এইবার।

নিজেও মেয়েটি শুয়ে পড়ে। ওর দিকে পিছন ফিরে শোয়। প্রিয়দর্শীও শুয়ে পড়ে আবার। ঘুম আসে না কিন্তু তার। শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকে গল্পটার কথা। গল্পটা পরিবেশনের আগে মুখবন্ধ হিসাবে ও বলেছিল, এটা ওর কৈশোরের রচনা। সেটা সত্যকথা নয়। সেটা কায়দা করে বলা। সাহিত্যের সত্য। বস্তুত কৈশোরে সে কখনও গল্প লিখত কিনা, তাই জানা নেই ওর। কৈশোর কোথায় কেটেছে তাই ত সে জানে না। অথচ গল্পটা সে সদ্যই আদ্যোপান্ত তৈরী করেনি। প্রায় এই জাতীয় একটা গল্প সে একবার লিখেছিল অবিনাশদার পত্রিকার জন্য, যতদূর মনে পড়ছে। আজ সেই আধা-ভুলে-যাওয়া গল্পটা মুখে মুখে বানাতে গিয়ে লক্ষ্য হল দৃশ্যগুলো যেন আপনিই একের পর এক এসে হাজির হচ্ছে। যেন ওর জীবনে স্বচক্ষে দেখা ঘটনাই অনায়াসভঙ্গিতে এতক্ষণ বলে যাচ্ছিল সে। অথচ সে তো জানে, সজ্ঞানে এসব ঘটনাতে সে কখনও অংশ-গ্রহণ করেনি। তার গল্পের নায়ক কুন্তলের নির্যাতিত জীবন, তার ব্যর্থতা, তার কাপুরুষতা তো প্রিয়দর্শীর প্রত্যক্ষ সত্য নয়। অথচ কেমন অনায়াস ভঙ্গিমায় সে মাজিয়ে গেল ঘটনার পর ঘটনা।

কেমন করে এটা সম্ভব হয় ?···আচ্ছা, এটা এক ধরনের স্বত্যাভাসের বিপরীত-মুখী ব্যঞ্জনা নয় তো ?

স্বত্যাভাস বা প্যারাম্‌নেশিয়ার রোগী তার গল্প-উপন্যাস পড়া জগতে নিজেকে আরোপ করে। মনে করে তারই জীবনে ঘটেছে ঐ সব ঘটনা। এই রোগের বিপরীত ধারায় কোন মনোবিকলনের রোগী কি নিজের জীবনের বাস্তব ঘটনাকে প্রক্ষেপ করতে পারে না তার লেখা গল্প উপন্যাসে, সজ্ঞানে নয়, না জেনে ? নায়কের দুঃখে লেখক চোখের জল ফেলে পাণ্ডুলিপির পাতায়, কিন্তু লেখকের দুঃখে কি নায়কও কাঁদে ?

হঠাৎ নিজের মনেই হেসে ওঠে প্রিয়। এসব কী উদ্ভট চিন্তা ! গল্প গল্পই। সেটা তার প্রত্যক্ষ করা সত্য ঘটনা হতে যাবে কেন ?

একটানা গাড়ির ঝক্‌ঝক্ আওয়াজে কখন ঘুমিয়ে পড়ে সে।

ঘুম ভাঙলো মৃদু একটা স্পর্শে। কাঁধের উপর নরম আল্‌তো আঙুল ছুঁইয়ে কে যেন তাকে ঠেলে দিচ্ছে। চমকে উঠে বসে প্রিয়দর্শী।

—এই ! কি ঘুমাচ্ছেন পড়ে পড়ে ! উঠুন ! ঐ দেখুন !

মেয়েটি যে ওকে এভাবে চুপি চুপি শেষ রাত্রে ডেকে তুলতে পারে এ ছিল প্রিয়দর্শীর স্বপ্নেরও অগোচর ! গাড়ি সুদ্ধ সবাই ঘুমাচ্ছে। কিন্তু সৌজন্য-বোধের ব্যাপারে অবাক হওয়ার সুযোগ হল না প্রিয়র। নির্দেশ মত তার দৃষ্টি চলে গেল শার্সি ফেলা জানালা দিয়ে বাইরে। সেখানে যে বিস্ময় অপেক্ষা করে ছিল প্রিয়দর্শীর দৃষ্টিপাতের অপেক্ষায় তাতে সৌজন্যবোধের মামুলী বিস্ময়টার চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট রইল না। এমন একটা দৃশ্য দেখাতে গিয়ে যদি কোন কুমারী মেয়ে কোন অপরিচিত যুবককে শেষরাতে ডেকে তোলে তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

সত্যই দুর্লভ দৃশ্য ! রাতের ঘোর পাতলা হয়ে আসছে ক্রমশঃ। ফরসা হতে শুরু করেছে পুব আকাশটা। উজ্জ্বল একটা তারা উষার কপালে জ্বলজ্বল করছে তখনও। আর সেই আলো-আঁধারি আকাশপটের ক্যানভাসে কোন্ অদৃশ্য চিত্রকর চাইনীস হোয়াইট রঙে তুলি ডুবিয়ে এঁকেছে একটি অপূর্ব চিত্র।

সম্রাট শাহজাহানের মর্মর স্বপ্ন ! অপূর্ব অদ্ভুত এক নব-মেঘদূত !

পুব আকাশে উষার রক্তিমাভা ! আর সেই দুধে-আলতা রঙের ছোঁয়া লেগেছে তাজমহলের পাষাণে। মহিমাময় তাজ !

এমনি ভাবেই হঠাৎ এসে হানা দেয় জীবনের পরম লগ্ন। নির্দিষ্ট মুহূর্তে যদি হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে পার, তবে তাকে পেলে—না হলে থোড়-বড়ি

খাড়ার দৈনন্দিন জীবনে সে মুহূর্তটি যে কোথায় নিঃশেষে হারিয়ে যাবে তুমি জানতেও পারবে না। সমুদ্রগর্ভের অযুত-নিযুত শুক্তিখণ্ডের মধ্যে কোথায় যে স্বাতীর বিন্দু ফুটে উঠবে, কে তা জানে? ক্লান্তিকর জীবনেও পরম লগ্নটি কখন যে এসে হাজির হবে তাই বা কে বলতে পারে! কিন্তু যদি সেই পরম লগ্নটির ছোঁয়া পাও তুমি, তবে নিজেকে নিঃশেষে হারিয়ে ফেলবে।

সোনার কাঠির স্পর্শে যেমন অবাক চোখ মেলে উঠে বসেছিল রূপকথার রাজকন্যা, প্রিয়দর্শীও তেমনি কবুতরের বুকের মত নরম আঙুলের ছোঁয়ায় অবাক দৃষ্টি মেলে বসে থাকে। কথা বলতে ভুলে যায় ওরা। মেয়েটি বসেছে ওর পাশে, একেবারে কোল ঘেঁষে, একই জানলার ফ্রেমে কাচে বাঁধানো তাজমহলের ছবি দেখছে দুজনে তন্ময় হয়ে, বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে। মেয়েটির হাত তখনও স্পর্শ করে আছে প্রিয়দর্শীর কাঁধ, বাতাসে মেয়েটির দু-একটি চুলের গুচ্ছ এসে লাগছে প্রিয়দর্শীর গালে, কপালে—ওদের খেয়াল নেই। ওরা ভুলে যায়—এভাবে ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে বসা বেমানান, সামাজিকতার মাপকাঠিতে।

ক্রমে শ্লথ হয়ে আসে গাড়ির গতি। বাঁকের মুখে হঠাৎ হারিয়ে যায় তাজমহল। আগ্রা ফোর্ট স্টেশনে ট্রেনটা প্রবেশ করছে। মেয়েটিই প্রথমে সম্বিত ফিরে পায়। চট করে উঠে দাঁড়ায়, গায়ের কাপড়টা সামলে নেয়। প্রিয়দর্শীর স্বপ্নের ঘোর তখনও কাটেনি, বলে, অমৃত কী তা জানতাম না—আপনার ছোঁয়ায় আজ তা পেলুম মনে হচ্ছে।

মেয়েটি রীতিমত রাঙিয়ে ওঠে, কিন্তু সহজ গলায় বলে, বড় বেশি রোমান্টিক শোনাচ্ছে। তার চেয়ে বাক্সটা বরং ধরুন।

ধমক খেয়েই বোধকরি প্রিয়দর্শী বাস্তবে ফিরে আসে। লক্ষ্য করে দেখে মেয়েটি বিছানা বাঁধা হয়ে গেছে। কাকাবাবু তখনও ঘুমাচ্ছেন। মেয়েটি সাজ পাল্টায়নি। কাল রাত্রের পোশাকেই রয়েছে। চোখ দুটি ফোলা ফোলা, ঘুম জড়ানো।

প্রিয়দর্শী বলে, ব্যাপার কি? হঠাৎ বাক্সটা ধরতে হবে কেন?

—আমি আগ্রা ফোর্টে নামব যে।

—সে কি? কাকাবাবু যে বললেন আপনারা দিল্লী যাচ্ছেন।

মেয়েটি মুখ টিপে বলে, উনি যাচ্ছেন। ওঁর দিল্লীর ঠিকানাও তো আজ আপনার লিখে নেবার কথা।

—তার মানে আপনি ওঁর সঙ্গে যাচ্ছেন না?

—খুব তাড়াতাড়ি কথাটা বুঝে নিলেন তো!

—না না, তাড়াতাড়ি কোথায়? আমি তো কাল ভেবেছিলাম—

বাধা দিয়ে মেয়েটি বলে, আপনি কী ভেবেছিলেন সেই ইতিহাস শোনাতে শোনাতেই যে আমার নামবার সময় হয়ে যাবে।

তা বটে! প্রিয়দর্শী উপলব্ধি করে সমস্যাটা। সময় অল্প। দুর্লভ বাকি কয়টি মুহূর্তকে এমন আজে বাজে কথায় ব্যয় করতে চায় না ওর সহযাত্রিনী। কিন্তু এই দুর্লভ সময়টুকুর উপযুক্ত ভাষাও যে খুঁজে পাচ্ছে না প্রিয়দর্শী। কী কথা বলতে পারে সে? সাজিয়ে গুছিয়ে বলার চেষ্টা যখন করেনি তখন স্বতঃস্ফূর্ত ভাষায় তো ওর মুখ থেকে আপনিই বেরিয়ে এসেছে মনের কথা। সেটা যে আবার মেয়েটির কানে বেশী রোমান্টিক মনে হল! অথচ তার চেয়েও বেশী রোমান্টিক ভাষায় যে ওর এখন বলতে ইচ্ছে করছে, তুমি সুন্দর! কিম্বা এ পর্যায়ের একেবারে শেষ কথা, তোমাকে—

—হঠাৎ পথে একরাতের আলাপ। কে কোথায় চলে যাব, মনে থাকবে না নিশ্চয়ই আমাদের। ঐ প্ল্যাটফর্ম দেখা যাচ্ছে—কই আপনি তো কিছুই বললেন না।

—কাকাবাবুকে ডেকে দেব?

মেয়েটি হাসে, বলে, হ্যাঁ, এতক্ষণে বিদায় মুহূর্তের উপযুক্ত একটা কথা বলেছেন বটে!

প্রিয়দর্শী থতমত খেয়ে যায়!

আস্তে আস্তে শ্লথ হয়ে আসে ট্রেনের গতি। প্ল্যাটফর্মে হর্ন করছে গাড়ি। মেয়েটি সুটকেশ-বিছানা টেনে আনে দরজার কাছে। মরিয়া হয়ে প্রিয়দর্শী বলে ওঠে, আপনার নামটা?

দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে মেয়েটি একটা কুলিকে ডাকছিল। এ প্রশ্নে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ায়। খিলখিল করে হেসে ওঠে। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে, নামটা বাপ মা কি দিয়েছিলেন সেটা আমার মনে আছে; কিন্তু সেটা আমার ঠিক পছন্দ হয়নি। আপনিই রুচিসম্মত একটা নাম দিন না!

দাঁড়িয়ে পড়েছে ট্রেনটা। গাড়ির অন্যান্য যাত্রীরা তখনও নিদ্রামগ্ন। নিঃশব্দে দরজা খুলে দিল মেয়েটি। নিঃশব্দেই চাপিয়ে দিল সুটকেশ আর বিছানাটা কুলির মাথায়। প্রিয়দর্শীর মনে পড়ল না যে, এ সময় মহিলাদের সরে দাঁড়াতে বলতে হয়। কেমন যেন বেদনার্ত হয়ে ওঠে তার মুখটা। মেয়েটি চলে যাচ্ছে, তাকে ধরে রাখা যাবে না, তার নামটা পর্যন্ত জানা হল না।

সাবলীল ভঙ্গিতে মেয়েটি কাঁধে ঝুলিয়ে নেয় ওয়াটার বটলটা। টিফিন কেরিয়ারটা হাতে তুলে নিয়ে নেমে পড়ে প্ল্যাটফর্মে। দরজার পাল্লাটা নিঃশব্দে বন্ধ করে দেয়। আবার প্রিয়দর্শী ঝুঁকে পড়ে বন্ধ দরজার জানালার ফোকর দিয়ে। কী একটা কথা সে বলতে চাইছে, কিছুতেই ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না। ওর মনে হচ্ছে, ডাক্তার-সাহেব ঠিক বলেননি, ও এখনও স্বাভাবিক হতে পারেনি। ও মনের কথা মুখে আনতে পারছে কই? ও যা বলতে চাইছে তা হয় বড় বেশী রোমান্টিক হয়ে যাচ্ছে, না হয় হয়ে যাচ্ছে বোকার মত!

—এবার কাকাবাবুকে ডেকে তুলুন। ট্রেন ছাড়ছে। আচ্ছা চলি তবে কুন্তলবাবু!

আপ্রাণ প্রচেষ্টায় এতক্ষণে একটা কথার পিঠে কথা খুঁজে পেয়েছে প্রিয়দর্শী; বলে, এখনই বলছিলেন, এক রাতের আলাপ, মনে থাকবে না আপনার। কিন্তু এত শীঘ্রই যে ভুলতে শুরু করবেন তা আন্দাজ করিনি। আমার নাম প্রিয়দর্শী, কুন্তল আমার নায়কের নাম।

মেয়েটি মুখ টিপে হাসে, বলে, তাই বুঝি? কিন্তু একটা সাদা হাতের প্রেমে শুধু শুধু জীবনটা ব্যর্থ করে দিলেন আপনি? ছিঃ।

আবার থতমত খেয়ে যায় বেচারি। কী বলতে চাইছে মেয়েটা? ভ্রূ দুটি কুঞ্চিত হয়ে যায়, বলে, তার মানে? আপনি বুঝি ভেবেছেন ওটা আমারই জীবনের ঘটনা? ভুল ধারনা আপনার!

—ভুল যে নয়, তা আর কেউ না জানুক আপনি ভালভাবেই জানেন। স্বীকার কেন করতে পারছেন না, তাও আমি জানি।

—কেন?

—গল্পের যে নামকরণ আমি করেছি তারপর আপনার পক্ষে সত্যটা স্বীকার করা শক্ত!

প্রিয়দর্শী দৃঢ় প্রতিবাদ জানায়, কী আশ্চর্য! তা মোটেই নয়! এ গল্প আগাগোড়া আমার বানানো। এমন অদ্ভুত সন্দেহ হল কেন বলুন তো আপনার?

—মেয়েদের দৃষ্টি অত স্থূল নয়। তা স্বীকার যখন নিতান্তই করবেন না, তখন না হয় একটু ঘুরিয়েই বলি, ছোট গল্পটা বড় বেশী রোমান্টিক লাগছে, ওটাকে টেনে উপন্যাসই করুন। আর যা স্বাভাবিক তাই করুন আপনি।

—স্বাভাবিক কোন্‌টা?

—কুন্তলের পক্ষে আবার বিয়ে করা। ঘর সংসার করা। শুধু বলবেন.

কখনও কখনও ঘুম-না-আসা রাতে ভরা সংসারের মাঝখানেও ওর মনে পড়ে যেত একখানা লাল সুতো বাঁধা হাতের কথা।

হঠাৎ দুলে ওঠে ট্রেনটা। হুইসিল দিয়েছে গার্ড। প্রিয়দর্শী বলে, আপনার বুঝি ধারণা ছোট গল্পকে টেনে বড় করলেই তা উপন্যাস হয়ে যায়?

—আমি তো রূপক দিয়ে কথা বলছি মাত্র। ছোট গল্প উপন্যাসের কথা তো আমি বলছি না, আমি বলছি জীবনের কথা!

অত্যন্ত ধীরে চলতে শুরু করেছে ট্রেনটা।

হঠাৎ খেয়াল হল প্রিয়দর্শীর। কী আশ্চর্য! ওর নাম ঠিকানাটা তো জেনে নেওয়া হয়নি। মেয়েটির একটি হাত তখনও রয়েছে জানলার উপর। নরম সাদা একখানা হাত। হঠাৎ উত্তেজনায় সেই হাতখানাই খপ করে চেপে ধরে প্রিয়দর্শী, বলে, বাজে কথা থাক। তোমার নাম? তোমার ঠিকানা?

হাতটা টেনে নেয় না সে! ট্রেনের সাথে সাথে চলতে থাকে। মিষ্টি হেসে বলে, নামটা তো আপনার দেওয়ার কথা!

—বাজে কথা বল না, সময় নেই। বল শিগগির!

—আমার নাম কাকাবাবু জানেন।

—আর ঠিকানা?

হাতটা ছেড়ে দিতে হল এবার। গতিবৃদ্ধি হয়েছে এক্সপ্রেস ট্রেনটার।

—আর ঠিকানা? আর্তকণ্ঠে বলে প্রিয়দর্শী।

কিন্তু উত্তর দেওয়ার সুযোগ পেল না মেয়েটি। একজন ফেরিওয়ালা টাল সামলে আড়াল করে দাঁড়াল ওকে।

—বৈশাখী নেমে গেল নাকি? আরে, ছি ছি? আমাকে ডেকে দেননি? পিছন থেকে উঠে এসেছেন বনবিহারীবাবু!

গাড়ি প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে বাঁক নিচ্ছে তখন। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে লাল সুতো বাঁধা একখানা হাত। না না, সুতো বাঁধা কেন হবে? লাল-রুমাল-নাড়া একখানা হাত। প্রিয়দর্শী আপন মনে অস্ফুটে বলছে, বৈশাখী! বৈশাখী!

যেন জপের মন্ত্র!

—আরে ছি ছি ছি! আমাকে ডেকে দিতে হয়।

প্রিয়দর্শী কোন কথা বলে না। ধীরে ধীরে এসে বসে তার আসনে। বনবিহারীবাবু আবার পেশ করেন তাঁর আক্ষেপ প্রশ্ন, বৈশাখী আগ্রায় নেমে গেল, আর আপনি আমাকে ডেকে দিলেন না। ছিছি, মেয়েটা কী ভাবল?

এতক্ষণে অনেকটা সামলে নিয়েছে প্রিয়দর্শী। বললে, উনি বললেন সারা-রাত আপনার ঘুম হয়নি। তাই বারণ করলেন ডাকতে।

—হ্যাঁ, এইমাত্র ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সারারাতই দুজনে বসে বসে গল্প করেছি। আপনি তো সেই সন্ধ্যেরাত থেকে পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছিলেন।

প্রিয়দর্শী বলে না যে সন্ধ্যারাতে বরং কাকাবাবুকে ঘুমাতে দেখে ওরা শুয়ে পড়েছিল। এসব খেজুরে আলাপ ভালই লাগছিল না তার। বললে, আমি ভেবেছিলাম উনি আপনার ভাইঝি, আপনার সঙ্গেই যাচ্ছেন বুঝি!

—আরে না, না। হাওড়া স্টেশনে আলাপ। ও 'কাকাবাবু' একটা পাতানো সম্পর্ক—

—আগ্রায় বুঝি ওর বাবা মা থাকেন?

—না না, আগ্রা ওর চাকরিস্থল।

—চাকরি? এই বয়সেই চাকরি করতে হচ্ছে ওঁকে?

—তাই তো শুনলাম! ভারী করুণ ওর কাহিনী।

প্রিয়দর্শী চুপ করে থাকে। আশা রাখে বৃদ্ধ নিজে থেকেই করুণ কাহিনীটার অবতারণা করবেন। সুন্দরী সুযৌবনা একটি তরুণীর করুণ কাহিনী রসিয়ে রসিয়ে বলার মধ্যে একটা তির্যক আনন্দ আছে। বাকাবাগীশ বনবিহারী দুঃখ প্রকাশের সে আনন্দলাভ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবেন না নিশ্চয়। কিন্তু হতাশ হতে হল প্রিয়কে। এ প্রসঙ্গে ফিরে এলেন না তিনি।

অগত্যা আবার প্রিয়কে প্রশ্ন করতে হয়, করুণ কেন? ওর বাবা-মা নেই?

—মা নেই। বাবা আছেন।

—তাহলে তিনি ওর বিয়ের ব্যবস্থা না করে চাকরি করতে পাঠালেন যে?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বনবিহারী বলেন, বৈশাখী কুমারী নয়, বিধবা।

বিধবা? এত অল্পবয়সে?

—হ্যাঁ, শুধু এ বয়সে নয় ও বিধবা হয়েছে মাত্র তের বছর বয়সে।

স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকে প্রিয়দর্শী। প্রশ্ন করতেও ভুলে যায়।

বৃদ্ধ আপন মনেই বলে চলেন, তের বছর বয়সে ওর বিয়ে হয় ষাট বছরের এক বৃদ্ধের সঙ্গে। বাপ শ্বশুরঘর করতে পাঠায়নি। স্বামীর চেহারাটাও বেচারির মনে নেই। বছর না ঘুরতেই চিরদিনের মতো শাঁখা-সিঁদুর ঘুচে গিয়েছিল ওর।

প্রিয়দর্শী শুধু বলে, বলেন কি? এই বিংশ শতাব্দীতে?

ম্লান হেসে বৃদ্ধ বলেন, দুনিয়া বড় আজব জায়গা মশাই। বিংশ শতাব্দী

এসেছে শহরে, গঞ্জে। বাঙলার দূর পল্লীগ্রামে সর্দা-আইনই বা কী আর বিংশ-শতাব্দীই বা কী? কুলীন ঘরের বড় বংশের মেয়ে বৈশাখী। এখনও এমনধারা ব্যাপার যে বাঙলার গ্রামে ঘটছে তা আমারও ধারণা ছিল না।

—কিন্তু কুলীনঘরে উপযুক্ত পাত্র কি এতই দুর্লভ? এমন একটি বারো-তেরো বছরের মেয়েকে ষাট-বছরের বুড়োর গলায় গেঁথে দিতে পারলেন ওঁর বাপ-মা?

—শুনলাম সে কথাও। ওর বিয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল উপযুক্ত একটি পাত্রের সঙ্গেই। পাশের গ্রামের একজন বর্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণের বাবা-মা মরা এক ভাগ্নের সঙ্গে। ছেলেটি দেবদূতের মত সুন্দর, মেধাবী ও সচ্চরিত্র। অনেক টাকা বরপণ দিয়ে ওর বাবা এই ছেলেটির সঙ্গে বৈশাখীর বিয়ে স্থির করে-ছিলেন, কিন্তু সেই ছেলেটির মামা ছিল একটা কশাই। পাঁচশ টাকা বরপণের মিথ্যা দাবী তুলে বিয়ের আসর থেকে চুলের মুঠি ধরে উঠিয়ে নিয়ে গেল ভাগ্নেটাকে। গ্রাম-দেশের ব্যাপার। বুঝতেই পারছেন অবস্থাটা। সেই লগ্নেই বিয়ে না দিতে পারলে জাতিচ্যুত হতে হত ওর বাবাকে। এমন ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে আর কি!

বজ্রাহত প্রিয়দর্শীর মাথার ভিতর দুলে ওঠে। এ কেমন করে হয়? ওর অলীক কল্পনা কেমন করে বাস্তবায়িত হয়ে যাচ্ছে? এ যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার!

বৃদ্ধ হেসে বলেন, দুরন্ত কৌতূহল হয়েছিল, বুঝলেন, তাই প্রশ্ন করেছিলুম ওকে—যে ছেলেটির সঙ্গে তোমার বিয়ে হতে-হতে হল না, তোমাদের পাশের গ্রামের সেই ছেলেটির কী হল? তাতে হেসে বললে, তাঁর নামটাই জানি না, খবর রাখব কি? বললে, জানেন কাকাবাবু, সে ছেলেটির দিকে বিয়ের আসরে আমি চোখ তুলে তাকাতে পারিনি। শুভদৃষ্টি আমাদের হয়নি, আমার শুধু মনে আছে আমার হাতখানা ধরে রেখেছিলেন তিনি, লাল সুতো বাঁধা একখানা হাত!

প্রিয়দর্শী হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে, চুপ করুন আপনি!

এবার স্তম্ভিত হবার পালা বনবিহারীবাবুর!

আলোয় আলো নয়াদিল্লীর একজিবিশন গ্রাউণ্ড।

আজ প্রায় পনের দিন হল এই প্রদর্শনীর একটি বিশেষ স্টলে আশ্রয় নিয়েছে প্রিয়দর্শী। প্রেমচাঁদ সিংজীর জুয়েলারি দোকানটা সাজিয়ে তুলছে

অনলস পরিশ্রমে। পাঞ্জাবি ছুতার বানাচ্ছে কাউণ্টার, সানমাইকা আর কাঁচ। ইলেকট্রিক মিস্ত্রি বসাচ্ছে কন্‌সিল্‌ড্‌ লাইন। আর প্রিয়দর্শী ঘরের দেওয়ালে এঁকে চলেছে ভারতীয় ফ্রেস্কো। বিষয়বস্তু নির্বাচনের ব্যাপারে সিংজী ওকে পূর্ণ-স্বাধীনতা দিয়েছেন, বলেছেন, বাঙালীবাবুর ছবি আঁকার ব্যাপারে তাঁর কোন সাজেস্‌শান নেই। ও ব্যাপারটা তিনি বোঝেন না।

প্রেমচাঁদ সিংজীর আদি নিবাস ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। বর্তমানে তিনি মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা। অগাধ টাকার মালিক। বোম্বাই-আহমেদাবাদ-নাসিক-পুণায় তাঁর ব্যবসা ছড়ানো। ওঁর একটি ছেলের চিকিৎসা করেছিলেন ডাঃ সদারঙ্গনী। বদ্ধ উন্মাদ সেই ছেলেটিকে স্বাভাবিক মানুষে রূপান্তরিত করেছেন মনের-যাদুকর সদারঙ্গনী। সেই থেকে সিংজী কেনা হয়ে আছেন ডাক্তার-সাহেবের। এতদিনে ওঁর সেই ছেলে বিয়ে-সাদি করেছে, ঘর বেঁধেছে, সংসার করছে। ছেলের নামে একটা সিনেমার লাইসেন্স করিয়েছেন। নাসিকে তৈরী হচ্ছে সেই 'হল'। সিংজী ডাক্তার-সাহেবের পত্র পূর্বেই পেয়েছিলেন। প্রিয়দর্শীর কাজ পেতে অসুবিধা হয়নি কিছু। বোধকরি উদীয়মান চিত্রকরের বাজারদরের তুলনায় সিংজী তাকে বেশী করেই পারিশ্রমিক দিচ্ছেন। ওর কাজ দেখে খুশী হয়ে আরও বলেছেন, এরপর নাসিকে গিয়ে ওঁর সিনেমা হলেও প্রিয়দর্শীকে ম্যুরাল এঁকে দিতে হবে। তবে সে কাজের এখনও দেরি আছে। আপাতত এই একজিবিশন নিয়েই মেতে আছেন উনি। শিল্প-প্রদর্শনীর আজও উদ্বোধন হয়নি, উদ্যোগপর্বই চলছে। প্রিয়দর্শীর থাকার ব্যবস্থা হয়েছে স্টলের পিছনের ছোট খুপরিটায়। ওর সঙ্গে আরও দুজন সে ঘরে থাকে। ইলেকট্রিক মিস্ত্রি বঙ্কু, আর ছুতার মিস্ত্রি প্রীতমদাস। ওরা দুজনেই প্রিয়দর্শীর চেয়ে বয়সে ছোট। ওরা তাকে প্রিয়দা বলে ডাকে।

নূতন পরিবেশে নিজেকে বেশ মানিয়ে নিয়েছে প্রিয়। সারাদিন কাজ করে। সন্ধ্যাবেলায় তিনজনে মিলে প্রদর্শনীর এদিক-ওদিক ঘুরে ঘুরে দেখে, কার স্টলে কাজ কতটা এগিয়েছে। দিল্লীর অন্যান্য দ্রষ্টব্য দেখতে যাবার মত অবসর হয়নি এখনও। উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হচ্ছে সকলকে। উদ্বোধনের নির্দিষ্ট দিনের আগেই যাতে স্টলটা তৈরী হয়ে যায়।

ওদের দোকানের সামনেই একটা বাইসাইকেল কোম্পানীর স্টল। প্রবেশ-তোরণের উপর সাইকেল আরোহীর একটা ডামি। বঙ্কু ঐ স্টলেও ফুরনে কাজ ধরেছে। পুতুলটার পা-দুটো প্যাডেলের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। ইলেকট্রিকের সাহায্যে চাকাটা ঘোরাতে হবে। দূর থেকে দেখলে মনে হবে একটা মানুষ

অত উঁচুতে বসে ক্রমাগত প্যাড্‌ল করে যাচ্ছে, সাইকেলের চাকা ঘুরছে—কিন্তু আরোহীসমেত সাইকেলটা স্থির হয়ে আছে তোরণের উপর।

সাইকেলের দোকানের পাশে একটা ফোয়ারা, তার ওপাশে একটা রেস্তোরাঁ। বাঁ-দিকে এ্যালুমিনিয়ামের তৈরী একটা পাইলন। তার পাশে মার্কিন-সরকারের স্টল। পাইলনের সম্মুখে বৃহদায়তন একটা রকেটের মডেল। বিংশ শতাব্দীর অগ্রগতির প্রতীক।

সেদিন সন্ধ্যায় প্রীতমদাস আর বঙ্কু ধরে বসল প্রিয়দর্শীকে—খাওয়াতে হবে। সামনের রেস্তোরাঁটায় খাবার মিলছে আজকাল। প্রিয় রাজী হল। দাদা হয়েছে যখন, ছোটভাইদের আবদার রাখতে হবে বৈকি।

সাজ-গোজ করে দুই বন্ধু তৈরী হয়ে এসে ডাক দিল প্রিয়কে। বঙ্কু বলে, একি দাদা? এই সাবেক পায়জামা-পাঞ্জাবি পরেই যাবেন না কি?

—যাব আবার কোথায়? ঐ তো সামনের দোকানে।

প্রীতমদাস বলে, তার চেয়ে চলুন শহরে যাওয়া যাক। দাদার এ্যাকাউন্টেই যদি খাই, তবে এসব নিরামিষ খেয়ে কি লাভ?

প্রিয় বলে, নিরামিষ কেন? আমিষই খাওয়াব তোমাকে। চল না।

—আমি সে আমিষের কথা বলছি না দাদা,—বললে প্রীতমদাস, এই ঠাণ্ডার মধ্যে দু-এক পেগ চড়ালে খাওয়াটা জমত ভাল।

প্রিয় হেসে বলে, তাহলে আমাকে বাদ দাও ভাই। আমার আবার ও জিনিস চলে না।

প্রীতমদাস বলে, এ একটা কথা হল দাদা? আপনি আর্টিস্ট মানুষ। অমৃতে অরুচি?

প্রিয় গম্ভীর হয়ে যায়।

বঙ্কু তাড়াতাড়ি বলে, থাক্ থাক্। দরকার কি ওসবে?—চোখ টিপে সে ইঙ্গিত করে প্রীতমদাসকে।

অগত্যা ওরা তিনজনে সামনের রেস্তোরাঁতেই এসে সান্ধ্য আসর জমালো। তন্দুরি রুটি আর মুরগীর দো-পেঁয়াজি। কব্জি ডুবিয়ে আহারে মন দিল বঙ্কু আর প্রীতমদাস। বঙ্কু বলে, প্রীতমদাস, তোমাদের বাড়িতে মুর্গী চলে?

আঁৎকে ওঠে প্রীতমদাস, ওরে ব্বাস্! আমরা স্ট্রিক্ট ভেজিটেরিয়ান্! বাড়িতে আণ্ডা-গোস্ পর্যন্ত ঢোকে না? মুর্গীতো কোন্ ছাড়।

প্রিয় আলতো করে হাসে।

বঙ্কু বলে, দাদা, তুমি তো দিল্লীতে এই প্রথম এলে। চল, কাল তোমাকে

শহরটা দেখিয়ে আনি। দিল্লী শহর আমার নখদর্পণে

প্রীতমদাস প্রতিবাদ জানায়, তোর চেয়ে আমার অভিজ্ঞতা বেশী। আমার পাঁচ বছর বাস হয়ে গেছে দিল্লীতে, তুই তো বছর দুই এসেছিস মাত্র। দাদাকে শহর দেখাতে হলে আমিই নিয়ে যাব।

বঙ্কু বলে, খামোশ্! আমরা তিনজনেই না হয় যাব।

প্রিয় বলে, তার চেয়ে তোমরা দুজনেই যেও বরং। দুজন দুজনকে শহর দেখিয়ে এস। বাস ভাড়া আমিই দেব।

একটু ভেবে নিয়ে বঙ্কু বলে, তোমার কি হয়েছে বল তো দাদা? সারাদিন কী এত চিন্তা কর তুমি? ভাবীজির কথা?

প্রিয় হেসে ফেলে, না রে! সে বালাই নেই আমার।

বঙ্কু বলে, বাঁচা গেল! তবে অত কী ভাব দিনরাত? বিয়ে যখন করনি তখন তো তুমি বন্‌কি চিড়িয়া! ও-রকম একটা খাপ সুরৎ চেহারা তোমার। অথচ—

—অথচ কি?

মুর্গীর ঠ্যাংটা চিবাতে চিবাতে বঙ্কু বলে, অমন একখানা খানদানি বদন থাকলে আমি মাইরি বোম্বে চলে যেতাম! শ্লা-দের রাতের নিদ্রা ঘুচিয়ে দিতাম!

প্রীতমদাস বলে, কাদের?

—ঐ যে দেবআনন্দ, দিলীপকুমার, ধর্মেন্দরদের!

হো হো করে হেসে ওঠে প্রীতমদাস, বেশ বলেছিস মাইরি! আচ্ছা দাদা, বিয়ে তো করেননি; প্রেম করেছেন কখনও?

প্রিয়দর্শী আড়চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলে, তোমাদের কি মনে হয়?

—আমার তো মনে হয়, আপনাকে দেখে সব মেয়েই আপনার দিকে ঝুঁকে পড়ে, আর আপনি মুখ ঘুরিয়ে চলে যান!

প্রিয়দর্শী জবাব দেয় না।

—কিন্তু কই আপনি তো আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন না?

কি প্রশ্ন? আমি কখনও প্রেম করেছি কিনা? না! ওসব প্রেম-প্যার আমার জীবনে আসেনি কখনও, বোধকরি আসবেও না কোনদিন! তোমাদের ঐ প্রেম প্যার আর মহব্বৎ জিনিসগুলো আমি ঠিক বুঝতে পারি না! আমার কেমন যেন বিশ্রী লাগে!

প্রীতমদাস হো হো করে হেসে ওঠে।

বঙ্কু কিন্তু সিরিয়াস। একটা চোখ বন্ধ করে বলে, আপনি দুনিয়াটাকে খুব ঘেন্না করেন? না?

—ঘৃণা? না, ঘৃণা করব কেন? তবে আজকের দুনিয়াদারীর অনেক কিছুই আমার বরদাস্ত হয় না। আমি একলা থাকতেই ভালবাসি। কেউ যদি আমাকে বিরক্ত না করে, দুটি-দুটি খেতে দেয়, তাহলে আপন মনে ছবি এঁকেই জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারি।

—একা একাই কাটিয়ে দিতে চান জীবনটা?—অবাক হয়ে যায় প্রীতমদাস, দোসরের প্রয়োজন অনুভব করেন না?

প্রিয়দর্শী চুপ করে থাকে। অনুধাবন করবার চেষ্টা করে প্রশ্নটা।

বঙ্কু স্যাংটা নামিয়ে রেখে বলে, আপনি আজব চিড়িয়া! সব সময়েই কী যেন ভাবেন দেখি। বিয়ে যখন করেননি তখন ভাবীজির কথা নয়। প্রেম-প্যার-মহব্বৎ কী যখন জানেন না, তখন পেয়ারির কথাও নয়। তাহলে এত চিন্তা করেন কী নিয়ে?

এবারও জবাব দেয় না প্রিয়দর্শী। মনে মনে চিন্তা করতে থাকে—সত্যিই কি সে অস্বাভাবিক? অপরের চোখে কি তাকে অন্যরকম লাগে? সে কি জীবনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না? স্থূলদৃষ্টি বঙ্কু পর্যন্ত মনে করে—ও আর পাঁচজনের মত নয়?

ওর বেদনার্ত মুখটা দেখে বঙ্কু আবার বলে, খামোশ্! আর বলতে হবে না আপনাকে। কিন্তু ওসব চিন্তা-ফিন্তা ছাড়ুন দাদা! খান্-দান্ ডুগডুগি বাজান! আর কি বলে ভাল, অল্প-স্বল্প প্রেম-ট্রেমও করুন। দিনরাত আকাশ-পানে চোখ মেলে ওভাবে চিন্তা করতে থাকলে আপনি একদিন স্রেফ পাগল বনে যাবেন!—কি হল?

এমন প্রবলভাবে চমকে উঠেছিল প্রিয়দর্শী যে, চমক মুহূর্তে সংক্রামিত হল টেবিলের অপর দুজনের মধ্যেও! প্রীতমদাস বলে, বিষম লাগল নাকি দাদার? জল খান!

বঙ্কু ওকে একটা কনুইয়ের গুঁতো মারে।

ফেরার পথে বঙ্কুর কানের কাছে মুখ এনে প্রীতমদাস বলে, অমন কনুইয়ের গোত্তা মারলি কেন?

বঙ্কুও জনান্তিকে বলে, বিষম দাদার গলায় লাগেনি, লেগেছে এখানে—নিজের বুশসার্টের মাঝের বোতামটা দেখিয়ে দেয় সে।

—মানে ?

—মানে দাদা গুল্ মেরেছে ! আসলে প্রিয়দা একটা আয়নামোর চুরি পরা হাতের ধাক্কা খেয়েই ঘর থেকে পথে ঠিক্‌রে পড়েছে !

—মাইরি ! তুই কেমন করে জানলি !

—এখন তো সেটা জলের মত পরিষ্কার।

বঙ্কুর কাছে যা-নাকি জলের মত পরিষ্কার স্বয়ং প্রিয়র কাছে সেটা ভোরবেলাকার কুয়াশার মত আবছায়া ! কদিন পরে চারপাইতে চিৎ হয়ে সে কথাই ভাবছিল। মনটা কি সত্যই মর্বিড হয়ে যাচ্ছে ? আজ প্রায় তিন সপ্তাহ হ'ল সে এসেছে এই প্রদর্শনীতে। ছবি আঁকার কাজ নিয়ে। ফ্রেস্কো এঁকে মনের মত ক'রে সাজিয়েছে সর্দারজীর স্টলটা। বুঁদ হয়ে ছিল এতদিন নিজের কাজে। একদিনও ঘুরে দেখেনি গোটা একজিবিশনটা। প্রদর্শনী উদ্বোধনের শুভলগ্নে এলেন দেশবরেণ্য নেতা। ভি. আই. পি.-তে ভরে গেল সারামাঠ। পুলিসে কর্ডন করে ভীড় ঠেকাতে পারল না—বঙ্কু আর প্রীতমদাস সারাটা দিনই কাজ কামাই করে কোথায় কোথায় কাটালো। অথচ প্রিয় স্টল ছেড়ে উঠে বাইরে উঁকি মেরে দেখল না একটি বারের জন্যও। কিছুই যেন তার ভাল লাগে না। না ভীড়, না নির্জনতা। কেন এমন হয় ? বঙ্কুবিহারী তার একটা সমাধান বাৎলেছে—কথাটা সে জনান্তিকেই বলতে চেয়েছিল প্রীতমদাসকে ; কিন্তু প্রিয় শুনতে পেয়েছিল। বঙ্কুর বিশ্বাস, কাঁকনপরা হাতের ধাক্কা খেয়ে যারা ঘর ছেড়ে পথে নামে তারাই এভাবে বদলে যায়। কথাটা কি তার পক্ষে প্রযোজ্য ? তার এই পচিশ বছরের জীবনে—কই মনে তো পড়ে না—প্রেম কোনদিন এসেছিল।

আর প্রেম যদি না এসে থাকে তবে ব্যর্থপ্রেমের প্রশ্নটাই তো ওঠে না। এতদিন সে প্রায়ই একটা দিবাস্বপ্ন দেখত। সে কল্পনা করত হয়তো সে একজন ব্যর্থ প্রেমিক। সে কাউকে নিবিড় করে ভালবেসেছিল, অথচ সেই ছলনাময়ী নিষ্ঠুর দুটি হাতে ওকে আবর্জনার মত সরিয়ে দিয়ে গেছে। কেমন সে মেয়ে ? মনে মনে তার পোট্রেট আঁকত প্রিয়দর্শী। সে যেন কোন অবন্তী উজ্জয়িনীর জনপদবধূ—তার কটিদেশে মণিমেখলা, চন্দন চর্চিত তার উরস-যুগলে মাণিক্যের শতনরী, তার কবরীতে গোঁজা একটি শ্বেত করবীর গুচ্ছ ; সে যেন মহাবলীপুরম্ মন্দিরগাত্র থেকে পায়ে পায়ে নেমে এসে দাঁড়িয়েছিল প্রিয়দর্শীর সামনে। প্রিয়দর্শী মুগ্ধ বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল কিছুকাল। তারপর তার কাঁকনপরা হাত দুটি ধরে কি যেন

বলতে চেয়েছিল, কিন্তু ভাষা খুঁজে পায়নি। ওর নামটা কিছুতেই মনে পড়ছে না, সে ভাষা ভুলে গেছে। মেয়েটিও বোধকরি ওকে ঠিক চিনতে পারছে না। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুজনে, পিছন থেকে ভেসে আসছে মহাকাল মন্দিরের সন্ধ্যারতির রেশ। এতদিনে বুঝতে শিখেছে, সেটা ওর নিছক কল্পনা। স্বপ্ন-নায়িকার যে ছবিটা ও মনে মনে আঁকত, সেটা ওর বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞান নয়—রবিঠাকুরের একটা কবিতার ছাপ পড়েছিল ওর মনে। এমনি অনেক গল্প-কবিতার ছাপ ওর মনে পড়েছে। তালগোল পাকিয়ে সেগুলোই বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে অনেক সময়ে। প্রিয়দর্শী প্যারামনেশিয়ার জটিল এক রোগী।

ফলে স্বপ্ন-নায়িকাকে নিশ্চিন্তভাবে বিদায় দিতে পেরেছিল আর একদিন। যেদিন অবিনাশদা আবৃত্তি করেছিলেন রবিঠাকুরের ঐ বিশেষ কবিতাটা। ও বুঝেছিল এই-স্বপ্ননায়িকার সঙ্গে প্রিয়দর্শীর কোনও সম্পর্ক নেই। বুঝিয়েছিল নিজেকে—প্রেম ওর জীবনে আসেনি। ওর মানসিক ভারসাম্য হারানোর মূলে নেই কোন ব্যর্থ প্রেমের ইতিকথা। ওর কপালের কাটা দাগটা আর যেভাবেই জন্ম নিয়ে থাক, কোন কাঁকনপরা হাতের আঘাতে নয়।

কিন্তু সম্প্রতি আবার সে ধারণায় ফাটল ধরেছে। আবার ওর দিবাস্বপ্ন ফিরে আসতে শুরু করেছে। নূতন বেশে! এবার আর মণিমেখলা, শতনরী, চন্দনচর্চিত উরসযুগল নয়—এবার সে সাজ পালটেছে। এবার তার গৌর তনুদেহ ঘিরে কৃষ্ণবর্ণের আবরণ, অনাবৃত নীবিবন্ধের উপর পিছনে-বোতাম কালো জ্যাকেট। এবার ওর পশ্চাদপটে মহাবলীপুরমের মন্দির নয়, তাজ-মহলের তোরণদ্বার। এবার দুরন্ত ঝোড়ো হাওয়ায় সাপের ফণার মত দুলছে তার কানের পাশের কয়েকটি অলকগুচ্ছ! অগুরু চন্দন নয়, ক্যাম্থারাইডিন সুবাসিত সে চুলের গন্ধ লেগে আছে ওর ঘ্রাণে।

এবার শুধু 'রূপ' নয় 'নাম'ও পরিগ্রহ করে ওর স্বপ্ন-নায়িকা!

'বৈশাখী!'

কিন্তু!

প্রিয়দর্শী তো নিজের জীবন-কাহিনী সজ্ঞানে তাকে বলেনি। একথা অনস্বীকার্য যে, নিজের জীবনকথা প্রিয়দর্শী জানে না। কিন্তু একটা মুখে-মুখে বানানো গল্পের সঙ্গে তাহলে কেমন করে মিলে গেল ওর স্বপ্ন-নায়িকার জীবন? কাকতালীয় ঘটনা? তা কি সম্ভব? জিগ্‌স ধাঁধার মত এমন খাঁজে খাঁজে নিখুঁতভাবে কখনও মিলে যেতে পারে ওর কল্পিত কাহিনীর সঙ্গে বৈশাখীর জীবন? প্রায় পাঁচশ টাকার অঙ্কটা?

না, সে অসম্ভব। একেবারে অসম্ভব।

তাহলে কি মেনে নিতে হবে ওর উদ্ভট থিয়োরিটা? সেই স্বত্যাভাসের তির্যক প্রয়োগের ব্যাখ্যা? প্যারামনেশিয়ার ইনভার্স থিয়োরেম? এমন কি সত্যই সম্ভব যে, কোন মনোবিকলনের রোগী তার জীবনের বাস্তব ঘটনাকে ভুলে গিয়ে প্রক্ষেপ করেছে অজান্তে তার শিল্পসৃষ্টিতে? ওর ধারণা কুন্তলের গল্পটা ও বানিয়েছে। হয়তো সেই ধারণাটাই ভুল? হয়তো ও সত্যই কিশোর বয়সে গিয়েছিল টোপরমাথায় কোন বিয়ের আসরে! হয়তো ও ভুল করে ভেবেছিল, কুন্তলের নায়িকা ওর একটা শিল্পসামগ্রী, স্বহস্তে গড়া গ্যালাটিয়ার মূর্তি! হঠাৎ যদি সেই শিল্পসামগ্রী সজীব হয়ে ওর সামনে এসে দাঁড়ায়? হয়তো তাই দাঁড়িয়েছিল সেদিন—সেই ঘুম-ঘুম পাখী-না-ডাকা ভোরে আগ্রা-ফোর্ট স্টেশনে! তাজের স্বপ্নে বিভোর পিগ্‌ম্যালিয়ানের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল গ্যালাটিয়া, বলেছিল, ওগো আমি তোমার হাতে গড়া মূর্তি নই, আমি নারী!

পাগল যেমন পরশ পাথর পেয়েও অজান্তে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল অনাসক্ত অনবধানতায় তেমনি অবহেলায় প্রিয়দর্শীও ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে তার স্পর্শমণিকে। গড়-ঠিকানার বৈশাখী যেন কোন বৈশাখী ক্ষ্যাপা হাওয়ায় ঝরাপাতার মত হারিয়ে গেল তারপর। অথচ তার সেই কবুতরের বুকের মত নরম আঙুলের ক্ষণিক স্পর্শে সোনা হয়ে গেছে ওর সমস্ত অন্তরাত্মা!

—প্রিয়দা, প্রিয়দা, শিগ্‌গির বাইরে এস—হুড়মুড় করে ঘরে ঢোকে বঙ্কু।

—কেন রে, কি হয়েছে? চারপাইতে উঠে বসে প্রিয়দর্শী!

—কেল্লা বোধ হয় ফতে হয়েছে। বাইরে এস জল্‌দি! কোটটা চড়াও দেখি গায়ে!

হাত ধরে হিড় হিড় করে ওকে বাইরে নিয়ে আসে বঙ্কু। বাইরে মানে ভিতরকার গুদাম ঘর থেকে সামনের স্টলে। অন্ধকার থেকে হঠাৎ আলোয় বেরিয়ে এসে কেমন যেন ধাঁধা লাগে। সামলে নিয়ে লক্ষ্য করে দেখে কাউন্টারের ওপারে একজন অত্যন্ত সুবেশ ভদ্রলোক মুগ্ধ দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন স্টলের দেওয়ালের আঁকা ছবিগুলো। ভদ্রলোকের ডান হাতে হাত রেখে ঘনিষ্ঠভাবে দাঁড়িয়ে আছেন একজন শ্বেতাঙ্গিনী বিদেশিনী—আমেরিকান অথবা য়ুরোপীয়। দুজনেই প্রাচীরচিত্র দেখতে তন্ময়। এই অবকাশে প্রিয়দর্শীও খুঁটিয়ে দেখে নিল ওদের দুজনকে। ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশের ওপরে হলে বলতে হবে শরীরের প্রতি তিনি অত্যন্ত যত্নশীল।

এপারে হলে বলা উচিত চুল-ওঠার বহু বিজ্ঞাপিত হেয়ার অয়েলগুলি আসলে কোনও কাজের নয়। ব্যাকব্রাশ করা চুলের মাঝে মাঝে ফাঁক ফাঁক। দামী কালচে নস্যি রঙের স্যুট, রঙ মেলানো টাইয়ের সঙ্গে বেমানান আকারের হীরে বসানো একটা টাইপীন। বাঁ-হাতে চেসনাট কাঠের পাইপ, ডান হাতে লীলা কমলিনী। ভদ্রমহিলার বয়স আন্দাজ করা কঠিন! এ বিষয়ে প্রিয়র অভিজ্ঞতা অল্প। তাঁর বাম মণিবন্ধে ক্ষুদ্রায়তন একটি হাতঘড়ি, ডান হাতে জবোয়া ব্রেসলেট। ঘড়িওলা হাতখানি সঙ্গীর করতলগত—ব্রেসলেটপরা হাতে এক-গুচ্ছ কুলীনজাতের কালো গোলাপ।

ভদ্রলোকের মুগ্ধ দৃষ্টি দেওয়াল থেকে কাউন্টারে নেমে এলে সর্দারজী সবিনয়ে ইংরাজিতে নিবেদন করেন, ইনিই প্রিয়দর্শী; আর্টিস্ট।

ভদ্রলোক ওর দিকে ফিরেই চমকে ওঠেন। আপাদমস্তক ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকেন। চমকটা অদ্ভুত, চেনা লোককে অপ্রত্যাশিত পরিবেশে দেখলে লোকে যেমন চমকে ওঠে, ঠিক তেমনি। প্রিয়দর্শী সচকিত হয়; যতদূর মনে পড়ে এঁকে সে কখনও দেখেনি। কে ইনি? অমন করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কী দেখছেন উনি? অস্বস্তিকর পরিস্থিতিটা এড়িয়ে যাবার জন্যই প্রিয়দর্শী বলে, আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?

সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে উনি বলেন, প্রিয়দর্শী—?

সর্দারজী প্রিয়দর্শীর দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকায়। ওর পুরো নামটা তারও জানা নেই। প্রিয়দর্শী পাদপূরণ করবার সময় সর্দারজীর পূর্বভাষণের পুনরুক্তি করে মাত্র। শুধু সেমিকোলন চিহ্নটা বাদ দেয়, বলে প্রিয়দর্শী আর্টিস্ট।

—হ্যাটস য়োর প্রফেশন ম্যান, য়োর সারনেম প্লীজ?

—আর্টিস্ট! আবার বললে প্রিয়। এঞ্জিনিয়ার, মার্চেন্ট আর কণ্ট্রাক্টর যদি ক্রিকেটিয়ার হতে পারে, তাহলে একজন আর্টিস্ট শুধুমাত্র আর্টিস্ট হতে পারবে না?

—ওয়েল সে'ড! হাহা করে হেসে ওঠেন ভদ্রলোক।

সর্দারজী প্রিয়দর্শীর কানে কানে বলে, উনি একজন মিলিওনেয়ার, বিজনেস্ ম্যাগনেট—সমঝে বাৎচিৎ করবে।

জনান্তিকে বলবার ভঙ্গি করলেও সর্দারজীর ভোমাগলা এত অস্পষ্ট নয় যে, বাণিজ্য-চুম্বকটির কর্ণগোচর হবে না। কিন্তু যেন শুনতে পাননি এইভাব বজায় রেখেই উনি বলেন, হ্যাঁ, তা আলবৎ হতে পারে। সে ক্ষেত্রে আমার নাম রতনচাঁদ বিজনেস্‌ম্যান!

—আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন? আবার প্রশ্ন বর্ষণ হল প্রিয়র!

ভদ্রলোক এবার ইংরাজি ছেড়ে সরাসরি হিন্দীতে বলেন, হ্যাঁ, তোমাকে অভিনন্দন জানাতে। অপূর্ব হয়েছে তোমার ফ্রেস্কোগুলি।

—এগুলো 'ফ্রেস্কো' নয়, 'ম্যুরাল'—প্রিয়দর্শী শুধ্‌রে দেয়। ভদ্রলোক কর্ণপাত করেন না। বলেন, মুঘল পেইন্টিংয়েই বুঝি তোমার ন্যাক্?

আপাদমস্তক জ্বালা করে ওঠে প্রিয়দর্শীর। লোকটা বয়সে বোধকরি ওর চেয়ে বছর দশেকের বড়ই হবে; কিন্তু সৌজন্য বলে, বারো আর বাইশের মধ্যে যে দশ, পচিশ আর পঁয়ত্রিশের মধ্যে সে দশ নয়। ইংরাজির 'য়ু' যখন হিন্দীতে 'তুম'-এ রূপান্তরিত হল তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, অনুবাদের এই অবরোহণ শুধুমাত্র ব্যাঙ্কের পাশবই নির্ভর। প্রিয়দর্শী পকেট থেকে চারমিনারের চ্যাপটা হয়ে যাওয়া প্যাকেটটা বার করে একটা সিগারেট ঠোঁটে ছুঁইয়ে নিপুণভাবে আগুন ধরায়। তারপর ধীরে সুস্থে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে, আপনার বুঝি ধারণা এগুলো মুঘল পেইন্টিং?

—নয়? প্রশ্নগুলি করেন ভদ্রলোক।

—নয়। যেন প্রতিপ্রশ্ন করে প্রিয়দর্শী, যোগ করে, যে শৈলীতে এ ছবিগুলি আঁকা হয়েছে তাকে বলা হয় 'কাঙরা-ভ্যালি স্টাইল'; কিন্তু আর্টের সে সূক্ষ্ম আলোচনা কোন বিজ্‌নেস্‌ম্যানের সঙ্গে নাই বা করলাম। আর কিছু বলবেন আমাকে?

বন্ধু যেন এইমাত্র একদাগ কুইনিন মিক্সচার খেয়েছে! মুখটা ঘুরিয়ে নেয়। প্রিয়দাটা হোপলেস! দাঁওটা ফসকালো বুঝি। সন্ধানী বন্ধুবিহারী ইতিমধ্যেই খবর সংগ্রহ করেছে যে রতনচাঁদ হচ্ছেন দিভেচা প্রোডাকসন্সের খোদ মালিক। অনেকগুলি বক্স অফিস ফাটানো জবর হিন্দী ছবি তুলেছেন ইতিমধ্যে। জনান্তিকে মোক্ষম একটা চিমটি কাটে সে প্রিয়র হাতে।

ভদ্রলোক কিন্তু নাছোড়বান্দা; বলেন, পিয়োর মুঘল-টেকনিকে ম্যুরাল আঁকতে পারে?

—পারি!—সপ্রতিভভাবেই প্রিয়দর্শী জবাব দেয়, যদি পিওরিটির পরীক্ষায় পাস নম্বর দিতে কোন বিজ্‌নেস্ ম্যাগনেটকে বিচারক হিসাবে ডাকা হয়।

আবার সেই প্রাণখোলা হো-হো করা হাসি। হাসিটাতে প্রিয়দর্শীকে নরম হতে হল। অপমানকর কথার জবাবে যে মানুষ এমন দরাজ হাসি হাসতে পারে, তাকে উপেক্ষা করা চলে না, তা সে হোক না কেন লক্ষপতি ধনী। বললে, কিন্তু হঠাৎ পিওর মুঘল পেইন্টিং কেন?

—ধর আমার খেয়াল। উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেব, যদি নির্ভেজাল মুঘল-স্টাইলের হয়। কেবল দুটি শর্তে—

বন্ধু জুতোসুদ্ধ পা দিয়ে মাড়িয়ে দিয়েছে প্রিয়র স্লিপার-পরা পায়ের বুড়ো আঙুলটা। ইঙ্গিতটা প্রিয় অনুধাবন করে, বলে শর্ত দুটো শুনতে হয়।

—প্রথম শর্ত, ছবিটা একেবারে নিছক মুঘল স্টাইলে আঁকতে হবে, আর দ্বিতীয় শর্তটা হচ্ছে এই যে, বিষয়বস্তু আমি নির্বাচন করব। কেমন রাজী?

—আপনি যদি একেবারে নিছক মুঘল স্টাইলে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ আঁকাতে চান তাও চেষ্টা করতে হবে আমাকে?

আবার সেই হো হো করা দিলদরাজ হাসি। বিদেশিনী প্রশ্ন করেন, হোয়াটস্ দ্য ফান, ডার্লিং?

সে কথায় কর্ণপাত না করে রতনচাঁদ বলেন, না বিষয়বস্তুটা মুঘল যুগেরই হবে, সাবজেক্ট টু য়োর মডিফিকেশন্স ঈভন! আর হ্যাঁ, তোমার প্রথম প্রশ্নের জবাব, ছবিটির বিচার করবেন সম্রাট শাহজাহা স্বয়ং!

—সম্রাট শাহজাহাঁ?

—শাহজাহাঁ দি সেকেণ্ড। আমার স্টুডিওর আর্ট ডাইরেক্টর। মুঘল পিরিয়ডের উপর তিনি একজন অথরিটেটিভ আর্ট কনোশার! রাজী?

চারমিনারের ছাইটা ঝেড়ে ফেলে প্রিয় বললে, ডিপেণ্ডস্! ছবিটার শর্তটাই শুনেছি, সবটা শুনিনি। কী দামে অদ্ভুত খেয়ালটা চরিতার্থ করতে চান?

ভদ্রলোক কোটের ভিতর-পকেট থেকে বার করে আনেন একটা ভারি ওয়ালেট। আইভরি-ফিনিশ্ সুদর্শন একটি নামলেখা কার্ড বার করে তার পিছনে খস্ খস্ করে কি-যেন লেখেন; তারপর সেটা ওর দিকে বাড়িয়ে ধরে বলেন, অল বিজনেস্ টকস্ শুড বি ইন ক্যামেরা। হাটে-বাজারে বিজনেস্ টকস্ বেআইনি, কি বল সর্দারজী?

একগাল হাসলেন বলেই সর্দারজীর দাড়ি গোঁফের জঙ্গল ভেদ করে এক চিলতে একটা হাসির ক্ষীণ আভাস প্রকাশ পেল। রতনচাঁদ সর্দারজীকে বলেন, ভাল কথা, নাসিকে তোমার যে পিক্‌চার হৌসটা হচ্ছিল সেটার কি খবর? কবে খুলবে?

একটা শ্রাগ করে প্রেমচাঁদ সিংজী বলেন, আশা তো করছি মাস ছয়েকের ভিতর! আপনার মোঘলাই ছবি শেষ হয়ে গেলে এঁকে মেহেরবানি করে নাসিকে পাঠিয়ে দেবেন, এঁকে দিয়ে দেওয়ালে ফ্রেস্কো আঁকাতে চাই!

রতনচাঁদ পাইপটা ধরাতে ধরাতে একটা বিচিত্র হাসি হাসলেন, বললেন,

কথা দিতে পারছি না। এঁর ছবি যদিচ আপনার সিনেমা হলে পাঁ চেষ্টা করব। আর্টিস্টকে নয়, তার ছবি!

—তার অর্থ?

দেশলাইয়ের কাঠিটা ফেলবার জন্য এ্যাসট্রে খুঁজছিলেন রতনচাঁদ, এ প্রশ্নের জবাবে বলেন, অর্থ? হ্যাঁ এবার তোমার অর্থোপার্জনের কথাটা ভাবতে হয়। ক্লারা, এ কাজটা তোমার। কিছু একটা পছন্দ কর এই স্টল থেকে।

ক্লারা মোহিনী হাসলেন। সর্দারজীর জুয়েলারী দোকানে নানা ডিজাইনের অলঙ্কার থরে থরে সাজানো। ক্লারা অনেক খুঁজে পছন্দ করলেন মুক্তো বসানো একজোড়া আস্তিন বোতাম। তুলে দিলেন রতনচাঁদ দিভেচার হাতে।

— ও য়ু নটি গার্ল! আমি কি আমার নিজের জন্য পছন্দ করতে বলেছি? সর, তুমি কোন কাজের নও। আমিই দেখছি।

সামনের শো-কেস্ থেকে শেষমেশ তুলে নিলেন একটা জড়োয়া নেকলেস। তার মাঝখানে একটা হীরে বসানো লকেট। দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলে নয়, চোখের তারায় ফুটে উঠল বলেই সর্দারজীর এবারকার হাসিটা স্পষ্ট দেখা গেল। সর্দারজী যখন ওজন আর হিসাব নিয়ে ব্যস্ত রতনচাঁদ তখন ক্লারার কানে কানে ইংরাজিতে বললে, আমার টাইপিনের এই হীরেটা আর শো-কেসের ঐ হীরেটা ছিল একই খনির গর্ভে। ওরা পরস্পরকে ভালবাসত। তারপর কোন মূর্খ মণিকার একটাকে গাঁথল আমার টাইপিনে আর তার প্রেয়সীকে বন্দী করে রাখল ঐ জড়োয়া লকেটে। আমি আজ শো-কেসের কারাগার থেকে বন্দিনীকে মুক্তি দিলুম।

ক্লারা মুখ টিপে হেসে বলে, লেডি হন ডিস্ট্রেসের উপযুক্ত নাইট ইরাণ্ট!

—কিন্তু ভুলো না ক্লারা, আমি লেডি ইন্ ডিস্ট্রেসের বন্ধন মুক্তিই করতে পেরেছি শুধু, তার বিলাভেডের সঙ্গে ওর মিলনটা বাকি আছে।

—তাই নাকি?

—তা বৈ কি! আর সে দায়িত্বটা তোমার।

—আমার! মানে? ও আই সী! য়ু নটি বয়!

হীরকখণ্ডের মিলনদৃশ্যের কল্পনায় ছদ্মলজ্জায় দিব্যি লাল হয়ে ওঠার অভিনয় করে ক্লারা। প্রিয়দর্শী কিন্তু লক্ষ্য করতে ভোলে না, ক্লারার সঙ্গে চটুল রহস্যালাপরত রতনচাঁদ বারে বারেই প্রিয়দর্শীকে লক্ষ্য করছিলেন, কেন কে জানে!

অশোকা হোটেল।

খানদানী ব্যবস্থা সব। এমন পরিবেশে প্রিয়দর্শী জীবনে কখনও আসেনি। পাঞ্জাবি-পায়জামা-চপ্পলধারি এ লোকটাকে প্রথমে ঢুকতেই দিতে চাইছিল না উর্দি আঁটা দারোয়ান। প্রিয়দর্শী একটু থতিয়ে যায়। ফিরে যাবে নাকি? স্যুট পরে আসাই উচিত ছিল তার। এক জোড়া কোট-প্যান্ট তো ডাক্তার-সাহেব বানিয়ে দিয়েছিলেন ওকে। উপরতলার এই সব মানুষদের সম্বন্ধে শুধু তার কৌতূহলের অভাবই নয়, কেমন যেন অবজ্ঞা-মিশ্রিত অহৈতুকী অনীহা ছিল। আর্থিক প্রয়োজন তার যৎসামান্য। দুনিয়ায় সে একা। বিজনেস-ম্যাগনেটের নিকট সান্নিধ্যে আসাটাকে বন্ধু প্রীতমদাসের মত সে একটা দুর্লভ সৌভাগ্য বলে মনে করে না। কিন্তু এ ভদ্রলোকের কথাবার্তায় একটা অদ্ভুত আর্কষণী শক্তি আছে। চৌম্বক শক্তি। ওঁর দরাজ হাসিতে, রসিকতায়, হাবে-ভাবে কেমন যেন একটা বেপরোয়া মাদকতা আছে। প্রিয়দর্শী আর একটু তলিয়ে দেখতে চায় চরিত্রটাকে। মাঝপথে দারোয়ানের হুমকিতে মুঘল-চিত্ররসিক এই বিচিত্র ধনকুবেরটিকে হারিয়ে যেতে দিতে পারে না। পকেট হাতড়ে উদ্ধার করে আনে আইভরি-ফিনিস্ চিচিং ফাঁকটি।

এবার নরম হতে হল দ্বার-রক্ষককে। রূপালি হাতল ঘুরিয়ে কাঁচের প্রকাণ্ড দরজার ওপারে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যে বৃহৎ রিসেপ্‌শান্-রুমে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করে দিল, প্রিয়দর্শীর মত মানুষের কাছে সেটা ইন্দ্রপুরী বৈকি। ঘর জোড়া প্রকাণ্ড পারশ্য-দেশীয় পুরু কার্পেট। ও-প্রান্তে একসারি লিফটের ওঠানামার সঙ্কেতবাহী আলোকবিন্দু। মাঝে 'বার'। এ প্রান্তে একটি কোণায় একজন বিদেশিনী। রিসেপ্‌শনিস্ট! আবার দাখিল ক'রতে হল ভিজিটিং কার্ডখানা। শ্বেতাঙ্গিনী কিন্তু ভদ্রতা করে ওকে বসতে বললেন। প্রিয়দর্শী আন্দাজ পায় না, এ ভদ্রতার মূল উৎস ঐ 'আর, দিভেচা' লেখা কার্ডখানা, না তার নিজের চেহারাটা।

প্রতি বোর্ডারের ঘরে ফোন আছে। দু'শ' সতেরো নাম্বারে ফোন করলেন ভদ্রমহিলা।

ও-প্রান্ত থেকে ভেসে এল, দিভেচা।

মহিলা বলেন: আপনার কার্ড নিয়ে একজন দেখা করতে এসেছেন।

—কি নাম?

মাউথপীসে ম্যানিকিওর-করা আঙুল চাপা দিয়ে বিদেশিনী প্রিয়দর্শীকে বলেন, আস্কিং য়োর নেম, স্যর—

বলে ফোনটা ওর দিকে বাড়িয়ে ধরেন। প্রিয়দর্শী টেলিফোনটা তুলে নিয়ে বলে, প্রিয়দর্শী।

—অশোক ত্ব প্রিয়দর্শী ?

—না! প্রিয়দর্শী ত্ব আর্টিস্ট।

—ফানি! কী চায় লোকটা ? জিজ্ঞাসা কর তো।

এবার অবাক হয় প্রিয়। প্রশ্নটা শুনে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, ফোনের ও-প্রান্তবাসী এখনও উপলব্ধি করতে পারেনি যে এ-প্রান্তের রিসিভারটা হাত-কান-মুখ বদলেছে। কিন্তু তা কি করে সম্ভব ? কাঙড়া-ভ্যালি-স্কুল আর মুঘল-স্কুলের মধ্যে যে প্রভেদ রিসেপ্‌শনিস্টের মিহি-মেয়েলি কণ্ঠস্বরের সঙ্গে ওর পুরুষালি স্বরের তফাৎ তার চেয়ে অনেক বেশী। ভদ্রলোক কি সত্যিই ছুঁচো কানা ? না কি এটা ওকে প্রত্যাখ্যান করবার একটা চাল ? মোঘলাই সখ বোধহয় এতক্ষণে উপে গেছে ফোতো-কাপ্তেন সাহেবের। তা সে যাই হোক, ও-পক্ষ যখন জানলেও মানতে রাজী নয়, তখন রিসেপ্‌শনিস্ট সেজেই কাজ চালিয়ে যাবে প্রিয়। ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন আগন্তুক আসায় মেয়েটি কাউন্টারের ওপাশে সরে যায়।

—কি চায় লোকটা ? চাকরি না কণ্ট্রাক্ট ?

—কণ্ট্রাক্ট।

—আমিও তাই ভেবেছি। তাকে বলে দাও যে আজ রাতে আর একজন প্রিয়দর্শিনীর সঙ্গে আমার কণ্ট্রাক্ট হয়ে গেছে। নূতন চুক্তি আজ আর সম্ভব নয়।

—ওকে কোন টাইম দেব ?

—টাইম ? এ্যাপয়েন্টমেণ্ট ? ও গড্! এনগেজমেণ্ট প্যাডটাও খুঁজে পাচ্ছি না। বাই ত্ব ওয়ে, কিসের কণ্ট্রাক্ট ওকে একবার জিজ্ঞাসা করতো।

এতক্ষণে ইংরাজি ছেড়ে সোজা হিন্দীতে প্রিয়দর্শী বলে, মুঘল স্টাইলে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ছাড়া অন্য কোন ছবি আঁকার কণ্ট্রাক্ট।

—ডিয়ার মি! আরে সেই পাগ্‌লা-আর্টিস্ট নাকি ? সেও মাই হিরো আপ্‌!

ও-প্রান্তে টেলিফোন নামিয়ে রাখার শব্দ ভেসে আসে।

লিফ্‌টে উঠ্‌তে উঠ্‌তে প্রিয়দর্শী ভাবে, ব্যাপারখানা কি ? সমস্যার সমাধান হল দু'শ' সতের নাম্বার সুইটে পদার্পণ মাত্র! নক্ করতেই আহ্বান এল, কাম ইন প্লীস্।

প্রশস্ত ঘর। আসবাবপত্র অত্যন্ত মূল্যবান, কিন্তু বিশৃঙ্খলভাবে ছড়ানো। জানালায় পেলমেট থেকে আস্বচ্ছ নীল ট্যাপেস্ট্রী ঝুলছে। কক্ষস্বামী ডোরাকাটা সিল্কের পায়জামা আর ড্রাগন আঁকা কিমোনো জাতীয় একটা নাইট গাউন পরে কৌচে অর্ধশয়ান। উগ্র টোব্যাকোর সঙ্গে কি-একটা বিলাতী সেন্টের সৌরভ-ককটেল। আয়না-পালিশ টিপয়ের উপর গোটা দুই কাঁচের গ্লাস, বেঁটে বোতল আর রুপালি পাত্রে বরফ-কুচি, স্টেনলেস স্টিলের টং। আবছা-নীল একটা গোপন আলোর আভাসে ঘরটা প্রায় আলো-আঁধারি। রাস্তায় নিয়নবাতির কি-একটা প্রকাণ্ড বিজ্ঞাপন বারে বারে জলছে, নিবছে—খোলা জানালা দিয়ে তারই আলোয় কয়েক সেকেণ্ড বাদে বাদে এ ঘরটা যেন চম্‌কে চম্‌কে উঠছে। জানালায় শার্সি বন্ধ, কিন্তু তার উপর এ্যালুমিনিয়ামের ল্যুভার সাটার থাকায়, নীল ট্যাপেস্ট্রী ভেদ করে ক্ষণিক আলোয় বিপরীত দিকের দেওয়ালে আলো-ছায়ার ডোর-কাটা দাগ ভেসে ভেসে উঠেছে। প্রিয়দর্শীর আগমনের পরেও দিভেচা আলো জ্বালার কোন আয়োজন করলেন না। হাতের গ্লাসটা ঊর্ধ্বে তুলে বলেন, হাউ ক্যুডাই এণ্টারটেইন য়ু বয়?

বেল বাজাতে হল না। দিভেচা সাহেব অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বলেন, সাব্‌কো বাস্তে—তারপর থেমে প্রিয়দর্শীর দিকে ফিরে বলেন, কড়া কিছু চলবে?

এতক্ষণে প্রিয়দর্শী লক্ষ্য করে দেখে ঘরে তৃতীয় ব্যক্তিও একজন আছে। কোন বোর্ডার যখন 'বারে' যেতে অনিচ্ছুক হন, অর্থাৎ ঘরকেই 'বার' করেন, তখন বোধকরি কর্তৃপক্ষ তাঁর খিদমতের জন্য একটি সর্বক্ষণের ভৃত্য মোতায়েন করেন। ঘর-বার তখন একাকার হয়ে যায়। যতক্ষণ না গৃহস্বামী মাতাল হয়ে লুটিয়ে পড়েন কৌচ থেকে ভূশয্যায়, অথবা যখন বারের বিল সই করবার ক্ষমতাটা তাঁর লুপ্ত হয় ততক্ষণ হাজির থাকে সেই খিদমদগার।

—বলি, কড়া কিছু চলবে?—তাগাদা দেন দিভেচা সাহেব।

—না, ধন্যবাদ!—বাধা দেয় প্রিয়দর্শী।

—আরে তাই কি হয়? আর্টিস্ট মানুষ তুমি। একেবারে একাদশী বৈরাগী সাজলে চলবে কেন? নরম কিছুই না হয় ফরমায়েস্ করি বরং…জিন, ভারমুথ, অথবা…

—না। বরং একটা অরেঞ্জ-স্কোয়াস্!

—দেন ক্লিয়ার আউট, মাই লেম্ ডাক্!—খেঁকিয়ে ওঠেন উনি।

—কেন? আমার অপরাধটা কি হল?

—অশোকা হোটেলের দু'শ' সতের নাম্বার স্যুইটে রতনচাঁদ দিভেচা মুঘল-রাজনীতির দাবা খেলবে যার সঙ্গে তার হাতে অরেঞ্জ স্কোয়াস্! তোবা তোবা!

বুঝতে অসুবিধা হয় না ধুরন্ধর ব্যবসায়ী রতনচাঁদ দিভেচা এখন অন্যরাজ্যে। আজকে তাই 'তোম্'-সম্বোধনটা কানে বাজল না প্রিয়র। সত্যই দুস্তর ব্যবধান ঐ ধনকুবের রতনচাঁদ দিভেচা আর এই নগণ্য শিল্পী প্রিয়দর্শী চিত্রকরের। কিন্তু প্রসঙ্গটা বদলানো দরকার, না হলে এ মদ্যপ শেষপর্যন্ত কোথায় গিয়ে থামবে, কে জানে? বললে, কিন্তু মুঘল-রাজনীতি তো নয়, মুঘল-চিত্ররীতিই আজ আমাদের সান্ধ্য-আসরের আলোচ্য বিষয়।

—পুয়োর চাইল্ড!—মুখটা মুছতে মুছতে দিভেচা-সাহেব মুচকি হাসে। এ হাসি কিন্তু সেই দিল-খোলা দরাজ হাসি নয়, এ হাসি মুঘল-হারেমের খোজা-প্রহরীর মাজায় বাঁধা ক্ষুরধার ছোরার হাসি! দিভেচা বলে, রতনচাঁদ দিভেচা কেয়ার্স এ ফিগ্ ফর য়োর আর্ট এ্যাণ্ড ফিলসফি! আয়াম এ বিজনেসম্যন টু দ্য ম্যারো অব মাই বোন! ছবি নিয়ে বিলাসিতা করবার মত মন আর মেজাজ নেই আমার। চবি! ফুঃ!

প্রিয়দর্শী প্রতিবাদ করে না। বোঝে, সেটা অহেতুক হবে এ পরিবেশে। হয়তো আসাটাই ভুল হয়েছে এখন। দিভেচা আর একপাত্র তরল পদার্থ ঢেলে দেয় কণ্ঠনালীতে। আবার মুখটা মুছে নিয়ে বলে, জানি, তুমি কি ভাবছ! ভাবছ, ব্যাটা মাতাল এ অবস্থায় বিজনেস্ টক্ করবে কেমন করে? তাই না? মাই ডিয়ার বয়, বিজনেস-ডীলের এই হচ্ছে আধুনিকতম এরিনা। যে-খেলার যে নিয়ম। ছোট্ট একটা টিপয়, দুদিকে দুটি কৌচ,—এই হচ্ছে এ যুগে ডুয়েল প্রাঙ্গণ। মাঝখানে সাক্ষী থাকবে শ্বেতাশ্বচিহ্নিত বোতল। দু-পাশে থাকবে সেকেণ্ডস—সাক্ষী হিসাবে কনট্রাক্টে সই দিতে! তোমার হাতে খাপ-খোলা কলম, আমার হাতেও কোষমুক্ত লেখনী! টেন্ পেগস্ ফরোয়ার্ড! তারপর চোখ বুজে কণ্ট্রাক্ট-ডীলে মারো সই—খ্যাঁচ্-খ্যাঁচ! ব্যাস! খেল খতম্! রাত পোহালে নেশা ছুটলে হিসাব করতে বস খতচিহ্ন কতটা গভীর; আর সেটা কার বুকে বিঁধেছে! হলে রাজা, না বন্‌লে ফকির!

পাইপটা ধরাতে ধরাতে আবার বলে, নাউ, নাউ টু বিজনেস! তোমার পুরো নামটা জানা হয় নি—

—পুরো নামের কি কোন প্রয়োজন আছে?

—কিছুমাত্র নয়। কোন্ অঞ্চলের মানুষ তুমি?

—আমি বাঙালী!

—আমিও তাই ভেবেছি। এত ভাল হিন্দী শিখলে কি করে?

—জ্ঞান হওয়ার পর থেকে বিহারেই মানুষ হয়েছি।

—প্রেম করেছ কখনও?

—কি মনে হয়?

—আই উইথড্র। বিয়ে করেছ?

—না।

—থিয়েটার?

—বেগ্ য়োর পার্ডন?

—জীবনে নাটক অভিনয় করেছ কখনও?

—জীবনটাই তো একটা নাটক!

দিভেচা ধম্‌কে ওঠে, নো! এ্যাণ্ড অ্যান এম্‌ফ্যাটিক নো! নাটকে যবনিকা আছে, জীবনে নেই। নাটকে পিছন থেকে প্রম্পটিং আছে, জীবনে নেই। নাটকের প্রতিটি ডায়ালগ্ নাট্যকারের বাছে ধার করা, প্রতিটি পদক্ষেপ ডাইরেক্টরের চক দিয়ে গণ্ডি-কাটা—জীবনে তুমি স্বচ্ছন্দচারী। তাই প্রশ্ন করছি, কোন নাটকে অভিনয় করেছ কখনও?

প্রিয়দর্শী বুঝতে পারে, আজ আর কাজের কথা কিছু হবে না। কিন্তু এই অদ্ভুত মাতালটাকে ভালই লাগছিল তার। বললে, করিনি কখনও। সুযোগ পাইনি।

গ্লাসে আর একপাত্র ঢালতে ঢালতে দিভেচা বলে, সুযোগ পেলেও ও-কর্ম তোমার দ্বারা হত না।

—সেটা কেন বলছেন? সুযোগ পেলে নিশ্চয়ই পারতাম।

—আই বেগ টু ডিফার! বেশ! এখনি পরীক্ষা হয়ে যাক্। মনে কর আমি তোমার গার্ল ফ্রেণ্ড, হঠাৎ এসে বলছি যে, বাবা আমার সঙ্গে অন্য একটি ছেলের বিয়ে স্থির করেছে, আমি ছুটে পালিয়ে এসেছি তোমার কাছে, তোমাকে বলছি আমাকে উদ্ধার করতে। জবাবে তুমি আমাকে আশ্বাস দিচ্ছ, ভরসা দিচ্ছ—তুমি আমাকে উদ্ধার করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ! সিকোয়েন্সটা বুঝলে তো? নাউ আই স্টার্ট! ভুলে যাও আমার এ বেশবাস, আর চেহারা! কল্পনা কর আমি একটি অসহায়া তন্বী তরুণী, তোমাকে বলছি—

হঠাৎ উঠে দাঁড়ান দিভেচা। একটুও টলছে না তাঁর পা। অপূর্ব দক্ষ অভিনেত্রীর মত এগিয়ে এসে দাঁড়ান প্রিয়দর্শীর বুকের কাছে, দরদ দিয়ে বলে

ওঠেন, আমি সব ছেড়ে তোমার কাছেই ছুটে এসেছি প্রিয়—তোমাকে ছা আমি বাঁচব না! এই নরক যন্ত্রণা থেকে তুমি উদ্ধার কর আমাবে আবেগে তিনি প্রিয়দর্শীর হাতটা জড়িয়ে ধরেন।

প্রাণপণ চেষ্টায় উদ্দাম হাসিটাকে গিলে ফেলতে চেষ্টা করে প্রিয়, কি পারে না। খিল খিল করে হেসে ফেলে। বেশ খানিকটা হেসে বলে, এ কি ছেলেমানুষি করছেন?

দিভেচা কিন্তু একটুও হাসেন না, গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করেন, সোয়ু এ্যাক্সেপ্ট ডিফিট? হার স্বীকার করছ তুমি?

—কিন্তু জবাবে আমাকে কি বলতে হবে তা তো শিখিয়ে দেন নি।

এইবার হাসেন দিভেচা, বলে, দেয়ার য়ু আর! ঐখানেই নাটকের সঙ্গে জীবনের তফাৎ! শিখিয়ে দেওয়া হয়নি! কেন? না হয় যা মন চাইত তাই বলতে। পারলে না তো? হেরে গেলে।

কেমন যেন বোধ চেপে যায় প্রিয়দর্শীর। সেও গম্ভীর হয়ে বলে, না, হার স্বীকার করছি না। আপনি আবার বলুন।

—শিয়োর। দিস্ ইস্ মনিটার! আবারই বলছি। আমি ঘর সংসার ছেড়ে তোমার কাছে ছুটে এসেছি প্রিয়! তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না। তুমি আমাকে পথের নির্দেশ দাও, তুমি·· তুমি আমাকে বলে দাও আমি কি করব।

প্রিয়দর্শী এবার নিজেই ওঁর হাতটা টেনে নিয়ে বলে, ভেঙে পড়লে তো চলবে না বৈশাখী, মনকে শক্ত কর। আমার উপর বিশ্বাস রাখ। এভাবে আমি ব্যর্থ হতে দেব না তোমার প্রেম। না, কিছুতেই না।

হঠাৎ ওকে জড়িয়ে ধরেন দিভেচা, এক্সেলেন্ট! গ্রাণ্ড! আমিই হার স্বীকার করছি—বয়? সাবরো বাস্তে—নো, আয়াম সরি! অরেঞ্জ স্কোয়াস একঠো।

অন্ধকার থেকে সরে যায় খিদমদগার। বোধকরি অরেঞ্জ স্কোয়াসের আয়োজন তার কাছে ছিল না, না থাকাই স্বাভাবিক। দিভেচা ফিরে যায় তার টেবিলে। একপাত্র নির্জলা ঢেলে নিয়ে বলে, সুযোগ যদি পাও অভিনয় করবে?

প্রিয়দর্শী বলে, মিস্টার দিভেচা, আমি চিত্রকর, ছবি আঁকাবার প্রস্তাব ছিল আপনার। যদি সে বিষয়ে আলোচনা করবার মত মেজাজ অথবা সময় আপনার না থাকে, তাহলে আমি বরং পরে আসব।

পাইপটা তুলি নিয়ে দিভেচা বলে, বড় বেশী মাতলামি করছি, নয়? বেশ! কাজের কথাই বলব এবার। ছবিটা হবে তেল-রঙা, ক্যানভাসের উপর। মাপ, পাঁচ ফুট বাই তিন ফুট। সেনট্রাল থীমটাই শুধু ফরমাইস করব আমি! বাদ বাকি ডেকরেটিভ ডিটেইল্‌স্ তোমার যা মন চায়। বিষয়-বস্তুটা হচ্ছে তাজমহলের দ্বারোদ্ঘাটন। তাজমহল তৈরীর কাজ সবে শেষ হয়েছে। অম্বর গেটের সামনে একটা প্রকাণ্ড ডায়াস। তার উপর সিংহাসনে বসে আছেন সম্রাট শাহজাহাঁ। তাঁর দৃষ্টি সামনের দিকে—যেদিকে কালো মখমলের পর্দাটা সরিয়ে মমতাজমহলকে সবেমাত্র প্রকাশ্য করা হয়েছে। যেন মৃত্যুর যবনিকা সরিয়ে মমতাজকে মৃত্যুঞ্জয়ী করলেন সম্রাট। যেন বিরহিণী প্রেয়সীর উদ্দেশ্যে এই নবমেঘদূতকে পাঠিয়ে দিলেন নবীন যক্ষ। ব্যাক-গ্রাউণ্ডে দেখা যাচ্ছে স্নিগ্ধ তাজ, সম্রাজ্ঞীর প্রেমবিহ্বল চোখের যেন একবিন্দু অশ্রু। সম্রাটের ওষ্ঠপ্রান্তে ঐ হাসিটা কি আনন্দের না বেদনার? ফোর-গ্রাউণ্ডে, সম্রাটের ঠিক পাশেই একজন সাহেব। তার হাতে একটা নীলরঙের নক্‌শা, তাজমহলেরই প্ল্যান, মেলে ধরেছে সম্রাটের সম্মুখে। তার একধাপ নিচে যশোবন্ত সিংহ, মুরাদ, জাহানারা আর ঔরঙ্গজীব। না, সুজা নেই—সে তখন আগ্রাতেই নেই। জাহানারার দৃষ্টি অতীতমুখী, করুণ, বিষণ্ণ। ঔরঙ্গজীবের দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে, কুটিল সংশয়ী। দারাই একমাত্র লোক যে তাজমহলকে দেখছে না, দেখছে শাহজাহাঁকে। সম্রাটের আসনের তিন ধাপ নিচে দাঁড়িয়ে আছে বার্নিয়ে, আর পীয়র লো। একেবারে ওদিকে কাতার দিয়ে মানুষ। আর সেই সাধারণ মানুষের সারির প্রথম লোকটি হচ্ছে মীর ঈশা মুহম্মদ—আভূমি নত হয়ে কুর্নিশ করছে সম্রাটকে—

বাধা দিয়ে প্রিয়দর্শী হঠাৎ বলে ওঠে, বার্নিয়ে, ইশা মুহম্মদ আর পীয়র লো কে?

গ্লাসে সোডা মেশাতে মেশাতে দিভেচা বলেন, বার্নিয়ে একজন ফরাসী পর্যটক, মুহম্মদ ইস সাপোস্ টু বি দ্য আর্কিটেক্ট অফ দ্য তাজ এবং পীয়র লো? ওয়েল হি ইস্ দ্য মিসিং লিংক!

—মিসিং লিংক! মানে?

—মানে, লো হচ্ছে সেই জাতের হতভাগ্য যে ইতিহাসের হিরো হতে হতে হল না, হল নভেলিস্টের হিরো—

—আপনি বুঝি ইতিহাসের ছাত্র? প্রশ্ন করে প্রিয়দর্শী।

—তোমার বুঝি ধারণা এগুলি ইতিহাসের বিষয়বস্তু?

—নয়? প্রতিপ্রশ্ন করে প্রিয়দর্শী।

—নয়! যেন প্রতিধ্বনি করেন দিভেচা। বলেন, এগুলি কূট রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত। সাধারণ রাজনীতি নয়, প্রেমের রাজনীতি।

—প্রেমের রাজনীতি? অবাক হয়ে যায় প্রিয়দর্শী?

—জী হাঁ! মুহব্বতের রাজনীতি। সে ভারি শক্ত জিনিস। পলিটিক্যাল এথিক্স অন ল্যভ! ও তোমার রাশিয়ান ভড্‌কাতেই ডিসল্‌ভ করা যায় না, তা তুমি অরেঞ্জ স্কোয়াসে তাকে কেমন করে গুলে খাবে বাবা?

অদ্ভুত মানুষতো। ভাবে প্রিয়।

হঠাৎ ঘরের মাঝখানের দেওয়ালের এবটা অংশ খুলে যায়। পাশের ঘরের এক ঝলক কড়া আলোর ছটা এসে এই আলো আঁধারি পরিবেশকে সচকিত করে তোলে। প্রিয়দর্শী চমকে ওঠে—লক্ষ্য করে দেখে সেখানে একটা এক পাল্লার দরজা ছিল। আগে তা নজরে পড়েনি। খোলা ফ্রাস পাল্লাটার দিকে নজর পড়ামাত্র বিদ্যুদ্‌স্পৃষ্টের মত উঠে দাঁড়ায়।

বোতাম খোলা একটি মাত্র নাইটী গায়ে খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে বিশ্রস্তবাসা মদবিহ্বলা সেই মদিরাক্ষী বিদেশিনী, ক্লারা। পিঙ্গল আলু-থালু চুলগুলো কাঁধের উপর দিয়ে নেমে এসেছে বুকে। চোখে তার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। ঘরে দিভেচা ছাড়া যে আরও একজন উপস্থিত আছে মদবিহ্বলার তা বোধকরি খেয়ালই হয়নি। তার পশ্চাৎপটে দ্বিতীয় একখানা শয়নকক্ষ।

তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় দিভেচা। কে বলবে লোকটা পূর্ব মুহূর্তে মাতলামি করছিল।

—আবার উঠে এসেছ তুমি? য়ু পিগ, য়ু ডার্লিং, য়ু বীচ। আদর আর খিস্তির অথবা খিস্তির-আদর করতে করতে দৃঢ় পদক্ষেপে সে এগিয়ে আসে। অনায়াসে ওকে পাঁজা কোলা করে চলে যায় পাশের ঘরে। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে প্রিয়। রতনচাঁদ ফিরে আসে পরমুহূর্তেই। যেন অন্য মানুষ। মাঝের দরজাটা বন্ধ করে দেয়। লক করে দেয়। গম্ভীরভাবে বলে, তুমি কি রাজী আছ আমাকে ঐ তৈলচিত্রটি এঁকে দিতে?

—আছি, কিন্তু—

—দরদাম করবার সময় এখন আমার নেই। রতনচাঁদ দিভেচা কোন কমোডিটির ন্যায্য মূল্য দিতে পিছপাও নয়—বাজারে খোঁজ নিয়ে দেখতে পার। বোম্বাই যাবার ভাড়াটা রাখ। আমার ঠিকানাটাও। কাল ভোরের প্লেনেই আমি বম্বে যাচ্ছি। সেখানে দেখা কর।

প্রিয়দর্শী কিছু বলার আগেই দিভেচা একটা টানা ড্রয়ার থেকে বার করে আনে একটা ফোলিও ব্যাগ। এক বাণ্ডিল নোটের গোছা ওর দিকে ছুঁড়ে দেয়। বিস্মিত প্রিয়দর্শী নিচু হয়ে কুড়িয়ে নেয় বাণ্ডিলটা। না গুণেও তার বুঝতে অসুবিধা হয় না, বোম্বাই যাতায়াতের ভাড়া অনায়াসেই হয়ে যাবে এ টাকায়। বলে, এর কোন রসিদ—?

দিভেচা হাসে। বলে, ঘরের আলো না জেলে যে টাকার লেনদেন হয়, তার আবার রসিদ লাগে নাকি? বোকা ছেলে!

প্রিয়দর্শী তবু কিছু বলতে যায়, কিন্তু ঠিক তখনই পার্টিশানের ওপারে শোনা যায় করধ্বনি। দিভেচা একবার সেদিকে তাকায়, তারপর বিলাতী কায়দায় কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে শ্রাগ করে। হঠাৎ প্রিয়দর্শীর দিকে ফিরে মোগলাই কায়দায় নিচু হয়ে একটি অভিবাদন করে, বলে, ডিয়ার পীয়র! আজকের মত আমদরবার খতম্। সম্রাটের ডাকে এসেছে বেগম-মহল থেকে। প্লীস্ ক্লিয়ার আউট এ্যাট ওয়ান্স!

বিনাবাক্যব্যয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় প্রিয়।

অনেক ঘাটে জল খেয়ে প্রিয়দর্শী অবশেষে এসে পৌঁছালো দিভেচা প্রডাকসন্সের অফিসে। নয়াদিল্লী থেকে বোম্বাইয়ের সেণ্ট্রাল স্টেশন পাক্কা দুদিনের পথ। বঙ্কু কাজের ছেলে—কণ্ডাক্টর গার্ডকে জপিয়ে থার্ডক্লাস স্লিপার বার্থ একটা জোগাড় করে দিয়েছিল। তাই ঘুমিয়ে আসবার সুযোগ পেয়েছে এই দীর্ঘ পথযাত্রায়। দিল্লী স্টেশনে ওকে তুলে দিতে এসেছিল বঙ্কু আর প্রীতমদাস। বঙ্কু বলেছিল, ভুলে যাবেন না তো দাদা? আর প্রীতমদাস বলে, অপরাধ কিছু করে থাকলে ছোটভাই বলে ক্ষমা করবেন। ওদের এ স্নেহ ভালবাসার কিই বা প্রতিদান দেওয়া চলে? কাজের মাধ্যমে আলাপ। আবার নূতন কাজের আহ্বানে ছেড়ে চলেছে ওদের। এ ঘাট থেকে সে ঘাট। প্রিয়দর্শী ভাবছিল, হয়তো ওদের সঙ্গে আর কখনো দেখাই হবে না। সেই কথা বলতেই বঙ্কু প্রতিবাদ করে ওঠে, দেখা হবে না কেন? আপনি তো সিংজির সিনেমা হলে ছবি আঁকতে আসছেন নাসিকে।

—তোমরা থাকবে নাকি সেখানে?

—আলবাৎ! অতবড় একটা সিনেমা হাউসের ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং তাহলে করবে কে?

হঠাৎ প্রিয়দর্শীর মনে হল ওদের কিছু ছবি উপহার দিলে মন্দ হয় না।

বাঙ্কের উপর থেকে সুটকেশটা নামিয়ে সেটা খুলে ফেলে। স্কেচ-বইটা বার ক'রে তা থেকে খান দুই পাতা ছিঁড়ে নেয়। ওদের দুজনকে দুখানি ছবি দিয়ে বলে—এগুলো দেখলে তবু আমার কথা মনে পড়বে।

বন্ধু ছবিখানা সমজদারের মত দূরে ধরে, কাছে ধরে, পরীক্ষা করে। তারপ বলে, ব্যাপারটা তো বুঝলাম না দাদা! একটা ট্রেনের কম্পার্টমেণ্টে জানালা দিয়ে তাজমহল দেখা যাচ্ছে! এ ছেলেটি তো আপনি, আর এ হুরী কোন্ আশ্‌মান্ থেকে পয়দা হলেন?

প্রিয়দর্শী ওর মাথাটা সস্নেহে নেড়ে দিয়ে বলে, ফাজিল ছেলে!

—আমি যে বিশ্ববখাট তা দুনিয়াভোর সব্বাই জানে; কিন্তু আমার যে-দাদা প্রেম-প্যার-মোহব্বতের ধার ধারে না সেই দাদাই যে এখন সিক্কিং সিক্কিং ড্রিক্কিং ওয়াটার!

এবার প্রিয়দর্শী একটা থাপ্পড়ই মেরে বসে ওর মাথায়।

তারপর দুদিন ধরে শুধু চলা আর চলা। মাইলের পর মাইল, স্টেশনের পর স্টেশন পিছনে ফেলে অবশেষে এসে পৌঁছালো বোম্বাই শহরে। স্টেশনে নামবার সময় খেয়াল হল—সর্বনাশ হয়ে গেছে। রাত্রে তার নিদ্রার সুযোগে কেউ নামিয়ে নিয়েছে তার সুটকেশটা। মনটা খারাপ হয়ে গেল বেচারির। বোম্বাই শহরে পদার্পণমাত্র তার লোকসান শুরু হল। কী কী ছিল ওটার ভিতর? টাকা আর টিকিট ছিল বুক-পকেটে। খোয়া যায়নি সেসব। জামা কাপড় অধিকাংশই আছে ট্রাঙ্কে। সুটকেশে ছিল ওর ছবি আঁকার কিছু সরঞ্জাম, দাড়ি কামানোর সেটটা, মুখ ধোবার টুকিটাকি, কিছু জামা-প্যাণ্ট-তোয়ালে আর—ঐ যাঃ! সর্বনাশ হয়েছে! মায়ের ছবিখানা ছিল ঐ সুটকেশে!

একেবারে মুষড়ে পড়ে বেচারি। এর চেয়ে মানিব্যাগটা খোয়া গিয়ে ঐ ছবিখানা যদি তার কাছে থাকত! চোখ ফেটে জল এল প্রিয়দর্শীর।

কিন্তু দিন তো তা বলে বসে থাকবে না। নূতন পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে হবে। দিভেচা-সাহেবের দেওয়া ঠিকানা লেখা কার্ডটা অবশ্য খোয়া যায়নি। দাদার। সে আবার কোথায়? মালপত্র নিয়ি সোজা অফিসেই যাবে, না অন্য কোন হোটেলের খোঁজ করবে? শেষ পর্যন্ত মনস্থির করে,—না, মালপত্র নিয়ে সোজা অফিসেই যাবে প্রথমে। অফিসের কাছাকাছি কোন হোটেল খুঁজে নিতে হবে—না হলে এই বিরাট বোম্বাই শহরে দৌড়া-দৌড়ি করতে করতেই প্রাণান্ত।

একটা ট্যাক্সি নিয়ে সে রওনা দিল—দাদার!

কর্মচঞ্চল বোম্বাই নগরী। ঝকঝকে ছিমছাম পরিষ্কার। কালো পিচমোড়া সড়ক, দু-ধারে আকাশচুম্বী হাল ফেশানের প্রাসাদের সারি। নানান জাতের মানুষ আশ্রয় নিয়েছে তার কোটরে, নানান ধান্ধায়।

অনেক লাল-হলুদ-সবুজ বাতির সঙ্কেত অতিক্রম করে একসময়ে ট্যাক্সিটা এসে থামল শহরতলীর একটা গেট-ওয়ালা কম্পাউণ্ডের ভিতর। মালপত্র নামিয়ে রাস্তার ধারে রেখে দারোয়ানের শরণাপন্ন হতে হল। হ্যাঁ, এটাই রতনচাঁদ স্টুডিও—এখানেই দিভেচা পিক্‌চার্সের অফিস। যাইয়ে ভিতর।

মালপত্র দারোয়ানের জিম্মায় রেখে ভিতরে এগিয়ে যায়। ডানদিকে প্রকাণ্ড স্টুডিও শেড। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। ভিতরে নিশ্চয়ই ছবি তোলার কাজ চলছে। বাঁ দিকে সারি সারি কতকগুলি অফিস। উপরে সাইন বোর্ড আছে। প্রায় গেটের কাছাকাছি নজরে পড়ল দিভেচা প্রডাকসন্সের নামাঙ্কিত সাইন-বোর্ডটা। ছোট্ট এক চিল্‌তে বারান্দা অতিক্রম করে এ্যাসবেস্টস-ছাউনি অফিস-ঘর। ছিম্‌ছাম্ সাজানো। গ্লাসটপ টেবিলে টেলিফোন আছে; ফুলদানীতে ফুল নেই যদিও, কিন্তু এ্যাস্ট্রেতে সিগ্রেট-টুকরো এবং কাঠি উপচীয়মান। আধ খাওয়া চায়ের কাপের কোণায় মাছি। খান তিনচার চেয়ার, সোফা ও সেটি। পিছনে দেওয়াল-ঘড়ি আর ফ্রেমে বাঁধানো অনেকগুলি সিনেমা তারকার ছবি। অফিস টেবিলে একজন ভদ্রলোক একটি সিনেমা সাপ্তাহিকের পাতা ওলটাচ্ছিলেন। জিজ্ঞাসুনেত্রে তিনি তাকালেন প্রিয়দর্শীর দিকে। বিনাবাক্যব্যয়ে প্রিয় পকেট থেকে বার করে দিল দিভেচা-সাহেবের নামাঙ্কিত কার্ডখানা।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কার্ডখানা ভদ্রলোক দেখলেন, আগন্তুককেও বেশ ভালভাবে দেখে অবশেষে বললেন, আপনি কি দিভেচা-সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চান? তিনি তো এখানে নেই।

—নেই? সে কি! তাঁর তো পরশু এখানে আসার কথা।

—পরশু ছিলেন। কাল মাদ্রাজ চলে গেছেন। বুধবারে আবার আসবেন। কি দরকার বলুন তো?

—না মানে, ব্যাপারটা হয়েছে কি, উনি আমাকে দিল্লীতে এই কাডখানা দিয়ে বলেছিলেন ওঁর সঙ্গে এখানে দেখা করতে। একটা ছবি আঁকবার ব্যাপারে। আমি দিল্লী থেকে আসছি, সরাসরি স্টেশন থেকে।

! কিন্তু আমি তো এ বিষয়ে কিছু জানি না। আপনি বরং

বুধবারে একবার আসুন।

প্রিয়দর্শী বুঝতে পারে বসতে তাকে উনি বলবেন না। তাই নিজে থেকেই একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে। বলে, আপনি এ বিষয়ে কিছু জানেন না, ওঁর কোন কর্মচারীকে হয়তো উনি নির্দেশ দিয়ে গেছেন, একটু খোঁজ নিয়ে দেখুন। আমার নাম প্রিয়দর্শী, আপনার নামটা জানতে পারি?

ইতিমধ্যে কানে একটি দেশলাই কাঠি প্রবেশ করিয়ে আরামে ভদ্রলোক চোখ বুজে ছিলেন। সেই অবস্থাতেই মুদ্রিতনেত্রে বলেন, তার কি কোন প্রয়োজন আছে?

প্রিয়দর্শী কঠিন হয়। চারমিনারের প্যাকেটটা বার করে একটা সিগ্রেট ধরায়, বলে, আছে বইকি। আমার সঙ্গে তাঁর দৈনিক হারে চুক্তি হয়েছে। তাঁর নির্দেশমত তাঁর অফিসে আমি রিপোর্ট করলাম। এখন আমাকে যদি তিনদিন এখানে চুপচাপ বসে হোটেলচার্জ গুনতে হয় তবে তিনদিনের মজুরি তো আমি ছেড়ে দেব না। সে ক্ষেত্রে আপনার নাম ও পরিচয়টা আমার জানা দরকার।

সোজা হয়ে বসলেন উনি। কাঠিটা কান থেকে বেরিয়ে আসে। চোখটাও খুলে যায়। বলেন, কই দেখি কি চুক্তি হয়েছে?

—সেটা এখন আমার কাছে নেই।

—আপনি আর্টিস্ট?

—না হ'লে ফ্রেস্কো আঁকার বায়না কি দিতেন মিস্টার দিভেচা?

—ও বায়নাও দেওয়া হয়ে গেছে? আচ্ছা দেখি কি করতে পারি আপনার জন্য।

টেলিফোনটা তুলে নিয়ে ভদ্রলোক কার সঙ্গে যেন কি কথা বললেন গুজরাতি ভাষায়। তারপর বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে ডেকে হিন্দীতে বললেন, একে শাহজাহানের কাছে নিয়ে যাও।

বেরিয়ে এসে বেয়ারাটাকে প্রশ্ন করে প্রিয়, এ ভদ্রলোক কে?

—উনি স্বরূপদাসজি। এ্যাসিস্টেন্ট প্রডাকশন ম্যানেজার।

—আর শাহজাহান কে?

—আর্ট ডাইরেক্টর। আসুন আপনি।

এ-পথ সে-পথ দিয়ে স্টুডিওর ভিতর ওকে নিয়ে গেল লোকটা। প্রথমটা আলো-আঁধারি! তারপরই স্টুডিওর কৃত্রিম জোরালো বাতির ঝলমলানি। স্যুটিং চলছে। লোকটা ওকে সাবধান করে দিল যেন কোন শব্দ না করে।

আলোকিত অংশটুকু অতিক্রম করে ওধারের গেট দিয়ে ফের বের হয়ে গেল তারা। এসে থামল একটা আউট-হাউস মত স্থানে। ঘরটা গুদাম, নানান জাতের ছবি, মূর্তি আর কিউরিওর গুদাম! অনেক লোক কাজ করছে সেখানে। কেউ প্লাস্টারের ছাঁচ বানাচ্ছে, কেউ ছবি আঁকছে, কেউ বা বানাচ্ছে ফর্মা। ও-প্রান্তে টুলের উপর বসেছিল একজন বৃদ্ধ। শুভ্র কেশ, শুভ্র শ্মশ্রু। পরনে পায়জামা, ঊর্ধ্বাঙ্গে মেরজাই। মাথায় কাজকরা মলমলের সাদা টুপি, একবুক সাদা দাড়ি। নি.সন্দেহে লোকটা মুসলমান।

বেয়ারা তার কাছে প্রিয়দর্শীকে পৌঁছে দিয়ে বললেন স্বরূপদাসজি এঁকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন শাহজাহান সাব।

শাহজাহান একটা শিল্প-নিদর্শন পরখ করছিল, বাঁ হাতটা তুলে গোল করতে বারণ করল।

বেয়ারাটা প্রিয়র দিকে ফিরে বললেন, ইনিই শাহজাহান-সাব, আর্ট ডাইরেক্টর।

এই পর্যন্তই কর্তব্য ছিল তার। তাই একথা বলেই ফিরে চলল লোকটা।

শাহজাহান যে শিল্প-নিদর্শনটি পরীক্ষা করছিলেন সেটা একখানা ড্যাডো-টালির ডিজাইন। ড্রইং-বোর্ডের সঙ্গে পিন দিয়ে আঁটা একখণ্ড কাগজ আঁকা একটা নক্‌শা। পাশে দাঁড়িয়ে আছে এক ছোকরা।

একদৃষ্টে ছবিখানার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে শাহজাহান ছোকরার দিকে ফিরল। উর্দু মিশ্রিত হিন্দীতে বলে, 'প্যাপিরাস্' কাকে বলে জান?

ছেলেটি জবাব দেয় না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

—'আইয়নিক ভল্যুট' কাকে বলে বলতে পার?

ছেলেটি তবু নিশ্চুপ!

—জবাব দিচ্ছ না কেন?—খেঁকিয়ে ওঠে শাহজাহান।

এবার ছেলেটি ভয়ে ভয়ে বলে—না!

ফ্যাঁস করে ছবিখানা ছিঁড়ে দিয়ে ড্রইং বোর্ডটা ঠেলে ফেলে দেয় শাহজাহান। চিৎকার করে ওঠে, কিছুই যখন জান না তখন দেখে দেখে নকল করলে না কেন? অরিজিনাল ডিজাইন বানাবার সখ হয়েছে না? তা করতে হলে পেটে বিদ্যে থাকা চাই, বুঝলে?

বলে, অম্লানবদনে ছেলেটির পেটে মারাত্মক একটা খোঁচা মেরে বসে। গুঁতোটা নির্বিবাদে হজম করে শিল্পী ছোকরা। তবু রাগ গেল না শাহ-জাহানের। সে চিৎকার করতে থাকে, ইণ্ডো-স্যারাসেনিক ডিজাইন আঁকতে

দিলাম তোমাকে, এনে যা হাজির করলে তার ফুলের পাঁপড়িগুলো হল গ্রীক প্যাপিরাস, আর আঙুরলতার শুঁড়গুলো হল আইয়নিক ভল্যুট! যত গাধা আর গরু নিয়ে 'তাজের স্বপ্ন' দেখছি আমি! যাও! যে নক্‌শা তোমাকে দিয়েছি গ্রাফ করে তাই শুধু এনলার্জ করে নিয়ে এস। যাও, দূর হও।

মাথা নিচু রেখেই বোর্ডটা তুলে নিয়ে ছেলেটি চলে যায়।

প্রিয়দর্শী বুঝতে পারে—ইনিই দিভেচা বর্ণিত মুঘল পেইণ্টিংস্-এর আর্ট-কনৌসার। এতক্ষণ চুপ করে অপেক্ষা করছিল সে, এবার বলে, আপনিই মিস্টার শাহজাহান?

—মিস্টার নই, আমি শুধু শাহজাহান! সে কথা তো ঐ বেয়ারাটাই বলে গেল। শোনেননি?

—হ্যাঁ শুনেছি। আমাকে মিস্টার দিভেচা এখানে আসতে বলেছিলেন একটা ফ্রেস্কো আঁকার কাজে। আমার নাম প্রিয়দর্শী। বলেছিলেন, পাঁচ বাই তিন সাইজের একটা ফ্রেস্কো তাঁর দরকার—তাজমহলের দ্বারোদ্ঘাটন। আপনি কিছু জানেন সে সম্বন্ধে?

শাহজাহান কোন জবাব দিল না, মেরজাইয়ের পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করে ফুঁ দিল, তারপর ধীরে সুস্থে সেটা ঠোঁটের কোণে চেপে ধরে লাইটার জেলে ধরালো বিড়িটা।

—কই আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন না?

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে শাহজাহান বললে, আপনি জানেন, আইয়নিক ভল্যুট কাকে বলে? কেমন করে তা আঁকতে হয়?

ভিতরে ভিতরে প্রচণ্ড রাগ হলেও প্রিয়দর্শী বললে, জানি।

—তাজমহল দেখেছেন?

—দেখেছি দূর থেকে। কেন বলুন তো?

হো হো করে হেসে ওঠে শাহজাহান, বলে—তাহলে আপনিই তো সবচেয়ে উপযুক্ত লোক। যেহেতু দূর থেকে আপনি তাজমহলের পাষাণ দেখেছেন, কাছে এসে তার প্রাণটা দেখেননি। অন্তরের মমতাজ-নারীর প্রতি আপনার কোন কৌতূহল নেই—বাইরের শাহজাহাঁকে সালাম জানিয়েই ফিরে এসেছেন আপনি! তোবা! তোবা!

প্রিয়দর্শী হিন্দী ছেড়ে সোজা বাংলায় বলে, আপনি বাঙালী?

শাহজাহান চোস্ত লক্ষ্ণৌ-হিন্দীতেই জবাব দেয়, তোমার দ্বারা হবে না বাবুজি! ঐ ছবিটাই এ গল্পের প্রাণ।

প্রিয়দর্শী হাসল, বললে, নারাজ হচ্ছ কেন শাহজাহান—সা'ব? আমার দ্বারা যদি নাই হবে তবে এখানে উপযুক্ত আর্ট-ডাইরেক্টর থাকা সত্ত্বেও দিল্লী থেকে আমাকে বায়না করে আনানো হবে কেন?

হঠাৎ টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো শাহজাহান। আহত কালনাগের মত। কোন জবাব দেয় না। অর্ধদগ্ধ বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হন্ হন্ করে কোথায় চলে যায়।

প্রিয়দর্শী বুঝতে পারে অবস্থাটা। ঠিক আছে। বুধবার পর্যন্তই অপেক্ষা করবে সে। দিভেচা ফিরে আসা পর্যন্ত। ধীর পায়ে সে বেরিয়ে আসে, গুদামঘর থেকে বেরিয়ে গেটের কাছ বরাবর আসতেই কে যেন ছুটে এসে ধরল তাকে পিছন থেকে। বললে, মাপ করবেন, আপনিই কি প্রিয়দর্শী? আর্টিস্ট?

প্রিয় ঘুরে দাঁড়ায়। এ সেই ছেলেটি যাকে ধমক দিচ্ছিল শাহজাহান। বললে, আমাকে চেনেন আপনি?

—আপনি ছবিটা আঁকতে আসছেন এ কথা শুনেছি। আপনি এক কাজ করুন। প্যাটেল-সাহেবের সঙ্গে দেখা করুন। শাহজাহান আপনাকে কেন সহ্য করতে পারছে না তা নিশ্চয় বুঝেছেন। লোকটা এক নম্বর হারামি। আঙুলহারা হয়ে ডানহাতের বুড়ো আঙুলটাই ওর জখম হয়েছে। নিজে আই আর তুমি ধরতে পারে না। আর কারও হাতে তুলি দেখলেও সহ্য করতে পারে না।

—প্যাটেল-সাহেব কে?

—ম্যানেজার সা'ব। কাল তিনিই শাহজাহানাকে বলছিলেন আপনার কথা। আমি শুনতে পেয়েছিলাম। বুড়ো ঘুঘুটা জানে আজ আপনার আসার কথা। স্বীকার করল না।

—ও আচ্ছা, ধন্যবাদ। পরে আলাপ হবে।

—হ্যাঁ আমি যাই, বেটা যদি দেখতে পায় আপনার সঙ্গে আলাপ করছি—

আর কথা না বাড়িয়ে ছেলেটি ফিরে যায়। প্রিয়দর্শীও ফিরে আসে অফিসে। এখন আর স্বরূপদাস একা নেই। আরও দু-চার জন এসে জুটেছেন। শাহজাহানও বসে আছে গুম্ হয়ে। ডানহাতের মধ্যমা আর অনামিকার মধ্যে বিড়ি ধরে হু হু শব্দে টেনে চলেছে ক্রমাগত। প্রিয়দর্শীকে দেখে মুখটা ঘুরিয়ে নেয়। ঘরে সব কয়টি চেয়ারেই লোক বসে আছে। ওর আগমনে আলোচনাটা ব্যাহত হল না। কেউ যেন গ্রাহ্যই করল না তাকে। অগত্যা প্রিয়দর্শী গিয়ে বসল একটা কাঠের প্যাকিং বাক্সের উপর। সঙ্গে

সঙ্গে স্বরূপদাস বলে ওঠে, ওতে বসবেন না—ওতে র-ফিল্ম আছে।

প্রিয়দর্শী বলে, মিস্টার প্যাটেল কোথায় আছেন?

—দু-নম্বর ফ্লোরে। আপনি বরং বাইরে অপেক্ষা করুন।

প্রিয়দর্শী মর্মান্তিক চটেছে। বললে, অপেক্ষা করার আমার সময় নেই। আপনি প্যাটেল সাহেবের কাছে খবর পাঠান। বলুন মিস্টার দিভেচার বাহু থেকে একটি বিশেষ মেসেজ নিয়ে আমি এসেছি। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—আমি দুঃখিত। দু-নম্বরে এখন স্যুটিং চলছে। এখন খবর দেওয়া সম্ভব নয়। দুটো পর্যন্ত স্যুটিং চলবে।

প্রিয়দর্শী অগত্যা বাইরের টুলে গিয়ে বসে। মেজাজটা খিঁচড়ে যায় ওর। বোম্বাই শহরে পদার্পণ থেকেই ওর অদৃষ্টে যেন শনি লেগেছে। প্রথমেই সুটকেশটা গেল হারিয়ে। এখানে কেউ তাকে পাত্তা দিচ্ছে না। শাহজাহান যে কেন তার প্রতি বিরূপ হয়েছে তার একটা যুক্তিসম্মত কারণ পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু স্বরূপদাস তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছে কেন? সিনেমা জগতে ঢুকতে হলে কি ধাপে ধাপে দস্তুরি দিয়ে ঢুকতে হয়? সে সরাসরি দিভেচা-নিয়োজিত লোক বলেই কি এরা তাকে পাত্তা দিচ্ছে না? তা সে যাই হোক, এ পর্যায়ের শেষ পর্যন্ত না-দেখে সে যাবে না।

নানান জাতের মানুষের আনাগোনা লেগেই আছে। স্টুডিওর গেটের সামনে একটা রেস্তোরাঁ। তার পাশে পানবিড়ির একটা দোকান। একটা ঘ্যান্ ঘ্যানে হিন্দী গান বেজে চলেছে রেডিওতে। সামনের রাস্তা দিয়ে নানান জাতের গাড়ির মিছিল। পাশের ঘরেই বসেছে একটা জমাটি মজলিশ্। হো হো আওয়াজ ভেসে আসছে সেখান থেকে। বিচিত্র এই জগত। এর সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই ওর। হঠাৎ পরপর দু-খানা গাড়ি এসে ঢুকল গেট দিয়ে। দারোয়ান আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। একখানা উইলিস্ পিক্আপ ভ্যান, তার পিছন পিছন একটা সাদা রঙের এ্যাম্বাসাডার। গাড়ি থেকে যাত্রীরা নামছেন। স্বরূপদাস, শাহজাহান এবং অন্যান্যরা এগিয়ে গেলেন অফিস ছেড়ে। সামনের পিক্-আপ ভ্যান থেকে যাঁরা নামলেন তাঁদের মধ্যে একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোকের দিকে সহজেই দৃষ্টি পড়ে। বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, মাথার চুলগুলো অবিন্যস্ত, চোখে চশমা, দাঁড়ি গোঁফ কামানো। না, কামানো নয়, আজ সকালে কামানো হয়নি। উর্ধ্বাঙ্গে একটি ঢিলে-হাতা গরম পাঞ্জাবি, নিম্নাঙ্গে পায়জামা, পায়ে চপ্পল। হাতে একটা লাঠি। পায়ে চোট পেয়েছেন

বোধহয়, একটু খুঁড়িয়ে হাঁটছেন তিনি। স্বরূপদাস আর শাহজাহান হাত তুলে তাঁকে নমস্কার করে। স্বরূপদাস বলে, আজ পায়ের ব্যথাটা কেমন আছে স্যার?

আগন্তুক হেসে বলেন, পায়া ভারি হয়েছে আর কি!

হাসল সবাই। হিন্দীতে পা-ভারি হওয়ার একটা যোগরূঢ় অর্থ আছে, যা নাকি বাঙলার পায়াভারির সমার্থক নয়। তাই হাসিটা হাসতে হল মুখটিপে। প্রিয় আন্দাজ করে যদিচ সিনেমা তারকার মত এঁর সাজ পোশাক নেই, তবু তিনি এ রাজ্যের একজন হোমরা-চোমরা। ভদ্রলোক মেক্‌আপ নিয়েই আসেননি তো? হয়তো ইনি একজন নামকরা সিনেমা আর্টিস্ট—একদিনের না-কামানো দাড়িতে অভিনয় করতে হবে আজ ওঁকে। হিন্দী চিত্রজগৎ সম্বন্ধে প্রিয়দর্শীর জ্ঞান সীমিত। তাই হয়তো ও চিনতে পারছে না।

ইতিমধ্যে পিছনের এ্যাম্বাসাডার গাড়ি থেকেও যাত্রীরা নেমে পড়েছেন। বেশ একটা জটলা হয়েছে গেটের সামনে। হঠাৎ নজর গেল প্রিয়দর্শীর ঐ পিছনের গাড়ির একজন ভদ্রমহিলার দিকে। স্তম্ভিত হয়ে যায় সে! মেয়েটির পরিধানে হাল্কা নীল রঙের একটা সিফন-শাড়ি, ম্যাগিয়া কাট রঙ মেলানো জ্যাকেট, খোঁপায় গোঁজা একটা গোলাপ, কপালে ছোট্ট একটা কালো টিপ্! দুরন্ত বিস্ময়ে প্রিয়দর্শী নির্বাক তাকিয়ে থাকে!

বৈশাখী!

এতক্ষণে মেয়েটিও দেখতে পেয়েছে ওকে। সেও যেন স্তম্ভিত হয়ে যায়। প্রিয়দর্শী ধীর পায়ে এগিয়ে আসে। হাত দুটি বুকের কাছে তুলে প্রিয়দর্শী বলে, নমস্কার! আপনি এখানে?

মেয়েটির বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি, তবু সামলে নিয়ে কোনক্রমে বলে, মাপ করবেন, আপনাকে ঠিক···

—কী আশ্চর্য! চিনতে পারছেন না? আপনি বৈশাখী দেবী তো? মাসখানেক আগে দিল্লী এক্সপ্রেসে—

বাধা দিয়ে মেয়েটি বলে, আপনি বোধহয় আর কারও সঙ্গে আমাকে ভুল করছেন। আমার নাম বৈশাখী নয়।

প্রথমটা কেমন যেন থতমত খেয়ে যায় প্রিয়দর্শী। ভুল তার হয়নি, হতে পারে না। এ তার বিস্মরণের যুগের ঘটনা নয়, মাত্র মাসখানেক আগে সে মেয়েটিকে দেখেছে। তার মুখ, চোখ, হাব-ভাব, তার কণ্ঠস্বর, হাসি সমস্তই স্পষ্ট মনে আছে ওর। ভুলে যাওয়ার মত চেহারা নয় মেয়েটির, আর ভুলে

থাকার মত মনের অবস্থাও নয় প্রিয়দর্শীর। তাহলে ও এমনভাবে অস্বীকার করছে কেন? প্রিয়দর্শী আবার বলে, কী আশ্চর্য। আগ্রা স্টেশনে—

মেয়েটি পার্শ্ববর্তী ভদ্রলোকের দিকে ফিরে বললে, নিন চলুন। দাঁড়ালেন কেন আবার?

হ্যাঁ চলুন—বলে এগিয়ে যান তিনি। তবু একবার পিছন ফিরে প্রিয়দর্শীকে যাচাই করে নেন, বুঝে নিতে চেষ্টা করেন মেয়েটি জ্ঞাতসারে অস্বীকার করছে অথবা ছেলেটিই ভুল করছে।

ওরা সদলবলে স্টুডিওর ভিতর ঢুকে যায়।

শাহজাহান স্বরূপদাসের দিকে ফিরে বলে, সিনেমা-স্টারদের সঙ্গে ভাব জমাবার জন্য কত রকম হ্যাংলামোই না করে মানুষ!

স্বরূপদাস কোন জবাব দেয় না।

হালকা হাসির একটা ঢেউ বয়ে গেল উপস্থিত সকলের উপর দিয়ে। ভিড়টা পাতলা করে দিয়ে তারাও চলে যায় অফিস ঘরের দিকে। প্রিয়দর্শী স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। শাহজাহানের বিদ্রূপবাণ তাকে বিদ্ধ করেনি। সে আপন মনেই বিভোর হয়ে ছিল। শাহজাহানের কথা ওর কানেই যায়নি। কেন ওকে এভাবে অস্বীকার করল বৈশাখী? সে কি তাকে চিনতে পারেনি? অসম্ভব। তাহলে? বৈশাখীর কি যমজ বোন আছে? ও নিজেই কি ভুল করল? অথবা হয়তো সর্বসমক্ষে বৈশাখী ওদের পরিচয়টা স্বীকার করতে চাইছে না। তার মানে কি ধরে নিতে হবে বৈশাখীর সঙ্গে প্রিয়দর্শীর এমন একটা সম্পর্ক আছে যা ট্রেনের হঠাৎ আলাপের চেয়ে নিকটতর? প্রিয়দর্শী কি নিজেই সেই মথুরাবাবুর ভাগ্নে? ওর গল্পলোকের সেই যে নিরীহ ছেলেটি, যে কাঠবিড়ালীদের ছোটাছুটি দেখত নির্জন আমবাগানের ডালে ডালে, টোপর-মাথায় যে ছেলেটি গিয়েছিল ভিন গাঁয়ের একটি মেয়েকে বিয়ে করে আনতে, কবুতরের বুকের মত নরম একখানা হাতের উপর রেখেছিল হাত, সেই মথুরাবাবুর ভাগ্নে আর প্রিয়দর্শী কি অভিন্ন আত্মা? বৈশাখী কি সেই লাজুক ভীরু কিশোরটিকে চিনতে পেরেছে বলেই অস্বীকার করছে ট্রেনের হঠাৎ হঠাৎ আলাপটাকে?

কখনও কি এমন অবস্থায় পড়েছ? যখন অত্যন্ত কাছের মানুষ অচেনা সেজে সরে দাঁড়াতে চায়, অথচ সেই অচেনা মানুষটাকে অতি আপন বলে দাবী করবার মূলধন নেই তোমার হাতে? যার ছবি দিনের চিন্তায়, রাতের স্বপ্নে একমাস ধরে তোমাকে বিভ্রান্ত করেছে, যাকে গড়-ঠিকানার মানুষ বলে

বাতিস করেছিলে তুমি, সে হঠাৎ এসে দাঁড়াল তোমার সামনে, আর বলল, মাপ করবেন, আপনাকে তো আমি চিনি না! মেয়েটি নিজেকে বৈশালী বলেই স্বীকার করছে না, তাকে গল্পলোকের মথুরাবাবুর ভাগ্নের কল্পলোকের রাজকন্যা বলে প্রিয়দর্শী দাবী করবে কিসের জোরে?

জুহুবীচের যে অংশটায় প্রতি রবিবারে আর ছুটির দিন সারা বোম্বাই শহর ভেঙে পড়ে সেটা পার হয়ে একটা পীচের রাস্তা চলে গেছে উত্তর মুখো। তারই বাঁকের মাথায় একখানা প'ড়ো ভাঙা বাড়িতে হিমাদ্রী রায়ের আস্তানা। পাড়াটা অভিজাত। হাল আমলের স্ট্রীম-লাইন্ বাঙলোর ভীড়ে হাঁসের মেলায় হাড়গিলের মত এই নড়বড়ে বাড়িটা কেমন করে যে হাড়-পাঁজরা বার করে টিকে আছে, সে একটা বিস্ময়, ও পাড়ার মানুষ অবশ্য তার কারণটা জানে। বাড়িটায় যিনি ভাড়া আছেন তিনিই এজন্য দায়ী। শতাব্দীর একপাদ ধরে তিনি ঐ বাড়িটা দখল করে আছেন। প্রথম যখন তিনি আসেন তখন এ বাড়ির আশেপাশে প্রায় সবটাই ছিল ফাঁকা মাঠ। তারপর ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে জমজমাট হয়ে উঠেছে পাড়াটা। নতুন নতুন হাল আমলের বাড়ি হয়েছে, দোকান হয়েছে—নিয়ন বাতির আলোয় ঝলমল হয়ে উঠেছে অঞ্চলটা। বাড়ির মালিক চেষ্টার ত্রুটি করেননি, নানান ভাবে উত্যক্ত করে, মামলা লড়ে কিছুতেই তিনি এই সাবেক ভাড়াটিয়াটিকে তাড়াতে পারেননি। ইদানিং হাল ছেড়ে দিয়েছেন, বন্ধ করে দিয়েছেন মেরামতির কাজ। বাড়িখানা যদি হাড়গোড় ভেঙে হুড়মুড়িয়ে পড়ে তবে বাড়ির মালিকই সবচেয়ে খুশী হবেন; কারণ একমাত্র তাহলেই সম্ভব হবে ঐ প্লটে নূতন একখানা হাল-আমলের বাড়ি-হাঁকানো। কিন্তু সে আশা দুরাশা থেকে নিরাশায় পরিণত হতে চলেছে ক্রমে। পাল্লাহীন জানলা, ইট-বার-করা দেওয়াল, অশ্বত্থের চারা-বিভূষিত ফাটা ছাদের এই বাড়িখানায় নির্বিবাদে এখনও বাস করছেন পঁচিশ বছরের ভাড়াটিয়া হিমাদ্রী রায়।

কোন অচেনা লোক যদি ও পাড়ায় গিয়ে পঁচিশ বছরের বাসিন্দা হিমাদ্রী রায়ের খোঁজ করেন তাহলে তিনি যে ঐ হাড়-পাঁজরা বার করা বাড়িটা খুঁজে পাবেন এতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তার কারণ এ নয় যে হিমাদ্রী রায় ঘরকুনো মানুষ—ও পাড়ায় অজ্ঞাত। তাঁকে সকলেই চেনে, কিন্তু পাড়ায় ও বে-পাড়ায় তাঁকে সকলে জানে তাঁর ছদ্মনামে;—সে নামটা 'শাহজাহান।'

চন্দননগরের বনেদী রায়বাড়ির ছেলে হিমাদ্রী রায় কেমন করে

'শাহজাহান' হয়ে গেলেন সে ইতিহাস জানাতে হলেআর একখানা উপন্যাস লিখতে হয়। চন্দন নগরের সাবেকী রায়বাড়িতে সরিকী জগদ্ধাত্রীপুজো আজও হয়—শাহজাহান সাহেবের কাছে নিমন্ত্রণপত্র আসে না। এখনও রায়বাড়িতে খোঁজাখুজি করলে হয়তো বুড়ো-বুড়ি দু-একজনকে পাওয়া যাবে, যাঁরা সেই ছোট্ট হিমুর প্রাক্তন ইতিহাসটা বলতে পারেন; কিন্তু কে আর সেই হারানো ইতিহাসের পোকায় খাওয়া অধ্যায়টা খুঁজতে যাচ্ছে? শাহজাহান সা'বেক এ বিষয়ে প্রশ্ন করা বৃথা। রাগী, বদমেজাজি মানুষটা হয়তো আচমকা এক ঘা মেরেই বসবে প্রশ্নকর্তাকে।

বোম্বাই শহর যে শাহজাহানকে চেনে সে একজন গুণী শিল্পী। এককালে তার ছবি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদর্শনীতে স্থান পেত। সে-আমলের রাজা-মহারাজার চিত্রশালায় আজও খুঁজলে 'এইচ. আর' নামাঙ্কিত বড় বড় অয়েল-পেন্টিং দেখতে পাওয়া যাবে। বনেদী ঘরের ব্রাহ্মণ সন্তান বলে নয়, জাতশিল্পী হিসাবেই বোম্বাই শহর গ্রহণ করেছিল শাহজাহানকে। এখনও যেদিন ঘুম-না-আসা রাতে উদাসীন খেয়ালী মানুষটা নড়বড়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে গিয়ে জলের ট্যাঙ্কটার উপর বেহালাখানা নিয়ে বসে সেদিন আশ্‌পাশের বাড়ির রেডিওর কানে মোচড় পড়ে। ছাদে ছাদে, বারান্দায় বারান্দায় মোড়া-চেয়ার-কৌচ টেনে বসে যায় প্রতিবেশীরা—সমুদ্র-গর্জনের সঙ্গে মিশে যায় সিন্ধু-কাফি অথবা কানাড়ার মূর্ছনা; চিরযুগের বিরহী আত্মার বিমূর্ত বিলাপ হাহাকার করে ফেরে জুহু বীচের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে। পাড়ার বখাটে ছেলের দল বলে, আজ রাতে মমতাজের বিরহে সম্রাট শাহজাহান কাঁদছেন। পঁচিশ বছর আগে এ বাড়িতে যে হিমাদ্রী রায় এসে প্রথম আশ্রয় নিয়েছিলেন আজকের শাহজাহান যে তাঁরই ফসিল এটা মেনে নেওয়া কঠিন। সে হিমাদ্রী রায় ছিল চব্বিশ বছরের উঠতি জোয়ান। একহারা লম্বা আকৃতি, চুলগুলো পিছনে ফেরানো। সোজা হয়ে হাঁটতো সে। আর আজকের শাহজাহান যেন পঞ্চাশ বছর বয়সেই ষাট বছরের বুড়ো। একমাথা সাদা চুল, চোখ দুটো কোটরগত, গাল দুটো তুবড়ে গেছে। তিরিক্ষে বদমেজাজি মানুষটা সারা দিন বিড়ি ফোঁকে আর খক্ খক্ কাশে। আমূল বদলে গেছে লোকটা।

সংসারে দুটি মাত্র প্রাণী। বাপ আর মেয়ে। চাকর নেই, ঠিকে ঝি পর্যন্ত আসে না। শুধু বাজারটা করে দেওয়ার দায়িত্ব শাহজাহানের—বাকি সব দায় তার মেয়ের। প্রতিবেশীরা মনে করতে পারে না, ও বাড়িতে কখনও কোন অতিথিকে এসে আশ্রয় নিতে দেখেছে। বাপ রাগী, বদমেজাজি,—

মানুষজনের সঙ্গ তার বরদাস্ত হয় না। তার চেয়েও অদ্ভুত তার মেয়ে। অসম্ভব আত্মকেন্দ্রিক। পাড়ার কোন ছেলে বা মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়নি শ্রবণার। অবশ্য পাড়ায় ওর সমবয়সী যেসব ছেলেমেয়েরা আছে তারা অন্য সমাজের লোক। অবাঙালী বলে নয়, তারা সবাই উচ্চকোটির জীব। মটোর গাড়ি ছাড়া তারা পথে পা বাড়ায় না। তারা কেমন করে আলাপ জমাবে সেই মেয়ের সঙ্গে যার বাড়িতে ঠিকে ঝি-টি পর্যন্ত আসে না। তাছাড়া অত্যন্ত অভিমানী মেয়ে এই শ্রবণা। পাছে কথাবার্তায় হাবে-ভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে যে ওরা গরীব—তাই সযত্নে এড়িয়ে যায় প্রতিবেশীদের। উচ্চকোটির প্রতিবেশী ছেলেমেয়েরা তাদের বড়লোকমি নিয়ে যতটা উন্নাসিক, শ্রবণা যেন তার চেয়েও নিজের অভাবগ্রস্ততা সম্বন্ধে সচেতন। নির্বান্ধব ভাঙা বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে কেটেছে তার বাল্য, স্কুল-কলেজেও তার সঙ্গী-সাথী বড় একটা কেউ হয়নি। শ্রবণা জানে সেজন্য সে নিজেই দায়ী।

হলে হতে পারত বাপই তার খেলার সাথী। শৈশবের কথা জানে না, বাল্যে তাই হয়েছিল। ওকে মিস্ স্মিথের স্কুলে পৌঁছে দিয়ে বাপি চলে যেত কাজে, স্টুডিও-তে অথবা সিনেমা পাড়ায়। সারাদিন সিস্টারের সঙ্গে থাকত সে। আবার সন্ধ্যায় ফিরে আসার পথে সিস্টার স্মিথের বাড়ি থেকে ওকে নিয়ে আসত বাড়িতে। মেয়ের সঙ্গে বসত খেলার আসরে। বাপির সঙ্গে পুতুল খেলেছে, লুডো খেলেছে, এমন কি লুকোচুরি পর্যন্ত! মিস্ স্মিথের স্কুলেও ছিল নানান রকম খেলার আয়োজন। গান আর খেলার মাধ্যমে অনেকগুলি বাচ্চাকে নিয়ে দিনটা কেটে যেত মিস্ স্মিথের। কিণ্ডারগার্টেন স্কুল। ও পাড়ায় ঐটেই একমাত্র ভাল স্কুল ছিল এতদিন। গুটি দশপনেরোর বেশী ছাত্র-ছাত্রী নিতে চাইতেন না উনি। বলতেন, আমার বাগানে এর চেয়ে বেশী ফুলের চারা ধরে না—তাহলে ওরা খেলার জায়গা পাবে না। শ্রবণার জীবনে এই মিস্ স্মিথের ভূমিকাটাও বড় কম নয়। মাতৃহীন বলেই বোধহয় শ্রবণাকে তিনি বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখতেন। আর পাঁচটা মেয়ের চেয়ে তার আদরটা যেন নিবিড়তর ছিল। এই নিঃসঙ্গচারিণী সন্ন্যাসিনীকে শ্রবণা শুধু শ্রদ্ধা করত না, ভালবাসত।

কিন্তু দেহে মনে বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সে যেন ক্রমশঃ বাপির কাছ থেকে দূরে সরে গেল। বাপিও বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন বদলে যেতে থাকে। মদের মাত্রাটা সে হঠাৎ ভয়ানক বাড়িয়ে তুললে। কৈশোরের প্রথম থেকেই বাপ-মেয়ের সম্পর্কটা কেমন যেন মাধুর্য রস হারালো। আজন্ম

অহরহ বাপিকে যেন ওর আর বরদাস্ত হয় না। যে চড়টা চাপড়টা ছেলে-বেলায় শুধু গায়েই লাগত, মনে দাগ কাটত না, ক্রুক ছাড়ার পর সেগুলো ওর কাছে মনে হতে থাকে অত্যাচার, নির্যাতন! বাল্যে যে নিঃসঙ্গ জীবনটাকে ও স্বাভাবিক বলে স্বীকার করে নিয়েছিল, জ্ঞানবৃদ্ধি হবার পর সেই একান্তবাসী নিঃসঙ্গ জীবনটাকে অস্বাভাবিক, অসহ্য বলে স্বতঃই মনে হয়েছে তার। কেন তারা এভাবে অন্তেবাসীর জীবনযাপন করে? কেন দেশের বাড়ির সঙ্গে ওদের কোন সম্পর্ক নেই? কেন সেখান থেকে কেউ বোম্বাই শহরে এলেও ওদের খোঁজ খবর নেয় না? প্রথমটা স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন করেছে বাপিকে, নিছক কৌতূহলে—কিন্তু পরিবর্তে সন্তোষজনক কোন উত্তর তো পায়ই নি, উপরন্তু অহেতুক ধমক খেতে হয়েছে। আদি যুগে এ জন্য বালিশে মুখ লুকিয়ে কত রাত সে কেঁদেছে। বাপির ব্যবহারে মর্মাহত হয়েছে। সকলেরই দাদা-দিদি-মাসি-খুড়ি-দাদু-দিদা আছে, তার কি একেবারে কিছুই থাকতে নেই? মিস্ স্মিথকে প্রশ্ন করেছে; তিনি বলেছেন—এতে আশ্চর্য হবার কি আছে? এই দেখ না আমার তো কেউ নেই—দাদা-দিদি-মাসি-খুড়ি—মায় বাপি পর্যন্ত নেই আমার! কিন্তু তুমি তো আছ, আর পাঁচটা স্কুলের মেয়ে তো আছে, ডেভিল তো আছে। ডেভিল ওঁর কুচকুচে কালো একটা স্প্যানিয়াল। তাই এটাকে এতদিন স্বাভাবিক বলেই ধরে নিয়েছিল। ভেবেছিল সে আর মিস্ স্মিথ স্বগোত্র। ওদের কারও কেউ নেই। কিন্তু ক্রমে আরও বড় হ'ল শ্রবণা। ওর মনে হল ভিতরে আরও কিছু আছে। মিস্ স্মিথ সংসার ত্যাগ করে এসেছেন স্বেচ্ছায়। মিশনারী হয়ে গেছেন তিনি। ছোট্ট স্কুল খুলে একান্তে সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপন করছেন, কিন্তু বাপি তো সন্ন্যাসী নয়! মিস্ স্মিথ অবিবাহিতা, বাপি তো তা নয়। মিস্ স্মিথ তো অতীতের কথা মনে করে কোনদিন চোখের জল ফেলেন না—কিন্তু মধ্যরাত্রে বাপির বেহালার টানে যে সুরটা বের হয় তার তো জাত আলাদা। তারপর কিশোরী মেয়েটি একদিন হঠাৎ জানতে পারল একটা অদ্ভুত কথা। সেদিন আনন্দে আত্মহারা হয়ে সে ছুটে গেল বাপির কাছে, বললে, আমার নাকি ঠাকুমা আছে বাপি? চন্দননগরে? চন্দননগর কোথায় বাপি?

শাহজাহান সে প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে বললে, কে বলেছে?

—কুসুম।—কুসুম বাড়িওয়ালার মেয়ে।

শাহজাহান গম্ভীর হয়ে বলেছিল, ঐসব বদমায়েস্ পাজি মেয়ের সঙ্গে মিশবে না।

—কিন্তু কথাটা কি সত্যি ? চন্দননগর কোথায় বাপি ?

ঠাস করে একটা চড় কসিয়ে দিয়েছিল শাহজাহান।

সেই প্রথম।

তারপর দিন দিন দেহ-মনে যতই বেড়ে উঠেছে শ্রবণা ততই সে বুঝতে শিখেছে অনেক কিছু। সে জানে ওরা মুসলমান নয়। মিস্ স্মিথ ক্রিশ্চিয়ান, কিন্তু ওরা হিন্দু। বাপির গলায় পৈতা নেই ; কিন্তু দেব মন্দিরের সামনে সে হাত তুলে প্রণাম জানায়। বাপি একখানা উর্দু পত্রিকায় লেখা পাঠাতো ছদ্মনামে। সে নামটা 'শাহজাহান'। সেই নামটাই চালু হয়ে গেছে। ছদ্ম-নামের সঙ্গে দাড়ি, মেরজাই অথবা মুসলমানী টুপির কোন সম্পর্ক নেই—কিন্তু খেয়ালী মানুষটার সব ব্যবহার তোমার-আমার সাধারণ বুদ্ধির বিচারে করা যায় না।

মানুষ দুজাতের। একজাতের মানুষ, এবং তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ—তারা আয় করে মেপে, ব্যয় করে টিপে ; তারা ঘর-সংসার স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের মধ্যে হিসাব করে দু-কুড়ি-সাতের খেলা খেলে যায়। সংসারের শতকরা নিরানব্বই এর জন্য এই বাঁধা ছক। কিন্তু ব্যতিক্রম থাকে বলেই নিয়মটাকে নিয়ম বলে মানি। তাই এই গণ্ডিকাটা ছক-বাঁধা নিয়মটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে শতকরা একজনকে হতে হয় ব্যতিক্রম। তাদের জীবনবোধের বাটখারার ভিন্ন মাপ, তাদের জীবন-বেদের মূল্যায়নের ভিন্ন পরিমাপ। তারা শিল্পী, সাধক, বৈজ্ঞানিক। আমরা আমাদের চেনা মাপকাঠিতে তাদের মাপতে পারি না বলে সহজ সমাধান খুঁজি, বলি—ওরা পাগল! শাহজাহান সেই জাতের মানুষ। সে শিল্পী, সে সঙ্গীতজ্ঞ, সে কবি। যৌবনে সে কেমন ছিল শ্রবণা জানে না—কিন্তু জ্ঞান হওয়ার পর থেকে সে দেখছে বাপি-লোকটা আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মত নয়। সে বেহালা বাজাতে বাজাতে কাঁদে, ছবি আঁকতে বসে সে নাওয়া-খাওয়ার কথা ভুলে যায়, দুর্বোধ্য উর্দু হরফে পাতার পর পাতা খাতার পর খাতা যখন সে লিখে চলে, তখন সে অন্য মানুষ, অন্য জগতের মানুষ। তখন সে শ্রবণাকে পর্যন্ত সহ্য করতে পারে না।

সংখ্যালঘিষ্ঠ এই দ্বিতীয় জাতের শিল্পী মানুষ যারা তাদের আবার দ্বৈত সত্তা। যে অংশে সে সংসারের, সে অংশে তাকে তবু ধরা ছোঁয়া যায়, কিন্তু যে অংশে সে শিল্পের সেখানে সে আত্মকেন্দ্রিক, তন্ময়—সেখানে তাকে স্নেহ ভালবাসা বোধ দিয়ে স্পর্শ করা যায় না। এই বিচিত্র জাতের ব্যতিক্রম-গুলোকে যেসব সংসারি মানুষ ভালবাসে তারা এটুকু মেনে নিয়েই তাদের

ভালবাসে। কি জানি, বোধকরি ঐ ব্যতিক্রমটুকুকেই তারা ভালবাসে। বালিকা শ্রবণা, কিশোরী শ্রবণা তার বাপিকে ভালবাসতে শিখেছিল এটুকু জেনেই। এসব কথা কেউ তাকে বুঝিয়ে দেয়নি—নারীর সহজাত প্রবৃত্তিতে সে নিজে নিজেই বুঝে নিয়েছিল, বুঝিয়েছিল নিজেকে। তরুণী শ্রবণাও এ সত্যটা বাধ্য হয়ে মেনে নিয়েছিল, কিন্তু মনে নেয়নি। কারণ এতদিনে সব জিনিসকেই সে বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে তৌল করতে শিখেছে। সে বুঝতে শুরু করেছে যে, শাহজাহান তার নিজের অতীতটাকে আড়াল করে রাখতে চায়। সেখানে এমন একটা কিছু আছে যাকে সে অস্বীকার করতে চায়, ভুলে থাকতে চায়। শ্রবণা অনুভব করতে পারে—সেই অতীত অধ্যায়ে এমন কিছু আছে যা শাহজাহানের পক্ষে গ্লানিকর, লজ্জাজনক। হতে পারে। সেই রেদাক্ত অধ্যায়টাকে জানবার তো কোন কৌতূহল নেই শ্রবণার, সে তো জানতে চায় না—কেন এভাবে সব ছেড়ে চলে এসেছিল শাহজাহান। কিন্তু অপ্রিয় অংশটাকে এড়িয়ে বাদবাকি সত্যটুকু তাকে জানিয়ে দিতে বাধা কোথায়? কলেজে ভর্তি হয়েছে শ্রবণা, অথচ এখনও সে জানে না তার পিতামহের কী নাম। কী ক্ষতি হত যদি কোন এক নিভৃত সন্ধ্যায় আত্মজাকে কাছে টেনে নিয়ে শাহজাহান বলত, সব কথা তো তোকে খুলে বলতে পারব না বনি, শুনতেও তোর ভাল লাগবে না—তবে মোটামুটি কয়েকটা কথা এখন তোকে জানিয়ে দেওয়ার সময় হয়েছে। তুই অমুক বংশের সন্তান, দেশের বাড়িতে তোর যেসব আত্মীয়-স্বজন আছেন তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই। অবশ্য তাঁরা হয়তো আজ তোকে আত্মীয় বলে স্বীকার করবেন না—কারণ যেদিন সব ছেড়ে চলে আসি সেইদিনই আত্মীয়তার বন্ধনকে অস্বীকার করে এসেছিলাম আমি।

ব্যস! এইটুকুই যথেষ্ট হত। মরে গেলেও শ্রবণা জানতে চাইত না অকথিত অংশটুকু। প্রশ্ন করত না, কেন তুমি এভাবে সব ছেড়ে চলে এসেছিলে?

কিন্তু বাপে মেয়ের এ আলাপচারি হয়নি কোনদিন।

শ্রবণার একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র সান্ত্বনার স্থল ছিল মায়ের একখানি তৈলচিত্র। সারাজীবনে শাহজাহান অসংখ্য ছবি এঁকেছে কিন্তু ওদের জুহুবীচের সেই নড়বড়ে ভাঙা বাড়িতে শাহজাহানের হাতে-আঁকা ছবি একখানিও অবশিষ্ট নেই। বিভিন্ন সময়ে অভাবে পড়ে শাহজাহান একে একে ছবিগুলি বিক্রি করে দিয়েছে—কখনও বা জলের দরে। শ্রবণা বিছানায়

মুখ লুকিয়ে কেঁদেছে শুধু। একমাত্র ব্যতিক্রম ঐ ছবিখানা। ওটা ওর মায়ের ছবি। এ ছবির চিত্রকর উচ্ছৃঙ্খল মদ্যপ অর্ধোন্মাদ শাহজাহান নয়, এ ছবি এঁকেছিলেন বনেদী বাড়ির তরুণ যুবক হিমাদ্রী রায়। মায়ের কুমারী জীবনের পোট্রেট সেখানা। শিল্পীর নামের দুটি আদ্য অক্ষর লেখা আছে ছবির নিচে—এইচ. আর। আর আছে একটা তারিখ. যা থেকে বোঝা যায় ছবিখানার বয়স প্রায় পঁচিশ বছর।

বাপ আর মেয়ের ছোট্ট সংসার—কিন্তু সেই ছোট সংসারে ধীরে ধীরে নেমে এল অসন্তোষের ছায়া। মতান্তর থেকে মনান্তর। বাপির উচ্ছৃঙ্খলতা, বেহিসাবী খরচ, মাঝে মাঝে সম্পূর্ণ মত্তাবস্থায় মধ্যরাত্রে বাড়ি ফিরে আসা—এসব উপদ্রব ছেলেবেলা থেকেই গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল শ্রবণার। কিন্তু এরপর ঘটল মারাত্মক এক দুর্ঘটনা। ডান হাতের বুড়ো আঙুলে বাটালি পড়ে গেল শাহজাহানের। মারাত্মকভাবে কেটে গেল হাতটা। ঔষধ এবং ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেওয়া হল। ডাক্তার দিন সাতেকের বিশ্রাম নিতে বললেন, কিন্তু কাজ-পাগল শাহজাহান যে কাঠের ফর্মাটা কাটতে গিয়ে হাত কেটেছে সেটার তদারকি করা ছাড়ল না। বিশ্রাম তার ধাতে নেই। দিন দুই পরে একদিন রাত্রে শাহজাহান ফিরে এল সম্পূর্ণ মত্তাবস্থায়—তার জামা-কাপড় কাদায় মাখামাখি, জামা ছাড়াতে এসে শ্রবণা দেখে তার আঙুলে ব্যাণ্ডেজ নেই। কাটা ঘায়ে লেগেছে কাদা। সে রাত্রে প্রবল জ্বর এল শাহজাহানের। পরদিন তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। পরীক্ষা করে ডাক্তার বললেন—আঙুলটায় সেপ্‌টিক হয়েছে, গ্যাংগ্রিণ শুরু হয়ে গেছে। অবিলম্বে আঙুলটা কেটে বাদ না দিলে পচনের বিষক্রিয়া সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়বে। তৎক্ষণাৎ অপারেশন করতে চাইলেন তিনি। কিন্তু বাধা দিল শাহজাহান নিজে। ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা সে কাটতে দেবে না, কিছুতেই না। কিন্তু রোগীর পাগলামিতে কান দেওয়ার সময় ছিল না ডাক্তারের। তিনি নিশ্চিত বুঝে-ছিলেন, তখনই আঙুলটা কেটে বাদ না দিলে রোগীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। রোগীর নিকটতম আত্মীয়া হিসাবে শ্রবণাকে কী একটা কাগজে সই দিতে হল। অপারেশন হয়ে গেল ভালভাবেই। রাক্ষসের জান যদি লুকিয়ে থাকে মরণ ভোমরায়, তবে চিত্রশিল্পীর প্রাণ টিঁকে থাকে তার ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে! বেঁচে গেল মানুষ শাহজাহান, শিল্পী শাহজাহানের প্রাণের বিনিময়ে!

হাসপাতাল থেকে ফিরে এল মানুষটা, কিন্তু একেবারে অন্য মানুষ। দুনিয়ার উপর ক্ষেপে গেল সে—আর সবচেয়ে রাগ হল তার নিজ আত্মজার

উপর। কেন সে সই দিল ?

শ্রবণা যে উপায়ান্তরবিহীন হয়ে এ ব্যবস্থাপনায় সায় দিয়েছে এ কথাটা কেউ তাকে বোঝাতে পারল না। আধাপাগল মানুষটা একেবারে যেন বদ্ধ পাগল হয়ে উঠল। সংসারের আয় বন্ধ, ব্যয় গেল বেড়ে—কারণ মদের মাত্রা চড়াল প্রাক্তন শিল্পী শাহজাহান। চাকরি গেল। বদ মেজাজী রাগী মানুষটা যথেচ্ছাচারের শেষ সীমায় ছুটে চলতে থাকে বেপরোয়া ভাবে। সকাল-সন্ধ্যা গিয়ে বসে থাকে দিভেচা প্রডাকসন্সের চিত্রশালায়। সকলের কাজে খুঁত কাটে আর গাল পাড়ে। এতদিনের কর্মচারীকে নেহাত দারোয়ান দিয়ে গলাধাক্কা দিতে সঙ্কোচ হয় বলেই ওকে সহ্য করে সকলে। দ্বিপ্রাহরিক আহারের আয়োজন আছে কর্মীদের। চাকরি থাক না থাক শাহজাহান গিয়ে বসে ওদের সঙ্গে এক সারিতে—এতদিন যেমন বসত। কেউ আপত্তি করে না; কারণ নিজে হাতে কাজ না করলেও তদারকিটা ভালই করে সে এখনও। নতুন আর্ট-ডাইরেক্টর যতদিন না আসছে ততদিন লোকটাকে ওরা এভাবে সহ্য করে যাচ্ছিল।

শাহজাহান একদিন হুকুমজারী করল—শ্রবণাকে কলেজ থেকে নাম কাটাতে হবে। এটা যে অবধারিত তা জানা ছিল শ্রবণার। মেয়ের পড়ানোর খরচ আর শাহজাহান যে চালাতে পারবে না এটা বোঝা শক্ত নয়। অগত্যা লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়ে বাড়ি ফিলে এল।

শ্রবণা জানে সে সুন্দরী, কিন্তু এও জানে যে, সে ঘরানা ঘরের মেয়ে নয়। তার জন্ম-ইতিহাসটা রহস্যাবৃত। তার বংশ-পরিচয়টা অজ্ঞাত। তাই ঘর সংসার স্বামীপুত্রের স্বপ্ন সে কোনদিনই দেখেনি। তবে আশা ছিল, লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াবে একদিন। তারপর যদি এমন কোন মানুষের সন্ধান সে ঘটনাচক্রে পায় যে সব কথা জেনেও তাকে গ্রহণ করবে তবেই ঘর বাঁধবে শ্রবণা। সে আশায় ছাই পড়ল।

তবু ভাগ্যকে সে তিরস্কার করেনি। ঈশ্বরে বিশ্বাস হারায়নি, বাপিকে অসীম ক্ষমায় গ্রহণ করেছিল। দুর্ভাগা মানুষটা আর কী করতে পারত ?

কিন্তু এরও পরের অধ্যায়টা করুণতর।

শ্রবণা অনুভব করে শুধু লেখাপড়ায় ইস্তফা দিলেই কিছু সমস্যার সমাধান হবে না। এই ভেঙে-পড়া সংসারটাকে যদি আবার খাড়া করে তুলতে হয় তবে তাকে রোজগারে নামতে হবে। কিন্তু তাকে কি চাকরি করতে দেবে বাপি ? যুক্তিতর্কের ধার সে ধারে না আজকাল। যুক্তিকে যদি মেনে নিত

তাহলে অপারেশনের সমস্ত দুর্ভাগ্যটাকে মেয়ের স্কন্ধে চাপাতে পারত না নিশ্চয়। প্রস্তাবটা পেশ করতেও শ্রবণার সাহসে কুলায় না। যা বদমেজাজি মানুষ!

তবু চেষ্টা তো করে দেখতে হবে। তাই একদিন সুযোগ বুঝে বলে, কলেজ ছেড়ে চুপচাপ বসে আছি বাড়িতে। কোন একটা চাকরি পাওয়া যায় না? তোমার সঙ্গে তো অনেকের আলাপ আছে, তুমি একটু চেষ্টা করে দেখ না?

লুঙ্গি পরে একটা মোড়ায় বসে আয়নার সামনে চুলে কলপ দিচ্ছিল শাহজাহান। বললে, আমিও কদিন ধরে তাই ভাবছি। নিজের জন্যে ভাবি না। মরা হাতী এখনও লাখ টাকা। কিন্তু তোকে এভাবে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতে পারব না আমি।

শ্রবণা জবাব দেয় না।

আড়চোখে শ্রাবণাকে একবার দেখে নিয়ে শাহজাহান আবার বলে, বলেছিলাম মালিককে; তিনি তোকে নিয়ে যেতে বলেছেন। একটা হিল্লে হয়ে যাবে। তুই তৈরী হয়ে নে।

—এখনই? কোথাও কোনও চাকরি খালি আছে নাকি?

কলপ লাগাবার সরঞ্জাম চৌকির নিচে ঠেলে দিয়ে শাহজাহান উঠে পড়ে। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, চাকরি খালি না থাকলে খালি করাতে হবে। বুকের রক্ত জল করে খেটেছি কোম্পানীর জন্যে! এ তো ভিক্ষে নয়, এ হল গিয়ে ক্ষতিপূরণ। নে কাপড়টা পালটে আয়!

মনে মনে হাসে শ্রবণা। দুঃখের হাসি। তার আশঙ্কা ছিল হয়তো বাপি তার চাকরি করতে চাওয়ার প্রস্তাবে ক্ষেপে যাবে। দেখা গেল শাহজাহান আর এক ধাপ এগিয়ে বসে আছে আগে থেকেই। মালিকের সঙ্গে তার কথা পর্যন্ত হয়ে গেছে এই নিয়ে। জামা-কাপড় পরে তৈরী হয়ে নেয় শ্রবণা। মনের অগোচর পাপ নেই। নিজের কাছে অন্তত সে স্বীকার করতে বাধ্য হয়—সে একটু আহত হয়েছে। সে খুশী হত যদি বাপি তার পাঁজরা-বার-করা বুকটা চিতিয়ে ক্ষেপে উঠে বলত, থাক থাক, আর পাকামো করতে হবে না! খুব লায়েক হয়ে উঠেছিস্ দেখছি! না হয় আঙুলটাই গেছে, তা'বলে মেয়েকে দুবেলা দু-মুঠো খেতে দেবার ক্ষমতা এখনও আছে শাহজাহানের। আর শ্রবণা ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে, রাগ অভিমান করে যদি শেষ পর্যন্ত রাজী করাতো।

বাস্তবে কিন্তু সে সব কিছুই হল না। বাপির আদেশমত অল্পক্ষণের

মধ্যেই তৈরী হয়ে নিল। সাদামাটা একটা তাঁতের শাড়ি পরে নিল চট ক'রে। শুকনো তোয়ালে দিয়ে মুখটা ঘসে ঘসে মুছে নিল। পাউডারের কৌটাটা অনেকদিন হ'ল খালি হয়ে রয়েছে। তৈরী হয়ে বেরিয়ে আসতেই শাহজাহান একেবারে খেঁকিয়ে ওঠে, এই পেতনীর মত যাবি নাকি তুই? যা, কাপড়টা পালটে আয়। জন্মদিনে যে শাড়িটা দিয়েছিলাম, সেটাই পরে আয়।

শ্রবণা আমতা আমতা করে, যাচ্ছি চাকরির উমেদারিতে—

—মুখের কথায় যাবি, না হাত চালাতে হবে?

বিনা বাক্যব্যয়ে শ্রবণা আবার ফিরে যায় শাড়িটা পালটে আসতে। শিল্পী শাহজাহানের পথ ক্ষুরধার, স্বল্পতম রঙের গাঢ়তার প্রভেদ, ক্ষীণতম রেখার বিচ্যুতি, সূক্ষ্মতম সুরের ভ্রান্তি তার নজরে পড়ে—তাকে বিচলিত করে তোলে; কিন্তু মানুষ শাহজাহান স্থূল, নীরস, দুর্মুখ। বাপির এ দ্বৈতসত্তার সম্বন্ধে শ্রবণা সচেতন, তাই বিচলিত হয় না একটুও। তাই শাড়িটা পালটে এসে ফের হাসিমুখে বলতে পারে, বাসে ক'রে যেতে হবে তো, তাই তখন সিল্কের শাড়িখানা পরিনি—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে শাহজাহান বলে, বাসে ক'রে যাব কে বলেছে তোকে?

আবার চুপ করে যায় শ্রবণা। হঠাৎ এতটা রাস্তা ট্যাক্সি ক'রে যাবার মত সম্বল যে শাহজাহানের নেই এটা পিতাপুত্রী দুজনেই জানে—সে কথার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তাই বলে, কই চল?

শাহজাহানের সাজ-পোষাক হয়ে গিয়েছিল, একটা হাত আয়না আর কাঁচির সাহায্যে গোঁফের প্রান্তভাগটা সুষম করতে ব্যস্ত ছিল সে। বললে, তাড়া কিসের? সময় হলেই যাব।

একটু পরেই অবশ্য সময় হল। সাদা রঙের একটা এ্যাম্বাসাডার গাড়ি এসে দাঁড়ায় ওদের বাড়ির সামনে—হর্ণ দিতে শুরু করল অকস্মাৎ। হাত ব্যাগটা চট ক'রে তুলে নিয়ে শাহজাহান উঠে দাঁড়ায়, বলে, আয় গাড়ি এসে গেছে।

গাড়ি? কার? কেন? কিন্তু বিস্ময়ের অনুভূতিটাকে ভোঁতা করে দিতে শিখেছে শ্রবণা। জানে, এ নিয়ে প্রশ্ন করলে সন্তোষজনক কোন উত্তর তো পাওয়া যাবেই না, উল্টে কতকগুলো অপ্রিয় কথার অবতারণা হবে। সামান্য চাকরির উমেদারকে বাড়ি থেকে গাড়ি পাঠিয়ে তুলে নিয়ে যাওয়া স্বাভাবিক ঘটনা নয়; কিন্তু সেজন্য যতটা বিস্মিত হল শ্রবণা, তার চেয়েও অবাক হ'ল একথা ভেবে যে, বাপি এতটা আয়োজন সুপরিকল্পিতভাবে করেছে

তাকে বিন্দুমাত্র আভাস না দিয়ে। শাহজাহান অশক্ত, বেকার, বৃদ্ধ—তার জোয়ান মেয়ে এখন রোজগার ক'রে বাপকে সাহায্য করবে এর মধ্যে অস্বাভাবিকতা কোথাও নেই—কিন্তু একটি কুমারী তরুণী মেয়েকে রোজগার করতে পাঠিয়ে দেবার আগে কি তাকে জানতেও দেওয়া হবে না—চাকরিটা কেমন, কোথায়, কতক্ষণ খাটতে হবে তাকে অথবা কি পারিশ্রমিক পাবে সে? সবই কি বাপি আগে থেকে ঠিক করে রেখেছে? সে কি শাহজাহানের গোয়ালের গরু যে দরদামটা পর্যন্ত জানবার অধিকার নেই তার? একটা কাঠিন্যের আভাস ফুটে ওঠে তার মুখে। চুপচাপ গিয়ে বসে বাপির পাশে।

গাড়িটা চলতে শুরু করে। পাঁচ মিনিটেই ওর চেনা পাড়ার অলিগলি অতিক্রম করে নেমে পড়ে অজানা রাস্তায়। সমুদ্রের কিনারা ছেড়ে জনবহুল সড়কে। করব না করব না ভাবতে ভাবতেও শ্রবণা প্রশ্নটা করে বসে, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ বলত আমাকে?

শাহজাহান পকেট থেকে একটা চারমিনারের প্যাকেট বার করে। বিড়ি নয়, সিগারেট। নিপুণভাবে সেটা ধরিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে, জাহান্নমে নয় নিশ্চয়।

আরও কঠিন দেখায় শ্রবণাকে। ড্রাইভারের উপস্থিতিতে আর কিছু বলে না। প্রায় আধ ঘণ্টা চলার পর গাড়িটা অবশেষে এসে পড়ে একটা অপেক্ষাকৃত নির্জন শহরতলীতে। দূরে দূরে দুটো একটা বাড়ি, ফাঁকা মাঠ। অবশেষে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটা বড় বাগানওয়ালা বাড়ির ফটকে গাড়িটা প্রবেশ করে। অর্ধচন্দ্রাকৃতি ড্রাইভ-ওয়ে অতিক্রম করে এসে থামে থামওয়ালা গাড়িবারান্দার নিচে। সাজানো বাগান। মাঝখানে একটা ফোয়ারা, ভাঙা চোরা—পাশেই শ্বেতপাথরের একটা নগ্ননারীমূর্তি। মরশুমী শীতের ফুল ফুটেছে অজস্র। ক্রোটনের টবের সারি। অন্তরাল থেকে ভেসে আসছে একটা এ্যালসেশিয়ানের গর্জন। গাড়ির শব্দে সচকিত হয়ে উঠেছে। তক্‌মা আঁটা একজন চাপরাশী এসে খুলে দিল গাড়ির দরজা।

শাহজাহান নেমে এল প্রথমে, বললে, সাহেব আছেন?

চাপরাশীটা সেলাম করে। সেলামটা যেন শাহজাহানকে ডিঙিয়ে শ্রবণার উপরেই বর্ষিত; যদিও শাহজাহানের প্রশ্নের জবাবে বলে, আছেন। আপনারা বসুন, আমি এত্তেলা দিচ্ছি।

শ্বেতপাথরের মেজে। প্রকাণ্ড 'হল' কামরা। দু পাশে কৌচ, সোফা, সেটি, ডিভান। দামী অথচ পুরাতন ডিজাইনের আসবাব। কারুকার্য করা

বিলাতী চিপেণ্ডেল টেবিল, ভেলভেট মোড়া গদি আঁটা খাড়া-পিঠ চেয়ার-শ্বেতপাথরের পরী-খোদাই দেওয়াল-ব্র্যাকেটে জাপানী ঘড়ি; আর সবটা মিলিয়ে কেমন যেন উনবিংশ শতাব্দীর আটকা পড়া একটা বদ্ধ-বাতাস। ওদের বলতে বলে চাপরাশীটা উপরে চলে গেল। ফিরে এল অল্প পরেই, বললে, সাহেব আপনাদের ডাকছেন।

চশমার কাচটা মুছে নিয়ে সিগ্রেটটা ফেলে দিয়ে শাহজাহান উঠে দাঁড়ায়। শ্রবণাও অনুসরণ করে তাকে। কেমন যেন অজানা একটা আশঙ্কায় মনটা ভার হয়ে আসে তার। এই বাগানবাড়ির থম্‌থমে নির্জনতা, ঐ গত শতাব্দীর আটক পড়া গন্ধটা অথবা শাহজাহানের রহস্যঘন নীরবতা, কিম্বা চাকরির উমেদারীতে আসার অনভিজ্ঞতা—কি সে যে অস্বস্তি বোধ করছিল সে তা জানে না, কিন্তু সিঁড়ির মোটা পারশ্য দেশীয় কার্পেটটা বেশ অনুভব করল তার ভীরু সসঙ্কোচ পদক্ষেপ। দেওয়ালে প্রকাণ্ড বড় বড় তৈলচিত্র, ল্যাণ্ডিং-এ ব্রোঞ্জের অশ্বারোহী মূর্তি কিছুই নজরে পড়ে না শ্রবণার। প্রায় স্বপ্নাবিষ্টের মত সে বাপির পিছু পিছু প্রবেশ করে ঘরে, চাপরাশীর উঁচু ক'রে ধরা পর্দাটা যেন হাড়িকাঠ।

টেবিল ল্যাম্পে একটিমাত্র আলো। জানালার পেলমেট থেকে ভারি মেরুন রঙের পর্দা। প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশে বসেছিলেন মধ্যবয়স্ক একজন রাশভারি ভদ্রলোক। কাগজে কি লিখছিলেন তিনি—চোখ না তুলেই বললেন, সিট ডাউন।

উপবেশনের অনুমতি পেয়ে কৃতার্থ হল শ্রবণা। সামনের চেয়ারখানায় দেহভার ন্যস্ত করে তখনই। সত্যই ওর পা দুটো আর বইতে পারছিল না তাকে। শাহজাহান কিন্তু অনুমতি পেয়েও বসল না। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল ওর চেয়ারের পাশে।

প্রবেশদ্বারের ভারি পর্দার দু-প্রান্ত পরস্পরকে আলিঙ্গন করল। ঘরে সূচীভেদ্য নিস্তব্ধতা। শুধু কাগজের উপর কলমের একটা মৃদু খসখসানি। মিনিট দুই পরে কলমদানিতে কলমটা রেখে সাহেব চোখ তুললেন।

শাহজাহান হাত কচলে বিনয়ে বিগলিত হয়ে নিবেদন করে, এর কথাই আপনাকে বলেছিলাম স্যার। আমার মেয়ে।

চশমাটা খুলে সামনের টেবিলে রাখলেন উনি। স্প্রিং দেওয়া চেয়ারে পিছনে হেলান দিয়ে বসলেন। টেবিলের তলায় হাত দিয়ে কোন বোতাম টিপলেই ঘরের চতুর্দিকে লুকানো পেলমেটের ভিতর থেকে নিয়ন বাতি

শ্রাবন বয়ে গেল যেন। জোরালো আলো, কিন্তু চোখে লাগে না। মৃদু হেসে সাহেব বললেন, কি নাম তোমার ?

শ্রবণা জবাব দেবার আগেই শাহজাহান বললে, ওর নাম শ্রবণা !

সাহেব ভ্রূকুটি করেন। একবার ভৎর্সনাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন শাহজাহানের দিকে। শ্রবণা অনুভব করে, জাবাবগুলো তাকেই দিতে হবে। তাই নিয়ম। চাকরির ইণ্টারভ্যু দিতে এসে পরের মুখে ঝাল খাওয়া চলে না। সাহেবের দৃষ্টি দ্বিতীয়বার ফিরে এল চাকরির উমেদারের উপর, বললেন, কত বয়স হবে তোমার ?

এবারও ওকে জবাব দেবার সুযোগ না দিয়ে শাহজাহান বলে ওঠে, ওর একুশ চলছে স্যার !

সাহেব এবার আর শাহজাহানের দিকে তাকালেন না। টেবিলের তলায় হাত দিয়ে একটি বোতাম টিপলেন। তৎক্ষণাৎ পর্দা সরিয়ে ঘরে এল সেই আর্দালীটি। সাহেব তাকে বললেন, শাহজাহানকে নিয়ে গিয়ে নিচের ঘরে বসাও।

শাহজাহান হাত দুটি কচলে আবার কিছু বলতে চায়। এবার তার দিকে ফিরে সাহেব গম্ভীর ভাবে বলেন, চাকরি তুমি করবে না, তাই ইণ্টারভ্যুও তোমাকে দিতে হবে না। নিচে গিয়ে বসগে যাও। তোমার দস্তুরি তুমি ঠিকই পাবে। যাও !

কে বলবে ঐ লোকটাই রাগী বদমেজাজি শাহজাহান ! মুখখানা কাচুমাচু করে আর্দালীটার পিছু পিছু সে বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে। ভারি মেরুণরঙের পর্দার দুটি বাহু পরস্পরকে আবার আলিঙ্গন করে।

শ্রবণা রীতিমত নার্ভাস হয়ে পড়েছে। এ কোথায় এসে পড়েছে সে ? সামনে বসা ঐ প্রৌঢ় লোকটাই কি রতনচাঁদ দিভেচা ? কোটিপতি মালিক। কিন্তু শ্রবণার চাকরি পাওয়ার সঙ্গে শাহজাহানের দস্তুরি পাওয়ার সম্পর্কটা কি ? চাকরির বাজার কি এতই মন্দা ? ভ্যানিটি ব্যাগটা খুলে ছোট একটি রুমাল বার করে কপালের জমে ওঠা বিন্দু বিন্দু ঘাম মুছে নেয় !

সাহেব একটা পাইপ তুলে নিলেন টেবিল থেকে। টোব্যাকো ভরাই ছিল, লাইটার জেলে সেটাতে অগ্নি সংযোগ ক'রে বলেন, আমার নামটা নিশ্চয়ই শুনেছ তোমার বাপির কাছে—

মরিয়া হয়ে শ্রবণা বলে বসে, না ! কোথায় এসেছি, কেন এসেছি ; কার সঙ্গে কথা বলছি, কিছুই জানি না আমি।

—ডিয়ার মি! আমি ভেবেছিলুম, এসব প্রাথমিক কথাগুলো জানা আছে তোমার। যাই হোক, আমার নাম দিভেচা, নামটা শুনে থাকবে। আমার সময় অল্প, তাই সংক্ষেপে বলছি। শাহজাহান বলেছিল তুমি একটা চাকরি খুঁজছ। আমার তো ধারণা ছিল, সে জন্যই এসেছ তুমি। অবশ্য আমার যদি ভুল হয়ে থাকে—

—না না, ঠিকই শুনেছেন আপনি। একটা চাকরির বড় প্রয়োজন আমার। যে কোন কাজ, যে কোন মাইনেতে—

—অত উত্তেজিত হয়ো না। কি কি কাজ জান তুমি?

—সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ছিলাম। অর্থাভাবে পড়া বন্ধ হয়েছে। আমার দ্বারা যে কোন কাজ সম্ভব তাই করতে রাজী আছি আমি—

—বুঝলাম। কত মাহিনা আশা কর?

এতক্ষণে বেশ সহজ হয়েছে শ্রবণা। তাই একটু হেসে বলতে পারে, আশা তো মানুষের অন্তহীন। কত আমার পাওয়া উচিত আপনিই ভাল বলতে পারবেন।

একটু হেসে দিভেচা বলেন, আশা অন্তহীন এটা অনস্বীকার্য! কিন্তু অনন্তেরও বিভিন্ন পর্যায় আছে; অঙ্ক ছিল তোমার কম্বিনেশনে?

শ্রবণা মাথা নেড়ে জানায়, না।

—তাহলে ইনফিনিটির অর্ডার সম্বন্ধে আলোচনাটা মুলতুবি রেখে বলি তোমার কাছে সেই অনন্তের ধারণাটা কি রকম? হাজার-লাখ-কোটি?

বেশ সহজ হয়েছে এতক্ষণে। শ্রবণা হেসে বলে, ধরুন শতখানেক।

আবার হেসে দিভেচা বলেন, তবেই দেখ অনন্ত জিনিসটা কত ছোট আমি ভেবে রেখেছিলাম তুমি বলবে দু'শ, এবং তাতেই রাজী হব আমি না না, অত বিমর্ষ হবার কিছুই নেই—তুমি কম ক'রে বলেছ বলে ঠকাব না তোমাকে। রতনচাদ দিভেচা প্রতিটি কমোডাটির ন্যায্য দাম দিয়ে থাকে দু'শই দেব তোমাকে।

দু'শ! আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট একটি মেয়ে, যার অভিজ্ঞতার কোন বালাই নেই সে প্রথমেই দু'শ টাকা মাসমাহিনা আশা করবে কোন আক্কেলে? কী জবাব দেবে ভেবে পায় না শ্রবণা।

দিভেচাই বলেন, দু'শ টাকাই দেব। তার আগে অবশ্য কয়েকটি পরীক্ষা তোমাকে পাশ করতে হবে। আশা করি সে সবে আটকাবে না। যদি সে পরীক্ষাতে উৎরে যাও তবে দৈনিক দু'শ টাকাতেই বহাল করা হবে তোমাকে

চমকে ওঠে শ্রবণা, কী বললেন! দৈনিক দু'শ টাকা? দৈনিক?

—না তো কি? তুমি কি ভেবেছিলে ঘণ্টায়? আয়াম সরি! এখানে আমরা হয় লামসাম্ কনট্রাক্ট করি অথবা দৈনিক চুক্তিতে। ঘণ্টায় একশ টাকা যদি মীন করে থাক, তাহলে আমি নাচার।

শ্রবণার কণ্ঠনালী ভেদ করে শুধু বেরিয়ে আসে, এসব কী বলছেন আপনি?

—কেন যে বুঝতে পারছ না তাই তো বুঝতে পারছি না আমি। বলছি, যদি ভয়েস-টেস্টে না আটকায়, যদি ক্যামেরাম্যান স্বীকার করে নেয় যে তোমার ফেস মোটামুটি ফটোজিনিক তাহলে দৈনিক দু'শ টাকা হারে তোমাকে সামনের ছবিতে একটা পার্ট দেব আমি। নায়িকার চরিত্র নয়, মোটামুটি ভাল একটা পার্শ্বচরিত্র। তবু না হোক পঁচিশ ত্রিশদিন আসতে হবে তোমাকে ফ্লোরে। অর্থাৎ হাজার পাঁচ ছয় থাকবে তোমার এ বইতে।

একটা ঢোক গিলে শ্রবণা বলে, আপনি কি আমাকে সিনেমায় নামবার জন্য বলছেন?

যেন বিরক্ত হয়েই দিভেচা বলেন, তুমি কি ভেবেছিলে দৈনিক দু'শ টাকায় তোমাকে টাইপিস্টের চাকরি দিচ্ছি আমি?

একটু ইতস্তত করে শ্রবণা বলে, মাপ করবেন, আমি এজন্য প্রস্তুত ছিলাম না! মানে, বাপি আমাকে একথা বলেননি। আমি, আমি বরং একটু ভেবে নিয়ে—

সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে পড়ে দিভেচা বলেন, শ্রবণা। এই চরিত্রটার জন্য আমরা একটা নতুন মুখ খুঁজছি। অন্তত পঞ্চাশটা মেয়ে এটা পাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। তারমধ্যে জনা-পাঁচেককে আমরা প্রাথমিক নির্বাচনের পর হাতে রেখেছি। এ সুযোগ পাওয়ার জন্য তারা পাঁচজনই আমার সঙ্গে এক বিছানায় শুতে পর্যন্ত রাজী! স্যুটিং শুরু হয়ে গেছে! আজ কালের মধ্যেই আমাকে কনট্রাক্ট ক্লোস করতে হবে। কাল না হলেও পরশু যে সিকোয়েন্সটা আছে তাতে এ মেয়েটিকে দরকার হবে। আমি তো সময় দিতে পারব না। তুমি রাজী না থাক এখনই বলে যাও। আমি অন্য কাউকে বেছে নিই।

কী বলব ভেবে পায় না শ্রবণা।

দিভেচা ওকে চিন্তা করবার সময় না দিয়ে আবার বলেন, যদি ভাগ্যক্রমে উৎরে যাও পরের ছবিতে হয়তো হিরোইন হবে! হয়তো আবারও পাঁচটা

জায়গা থেকে অফার আসবে তোমার। তখন আর হাজারের অঙ্ক নয়, লাখে অঙ্ক কষবে তুমি। তখন তুমিই টার্মস্ দেবে, বলবে, শতকরা পঞ্চাশভাগ তোমাকে ব্ল্যাকে দিতে হবে।

সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে শ্রবণা বলে ওঠে, আমি রাজী!

না, লাখের অঙ্কটা ওকে প্রলুব্ধ করেনি। হিরোইন সাজার স্বপ্নও সে দেখেনি। আর শতকরা পঞ্চাশভাগ ব্ল্যাকে দাবী করার গূঢ় রহস্যটা তো ওর মগজেই ঢোকেনি। হঠাৎ মনস্থির করার পিছনে আসলে কী ছিল সেটা অনুমান করতে পারেননি ধুরন্ধর ব্যবসায়ী দিভেচা। শ্রবণা মুক্তি চেয়েছিল। বাপির কবল থেকে মুক্তি। শাহজাহানের প্রসারিত করে কনকাঞ্জলি ঢেলে দিয়ে মুক্তিপণ ক্রয় করতে চেয়েছিল।

পাইপটা টেবিলে ঠুকে দিভেচা বলেন, দ্যাট্স্ এ গুড গার্ল। কাল সকালেই ভয়েস আর ক্যামেরা টেষ্টিং সেরে ফেলতে হবে। আমার চোখ ভুল করে না; আমার যতদূর বিশ্বাস উৎরে যাবে তুমি।

শ্রবণা খুশী হয়ে ওঠে, বলে, দেখা যাক।

খুশী হওয়াটা আবার সংক্রামক। দিভেচাও খুশী হয়ে বলেন, আর সত্যি কথা বলতে কি ঐ পাঁচটা মেয়ের চেয়ে তোমাকেই বেশী নজরে ধরেছে আমার!

কথাটার মধ্যে আপত্তিকর কিছু নেই, তবু কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে পড়ে শ্রবণা! হঠাৎ ওর মনে পড়ে যায়, দিভেচার একটি অশ্লীল উক্তি—একটু আগেই যা সে বলেছে। কথাটা তখন তলিয়ে দেখেনি, এই বাচনভঙ্গির মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যে, শ্রবণা ভিতরে ভিতরে ঘেমে ওঠে।

—তুমি ড্রাইভ করতে জান?

—না।

—সাঁতার জান?

—না!

—নাচতে?

—তাও জানি না।

…অনেক কিছু শিখতে হবে দেখছি তোমাকে। প্রেম করতে জান? ফ্লার্টিং করেছ কখনও?

কান দুটি লাল হয়ে ওঠে শ্রবণার! মনে হয় এবার সে ভেঙে পড়বে! তবু চাকরির মাথায়—না চাকরি নয়, এ অপমান তার মুক্তিপণের মাশুল।

শাহজানাকে কনকাঞ্জলি মিটিয়ে দিতে হবে তাকে। দাঁতে দাঁত চেপে শ্রবণা এ অপমান সহ্য করে যায়।

—বাই দ্য ওয়ে! তোমার মাপ কত সেটুকু অন্তত জান?

—জানি! পাঁচ ফুট দু ইঞ্চি।

দিভেচা হাসলেন। বলেন, সেটা তোমার স্টাটিসটিক্স্ নয় শ্রবণা, সেটা তোমার দৈর্ঘ্য। মেয়েদের মাপ আমার সচরাচর ভুল হয় না। তোমার মাপ বোধ-করি ৩৪-২০-৩৪।

শ্রবণা অবাক হয়ে বলে, আমি ঠিক বুঝলাম না।

—না বোঝাই স্বাভাবিক। সভ্যজগত পুরুষমানুষকে মাপে তার ব্যাঙ্কের পাশবই দিয়ে। আর সুন্দরী নারীকে মাপে ফিতে দিয়ে—বুক, মাজা আর নিতম্বের বেড়ে। আজকের দুনিয়ায় এই হচ্ছে নরনারীর মেজারমেণ্ট।

শ্রবণা চুপ করে বসে থাকে।

—ঘরের ওপাশে একটা বাথরুম আছে। ওখানে টাওয়েল র‍্যাকে একটা সুইমিং কষ্টিউম দেখবে। তোমার শাড়ি-ব্লাউস ইত্যাদি ছেড়ে ঐ বেদিং কষ্টিউমটা পরে এস।

কর্ণমূল লাল হয়ে ওঠে শ্রবণার। মুখ নিচু করে বসে থাকে সে।

—শ্রবণা! আমার সময়ের দাম আছে।

গলাটা সাফ করে নিয়ে শ্রবণা বলে, আমি নিজে মেপে কাল আপনাকে মাপটা জানাব।

টেবিলে পড়ে থাকা চশমাটা আবার নাকে চড়ালেন দিভেচা। টেবিলের দেরাজটা টেনে একটি খাম বার করলেন। তা থেকে খানকয়েক হাফ-সাইজ ফটো বার ক'রে শ্রবণার সামনে মেলে ধরেন, এরা তোমার কম্পিটিটর। সকলের ফটোই আমি নিজে হাতে তুলেছি। এ ঘরেই।

শ্রবণা দেখল, খান পাঁচ ছয় মেয়ের ছবি। সবাই তারই বয়সী। সকলেই সুইমিং কষ্টিউম পরে আছে। অধিকাংশেরই লাস্যময়ী সপ্রতিভ ভঙ্গিমা। তবু কেমন যেন একটা দুরন্ত লজ্জায় হাত পা অবশ হয়ে আসে তার।

ওর রেই লজ্জারুণ মুখভঙ্গি যেন তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করলেন, দিভেচা, যাঁর নাকি সময়ের দাম আছে। তারপর কণ্ঠে মধু ঢেলে বললেন, লজ্জা করলে তো চলবে না শ্রবণা! ওঠ, যাও লক্ষ্মীটি।

তবু উঠে দাঁড়াতে পারে না সে।

—এ বেশেই যে একটা সট নিতে হবে তোমার। ক্যামেরাম্যান আর

টেক্‌নিসিয়ানদের সামনে হাজার ক্যাণ্ডল্-পাওয়ার আলোয় এই বেশেই অভিনয় করতে হবে যে। শুধু তাই নয়—তোমার ঐ অর্ধনগ্ন কৌমার্য সারা ভারতবর্ষকে দেখাতে পারব বলেই না এত টাকা পারিশ্রমিক দেওয়া হচ্ছে তোমাকে?

মনস্থির করে উঠে দাঁড়ায় এতক্ষণে। উপায় নেই। কথা তো ঠিকই! নাচতে বসে ঘোমটা টানতে চাইলে চলবে কেন? মাথা নিচু করে চলে যায় সে কক্ষ-সংলগ্ন বাথরুমে।

অল্পক্ষণ পরে যখন স্নানার্থিনীর বেশে ফিরে এল তখন আর বেচারি চোখ খুলে তাকাতে পারছে না—পারলে দেখতে পেত দিভেচার চোখ দুটো তার সর্বাঙ্গ লেহন করে চলেছে—সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন পর-পুরুষের সামনে এমনিভাবে সে যে এসে দাঁড়াতে পারবে এ কি আজ সকালেও কল্পনা করতে পেরেছে? মুক্তিপণ বড় কম দিল না শ্রাবণা।

দিভেচা উঠে দাঁড়ালেন। টেবিলের উপর থেকে উঠিয়ে নিয়ে এলেন একটা মাপবার ফিতে। একেবারে যখন ওর সামনা সামনি এসে দাঁড়ালেন তখন শ্রবণার নিঃশ্বাস ঘন হয়ে এসেছে—কর্ণমূল রাঙা হয়ে উঠেছে। দিভেচার নিঃশ্বাস এসে লাগছে ওর বুকের উপত্যকায়।

—কই আমার দিকে তাকাও।

মুখটা আরও নিচু হয়ে যায় শ্রবণার; কিন্তু ওর চিবুকটা তুলে ধরবার উপক্রম করতেই এক পা পিছিয়ে যায় সে, মরিয়া হয়ে দিভেচার দিকে মুখ তুলে তাকায়। নিয়নবাতির জোড়ালো আলোয় ওর চোখেয় কোণে চিক্ চিক্ করে ওঠে। জল এসে গেছে চোখে। দিভেচা সেটা লক্ষ্য করলেন কিনা বোঝা গেল না। ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে ফিতেটা ঘুরিয়ে দিলেন পিছন দিয়ে। নিতম্বের কাছে বেষ্টনির মাপ নিলেন আলতো ভাবে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম শক্ত করে রইল শ্রবণা, চোখ তার বুজে আসছিল—কিন্তু না, চোখ সে বন্ধ হতে দেবে না, দিতে পারে না। পলকহীন চোখে সে তাকিয়ে থাকে কোনক্রমে। তারপর মাজার কাছে মাপ নিলেন দিভেচা। আঙুলের ছোঁয়া লাগল না। কিন্তু তৃতীয়বার মাপ নেবার সময় তাঁর অভ্যস্ত আঙুল অসতর্কতার সুনিপুণ অভিনয় করে স্পর্শ করল শ্রবণার উত্থিত অঙ্গ। থর থর করে কেঁপে উঠল শ্রবণা! ঠিক সেই মুহূর্তেই হেসে উঠলেন দিভেচা, বললেন, তুমি দেখছি আমার নির্দেশটা ঠিকমত বুঝতে পারনি!

বেদনার্ত দুটি অশ্রু-আর্দ্র চোখ তুলে শ্রবনা তাকায় প্রশ্নকর্তার দিকে, অস্ফুটে বলে, কেন?

—আবার একবার বাথরুমে যেতে হবে যে তোমাকে!

তৃতীবার অগ্নি পরীক্ষার প্রস্তাবে সীতাদেবী যে দৃষ্টিতে শ্রীরামচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে ছিলেন তেমনিভাবে তাকিয়ে শ্রবণা আবার বলে, কেন?

—ব্রেশারিটা খুলে এ বেশে আর একবার আসতে হবে। যে ফিগার তুমি দেখাতে চাইছ সেটা তোমার সত্যিকারের শেপ নয়। ওতে কৃত্রিমতার কারচুপি আছে!

মুহূর্তে চোখের জল মিলিয়ে গেল শ্রবণার। মাতা ধরিত্রী এ যুগে দ্বিধা হন না। তাঁকে বিদীর্ণ করতে হয় নিজে জোরে। সেই জোর হঠাৎ কোথা থেকে ফিরে পেল আহতা মেয়েটি। চোখের জল রূপান্তরিত হল আগুনে। বিদ্যুৎবেগে সে চলে গেল বাথরুমে এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরে এল যখন, তখন তার পরিধানে সাবেক পোশাক। সিল্কের শাড়ি। সারা দেহ সন্তর্পণে ঢেকে এসেছে এবার।

ভ্রূ কুঞ্চিত হল দিভেচার। কামার্ত হাসিটা মিলিয়ে গেল এতক্ষণে, বলেন, এর মানে?

—এর মানে আপনার চাকরি আমি গ্রহণ করছি না!

গটগট করে সে চলে যায় নিষ্ক্রমণদ্বারের দিকে।

—দাঁড়াও!

দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে শ্রবণা।

—এ চাকরি প্রত্যাখান করলে তোমাকে কোথায় নামতে হবে জান?

—জানি। চাকরি গ্রহণ করলে তাব চেয়েও নিচে নামতে হবে আমাকে।

উঠে আসেন দিভেচা, বলেন, না, জান না। দস্তরি শাহজাহান ঠিকই আদায় করবে, তুমি এ চাকরি নাও বা না নাও।

—তার মানে?

—তার মানে সিনেমা স্টার হলে যাদের বিছানায় তোমাকে শুতে হবে তাদের গা দিয়ে আর যাই হোক বোটকা ঘামের গন্ধ বার হবে না—কিন্তু এ চাকরি না নিলে শাহজাহান তোমাকে যেখানে রোজগার করতে পাঠাবে—

—চুপ করুন আপনি। সে আমার বাবা।

হেসে ওঠেন দিভেচা, বলেন, আমার অবশ্য যথেষ্ট সন্দেহ আছে তাতে। তা যাক্ সে কথা। আশা করি শাহজাহানকে তুমি সত্যি কথাই বলবে, যে আমি তোমার গায়ে হাত দিইনি। না হলে আধঘণ্টা আমার বন্ধ ঘরে তোমাকে আটকে রাখার মাশুল হিসাবে বেটা মোটা টাকা চেয়ে বসবে।

ভাববে আমি বুঝি তোমাকে—

—থুঃ। দামী কার্পেটটার উপর থুতু ফেলল শ্রবণা। বলল, আপনি ছোটলোক।

দিভেচা মৃদু হেসে বলেন, ভগবান কেন তোমাকে আমার ইনকামট্যাক্স অফিসার করলেন না। কত সহজে বুঝে নিলে তুমি। অথচ সে ব্যাটার ধারণা আমি বড়লোক।

চকিতে ঘুরে দাঁড়াল মেয়েটি। পর্দাটা সরিয়ে ছুটে বার হতে যাবে, দেখে দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ। হাত পা হিম হয়ে এল তার।

দিভেচা তখনও হাসছেন, বলেন, চিৎকার কর না। তোমার চেঁচামেচিতে কেউ দরজা খুলে দেবে না! এতে আমার চাকর বাকরেরা অভ্যস্ত! শুধু শুধু একটা সীন হবে। শাহজাহানও কষ্ট পাবে খামকা, তোমার চিৎকার শুনে ভাববে আমি বুঝি একটা পারভার্ট, স্যাডিস্ট!

শ্রবণা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। চিন্তা করে এখন সে কি করবে। ঐ জানোয়ারটা নিশ্চয়ই এখন এগিয়ে আসবে তার দিকে, ও কি নিজে থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়বে তার উপর? তীক্ষ্ণ নখে ছিঁড়ে ফেলবে জানোয়ারটার বর্শনালী, কামড়ে দেবে কি প্রচণ্ড জোরে?

দিভেচা কিন্তু এগিয়ে আসে না—বরং পিছিয়েই যায়। গিয়ে বসে তার চেয়ারে। টেবিলের ও প্রান্তে। বলে, অহেতুক মাথা গরম করনা শ্রবনা। স্থির হয়ে ভেবে দেখ। তোমাকে আমি পছন্দ করেছি, এটা তোমার দুর্লভ সৌভাগ্য। কিন্তু ফি না দিলে ডাক্তারের ওষুধ ধরে না, দাম না দিলে নাম কেনা যায় না। যে সুযোগ তোমাকে আজ দিচ্ছি তার দামটা আমার পাওনা থাকল। সচরাচর নগদ কারবারই আমি করে থাকি, কিন্তু আজ আমার মুড নেই তোমারও নেই দেখছি। তাই আজ তোমাকে যা দিলাম তা ধারেই দিলাম। যে সন্ধ্যায় মন খুশ থাকবে স্বেচ্ছায় এসে ঋণ শোধ করে যেও। কাল সকালে এসে ভয়েস টেষ্টিংটা করিয়ে যেও। যাও।

—আমি তো আগেই বলেছি, এ চাকরি আমি করব না।

—করবে। এখনও রাগটা পড়েনি, তাই ও-কথা বলছ।

পরমুহূর্তেই বেজে ওঠে ইলেকট্রিক বেল, দিভেচাই বাজিয়েছেন। দ্বার খুলে ভিতরে আসে সেই আর্দালীটি।

—মেমসাবকে শাহজাহানের কাছে নিয়ে যাও।

কালবিলম্ব না করে বেরিয়ে এসেছিল শ্রবণা।

আজ প্রায় সাতদিন হল প্রিয়দর্শী বোম্বাইয়ে এসেছে। এসেছিল এক রবিবারে, আজ ফিরে রবিবার। মাত্র সাতটা দিনেই যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে সে। দিভেচা প্রডাকসন্সে তার তিক্ত অভিজ্ঞতা, কেউই পাত্তা দেয়নি তাকে! তারপর হঠাৎ বৈশাখীর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং এড়িয়ে যাওয়ার ভঙ্গিমা। এরপরেই কিন্তু চাকা ঘুরতে শুরু করেছে তার বরাতের। সাত দিনের ইতিহাসটা প্রিয়দর্শী আবার খতিয়ে দেখে। বেশ মনে পড়ছে প্রথম দিনের কথাটা। বৈশাখী তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার ক'রে কার যেন হাত ধরে দিব্যি চলে গেল স্টুডিওর ভিতর। অনেকক্ষণ অবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রিয়দর্শী গেটের ধারে সেই রেইন-ট্রি গাছের তলায়। আকাশ পাতাল চিন্তা করতে করতে কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল নেই। চমক ভাঙলো একটি আহ্বানে, আপনাকে ডাকছেন।

—আমাকে? কে ডাকছেন? চল যাচ্ছি।

বেয়ারটার পিছন পিছন ফিরে আসে অফিস ঘরে। সেই ঘর, সেই পরিবেশ—শুধু পরিবর্তনের মধ্যে এবার গ্লাসটপ টেবিলটার ওদিকের চেয়ারে বসে আছেন প্রডাক্সন ম্যানেজার সুরযভাই প্যাটেল। তাঁর সম্মুখের দুটি চেয়ার দখল করে বসে ছিলেন, তাঁর সহকারী স্বরূপদাসজি এবং আর্ট ডাইরেক্টর শাহজাহান সাব। প্রিয়দর্শী প্রবেশ করা মাত্র এগিয়ে আসেন প্যাটেল সাহেব, ওর হাতদুটি ধরে বলেন, আপনি অনেকক্ষণ এসেছেন শুনলাম, কি আশ্চর্য আমাকে একটা খবর দেননি কেন? না না, এ ভারি অন্যায়।

প্রিয়দর্শী বলে না যে, খবর দেবার আপ্রাণ চেষ্টা সে করেছে, পারেনি, স্বরূপদাস আর শাহজাহানের প্রতিকূলতায়। বরং বলে, আপনি স্টুডিওতে ব্যস্ত ছিলেন—

—না না, এ ভারি অন্যায় হয়েছে। এখানে এসে খেয়েছেন কিছু?

—খিদে ছিল না তখন।

প্যাটেল-সাহেব স্বরূপদাসের দিকে ফিরে বলেন, ডেকে না দিয়ে যে অন্যায় করেছ তার চারা নেই কিন্তু বাবুজিকে চা খাবার খাইয়েছিলে তো?

স্বরূপদাস অপ্রস্তুত হয়। সামলে নিয়ে বলে, ঐ দেখুন না, খিদে নেই বলে উনি নিজেই আপত্তি করেছেন।

প্রসঙ্গটা বদলাবার জন্য প্রিয়দর্শী বলে, সম্ভব হলে ছবিটার কাজে আজই হাত দিতে চাই। দিভেচা-সাহেব এখানে নেই, আমাকে কাজটা কে বুঝিয়ে দেবেন?

শাহজাহান মুখটা ঘুরিয়ে নেয়। দেওয়ালে টাঙানো কোন চিত্রতারকার ছবির দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। প্যাটেল কিন্তু তাকে ডাকে না, বলে, সে সব পরে হবে। আপনি আসুন আমার সঙ্গে। এখনই লাঞ্চ ব্রেক হবে। আমরা সবাই খেয়ে নেব। তার আগে নিশিদার সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিতে হবে। লাঞ্চ ব্রেকের সঙ্গে সঙ্গে উনি চলে যাবেন অন্য একটা স্টুডিওতে। ওঁর আজ ডবল শুটিং আছে।

—নিশিদা কে?

—নিশিনাথ চট্টোপাধ্যায়। নাম শোনেন নি?

—শোনা উচিত ছিল হয়তো, কিন্তু শুনিনি।

ঘর থেকে বেরিয়ে স্টুডিওর দিকে যেতে যেতে প্যাটেল বলেন, এ থেকে প্রমাণ হয় সিনেমা জগৎ সম্বন্ধে আপনি কিছুই খবর রাখেন না। নিশিদা হচ্ছেন বোম্বাইয়ের সবচেয়ে নামকরা ডাইরেক্টার। বিমলদার নাম শুনেছেন নিশ্চয়?

প্রিয়দর্শী স্বীকার করে এ নামটা সে শুনেছে।

সেই বিমলদা মারা যাবার পর এখনও যে কয়জন লোক বোম্বাইমার্কা ছবিকে সোত্রাইটি দান করছেন, উনি তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে নাম করা পণ্ডিত ব্যক্তি, কিন্তু ভীষণ খেয়ালি। 'তাজের স্বপ্ন' উনিই ডাইরেক্ট করছেন।

—আপনার কি এখন 'তাজের স্বপ্ন' তুলছেন?

—হ্যাঁ। নিশিদা অবশ্য আরও কয়েকখানা বই ডাইরেক্ট করছেন। তবে দিভেচা প্রডাকসন্সের হয়ে তিনিই আপাতত এই ছবিটা তুলছেন। আপনি যে ছবি আঁকবেন, সেটা এই 'তাজের স্বপ্ন'র সেটে প্রয়োজন হবে।

কথা বলতে বলতে ওরা স্টুডিওতে এসে হাজির হল। বিরাট বিরাট এ্যাসবেস্টস সেডের সম্মুখভাগে রোলিং সাটার। তার বাইরে টুল পেতে বসে আছে দ্বারপাল। প্যাটেল-সাহেবকে দেখে টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। আলো-আঁধারি অংশটা পার হয়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওরা উঠে এল একটা মঞ্চের মত স্থানে। চারদিকে জোরালো বাতি—মেজের উপর ক্রেকসিবল্ তার ছড়ানো। একখানা ইজিচেয়ার দখল করে বসেছিলেন নিশিনাথবাবু। ঠিক ক্যামেরার নিচেই। আলোর কোণগুলি কেন্দ্রীভূত হয়েছে সাজানো একখানা পালঙ্কের উপর। তার উপর উবুড় হয়ে শুয়ে একটি মেয়ে চিঠি লিখছে, বুকের নীচে বালিশ টেনে নিয়ে। দেখেই চিনতে পারে প্রিয়দর্শী। এ সেই মেয়েটি। আগ্রা স্টেশনে যাকে দেখেছিল এ সেই অথবা তার যমজ বোন। নিশিবাবুর

পাশেই ছোট একটি কাঠের তেপায়া টেবিল। তা উপর দাবা-বড়ের ছক-ঘুঁটি। দু-তিনজন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে তার উপর। হঠাৎ কে যেন বলে ওঠে, পুট অফ ফ্যান্‌স। সাইলেন্স। ফুল লাইট প্লীস্।

তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে গেল ঘূর্ণ্যমান একজস্ট পাখার ঘূর্ণন। তিন চারটে উজ্জ্বল আলো এখানে ওখানে জ্বলে উঠল। প্যাটেল-সাহেব প্রিয়দর্শীর হাতটা ধরলেন, ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে শব্দ করতে বারণ করলেন। কে একজন কি একটি যন্ত্র এনে ধরল মেয়েটির নাকের কাছে, ইঙ্গিতে ক্যামেরাম্যানকে বলল, ঠিক আছে। যে যেখানে ছিল নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে পড়ল।

নিশিবাবু বলে ওঠেন, স্টার্ট সাউণ্ড।

কে একজন বেঁটে মত ভদ্রলোক একটা কাঠের ছোট শ্লেট বাড়িয়ে ধরল বৈশাখীর নাকের সামনে। খটাস করে একটা শব্দ তুলে বললে, ফর্টিসেভেন বাই থার্টিন, টেক টু। বালই ঝুপ করে বসে পড়ে।

মেয়েটি প্যাড থেকে চিঠির কাগজটা ছিঁড়ে নিল। সেটার উপর চোখ বুলাতে বুলাতে বন্ধ করল কলমটা। তারপর ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকাতেই প্রিয়দর্শীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল তার।

পরমমুহূর্তে নিশিবাবু বলে ওঠেন, কাট।

সঙ্গে সঙ্গে শব্দময় হয়ে ওঠে ঘরটা। সবাই যেন এক মিনিট নিস্তব্ধতার শোধ তুলতে চায়। আবার গর্জন করে ওঠেন নিশিবাবু, সাইলেন্স। নো টকিং।

আবার নিস্তব্ধতা।

মেয়েটির দিকে ফিরে বলেন, এবার যে আরও খারাপ হল শ্রবণা। আজ তোমার কি হয়েছে বলতো? মুড নেই? এবার তুমি যেভাবে তাকালে সেটা মোটেই উদাস-দৃষ্টি নয়, মনে হল তুমি ভূত দেখেছ।

অভিনেত্রী মেয়েটি সরমে মরে গেল। তার লজ্জা নিবারণ করতেই বোধকরি সুরযভাই-প্যাটেল বলে ওঠেন, এভাবে আমাকে লজ্জা দেবেন না নিশিদা। শ্রবণা দেবী চোখ তুলে আমার দিকেই তাকিয়ে ছিলেন। ওঁর চোখে যদি ভূত দেখার অভিব্যক্তি ফুটে উঠে থাকে সেটা আমার তরফে খুব গৌরবের হল না।

নিশিদার রূঢ় ভাষণের উপর একটা হালকা হাসির ঢেউ বয়ে গেল এতক্ষণে। নিশিবাবুও হাসলেন একথায়, বলেন, সেটাই তো ভুল হয়েছে শ্রবণার। আর ফুটখানেক বাঁয়ে সরিয়ে চোখ তুললে তোমার পাশের ভদ্রলোককে দেখতে

পেত সে। তাহলে নিশ্চয়ই অমন আতঙ্কতাড়িত দৃষ্টি ফুটে উঠত না ওর চোখে।

এবার সকলের দৃষ্টি পড়ে প্রিয়দর্শীর দিকে।

কিন্তু আর কাউকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে নিশিবাবু বলে ওঠেন, টেক এ থার্ড সট!

মেক্‌আপম্যানে মেয়েটির মুখের উপর আলতো করে বুলিয়ে দিল পাউডারের পাফ, ঘামটা মুছে নিল আরকি। গ্লিসারিনের দাগটা নূতন করে এঁকে দিল ওর গালে। আবার শোনা গেল সেই নির্দেশ, স্টার্ট সাউণ্ড এবং অন্তরীক্ষ থেকে ভেসে এল প্রতিধ্বনি, ক্যামেরা। আবার সেই লোকটি থটাস-যন্ত্র বাজিয়ে বললে, ফর্টিসেভেন বাই থার্টিন, টেক থ্রি।

এবার নির্ভুল অভিনয় করল মেয়েটি। যার নাম ছিল বৈশাখী এবং যার নাম প্রিয়দর্শী এইমাত্র শুনল, শ্রবণা!

আবার শোনা গেল নিশিনাথের কণ্ঠ, কাট! এক্সেলেণ্ট! প্রিণ্ট ওন্‌লি দ্য থার্ড।

আবার শুরু হল কলগুঞ্জন। চালু হল একজস্ট পাখার ঘূর্ণন। বেবি ডিমারের পাশ কাটিয়ে, ফ্লেকসিবল্ তারের বেড়া ডিঙিয়ে সুরযভাই এসে হাজির হলেন এতক্ষণে নিশিনাথের কাছাকাছি। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর, কাছে এসে দেখলেন, নিশিদা ডুবে গেছেন দাবার ছকে। পরবর্তী সটের জন্য ক্যামেরা এবং বাতির স্ট্যাণ্ডগুলি টানাটানি করতে যেটুকু সময় লাগবে তারমধ্যে কয়েকটা চাল খেলে নেবেন উনি। নিশিনাথ দাবা-পাগল মানুষ। শোনা যায়, চোখ বেঁধেও খেলতে পারেন। সমস্ত দিনের প্রতিটি মিনিট তাঁর কাজের চাকায় বাঁধা। তাই দাবার ছকটি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। প্রতিপক্ষকেও চলতে হয় তালে তালে। যখন যেখানে বসছেন দাবার ছকটি থাকছে পাশে। প্রতিপক্ষ ভাববার অনেক সময় পায়—নিশিনাথকেই তাড়াতাড়ি পালটা চালটা দিতে হয় কাজের ফাঁকে ফাঁকে।

প্যাটেল-সাহেব কিন্তু এ বাধা মানলেন না। বলেন, নিশিদা ইনিই হচ্ছেন প্রিয়দর্শী, যাঁর কথা দিভেচা-সাহেব বলে গেছেন।

নিশিনাথ গজের সাহায্যে ঘোড়াটাকে বধ করে বললেন, হুঁ।

—হুঁ নয়। একে নিয়ে কী করব বলুন?

এবার মুখ তোলেন নিশিনাথ। ঘোড়াটাকে যে মারা যেতে পারে এটা ওরা ভেবে দেখেনি। প্রতিপক্ষ ততক্ষণ ভাবতে থাকুক পরের চালটা। কয়েকটা মুহূর্ত সময় পেয়ে গেছেন এবার। চোখ তুলে প্রিয়দর্শীকে দেখেন।

আপাদমস্তক। তারপর হেসে বলেন, জহুরী সাহেবের ক্ষমতা আছে। মনে হয় চলবে। আখ্‌তারের কাছে নিয়ে যাও। ভয়েসটা আগে দেখা দরকার। হাইট কত আপনার?

প্রিয়দর্শী থতমত খেয়ে যায়। বলে, হাইট? হাইট দিয়ে কি হবে?

নিশিনাথ মুচকি হেসে বলেন, ভারায় উঠে ফ্রেস্কো আঁকতে হবে তো? হাইটটা জানা না থাকলে ঠিক কতটা উঁচুতে ভারা বাঁধবে তা কেমন করে জানবে এরা?

প্রিয়দর্শী আমতা আমতা করে বলে, পাঁচ এগারো।

—গুড! অভিনয় কখনও করেছেন? থিয়েটারে?

—না। কেন বলুন তো?

নিশিনাথকে এ প্রশ্নের জবাব দিতে হয়নি। দাবার প্রতিপক্ষ তার আগেই বলে ওঠে, নিশিদা আমরা চাল দিয়েছি।

নিশিনাথ সেদিকে মনোযোগ দেবার আগেই ও-পাশ থেকে কে একজন বলে ওঠে, পরের সটে কি ক্যামেরা প্যান করার দরকার হবে?

তৃতীয় একজন বলে বসে, নিশিদা, উঠতে হবে আপনাকে, আপনি ফ্রেমের মধ্যে এসে যাচ্ছেন্।

সুরযভাই প্রিয়দর্শীর হাতটা আকর্ষণ করে বলেন, চলে আসুন, এখন আর কিছু হবে না।

দ্বারের দিকে পা বাড়াতেই আবার চোখাচোখি হয়ে গেল মেয়েটির সঙ্গে। মেয়েটি যেন ওকে দেখেও দেখল না।

ফিরবার পথে প্রিয়দর্শী বলে, ব্যাপারটা কি বলুন তো? আমার হাইট ওয়েট—এসব প্রশ্ন উঠছে কেন?

প্যাটেল বলেন, বলছি মশাই। দাঁড়ান, একটু সামলে নিই। আপনি উঠেছেন কোথায়?

—উঠিনি কোথাও এখনও। আমার মালপত্র আপনাদের দারোয়ানের কাছে আছে।

—আরে ছি ছি ছি! আসুন আপনি।

নিজের ঘরে ফিরে এলেন সুরযভাই প্যাটেল। বেয়ারাকে ডেঁকে বললেন, দারোয়ানের কাছে এর বাক্স বিছানা আছে। পিক আপ ভ্যানে তুলে দাও। আর সিংজিকে খবর দাও। আমরা বের হব।

প্রিয়দর্শীর দিকে ফিরে বলেন, চলুন প্রথমেই গিয়ে কিছু খেয়ে নেওয়া

যাক। প্রায় দুটো বাজে। সামনেই একটা চীনে রেস্তোরাঁ আছে, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আপনি নন-ভেজিটেরিয়ান তো? বাঙালী মাত্রেই তো তাই। ও, তা ঠিক নয় বুঝি? তা হবে। ও বেলায় এখানে আমার কোন কাজ নেই। আহারাদি সেরে আমার বাড়িতে যাবেন। আমার ফ্ল্যাটেই থাকবেন আপনি, যে কদিন দিভেচা-সাহেব ফিরে না আসছেন।

বাধা দিয়ে প্রিয়দর্শী বলেছিল, কী দরকার এসব হাঙ্গামা করার? আমি কোন হোটেলেই—

প্যাটেলও বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, আমি বিপত্নীক। একলা থাকি। কোন অসুবিধা হলে আপনি নিশ্চয়ই চলে যাবেন হোটেলে। সে আর বেশী কথা কি?

—কিন্তু—

—না, আর কোন কিন্তু নয়। আপনার সব প্রশ্নেরই জবাব দেব আমি, তবে এখনই নয়। খাবার টেবিলে বসে।

তা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন সুরযভাই প্যাটেল। সব প্রশ্নেরই জবাব দিয়েছিলেন ক্রমে ক্রমে। না, 'তাজের স্বপ্ন' ছবিতে কোন ছবি আঁকবার প্রয়োজনে দিভেচা-সাহেব তাকে বোম্বাইয়ে আনেননি। অবশ্য ছবিটাও দরকার। সেটা শাহজাহানের দ্বারা হবে না। প্রিয়দর্শী অবশ্য যদি নেহাৎই অনিচ্ছুক হয় তবে ঐ ছবিখানা এঁকে দিয়ে যথাযোগ্য পারিশ্রমিক নিয়ে ফিরে যেতে পারে। শুধু ঐ একখানা ছবি নয়, আর্ট ডাইরেক্টরের শূন্যপদে রতনচাঁদ দিভেচা একজন দক্ষ চিত্রশিল্পীকে খুঁজছেন স্থায়ী চাকরির জন্য। সে লোক শুধু দক্ষ চিত্রকর হলেই চলবে না, আর্টের উপর তার দখল থাকা দরকার। নিজে হাতে আঁকতে জানার চেয়ে অপরকে দিয়ে আঁকিয়ে নেওয়া, সাজিয়ে তোলার সংগঠনী ক্ষমতাটাই তার মুখ্য গুণ বলে ধরা হবে। প্রিয়দর্শী যদি চায় সে চেষ্টাও করে দেখতে পারে। কিন্তু রতনচাঁদ জহুরীর নজর সেদিকে নয়। রতনচাঁদ দিভেচার নাম বোম্বাই চিত্র জগতের ঘনিষ্ঠ মহলে বিশেষভাবে পরিচিত এই কারণে যে তিনি প্রতি ছবিতেই নূতন নূতন চিত্রতারকা আমদানী করার দুঃসাহস রাখেন। এইজন্য স্টুডিও-চত্বরে তাঁর নাম জহুরী সাব। ব্যবসায়ের প্রয়োজনে সারা ভারবর্ষেই ঘুরে বেড়াতে হয় তাঁকে। এ পর্যন্ত বহুবারই তিনি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন আনকোরা সুদর্শন ছেলে অথবা মেয়েকে, উত্তরকালে যারা নাকি স্বনামধন্য চিত্রতারকা হয়েছে। পাঁচ সাত বছর আগে ফ্রক পরা একটি বেণীদোলানো মেয়ে শাহ-

জাহানের সঙ্গে স্টুডিওতে এসেছিল স্যুটিং দেখতে। দিভেচা কৌতূহলী হয়ে জেনে নিয়েছিলেন মেয়েটি শাহজাহানেরই একমাত্র কন্যা। জহুরী দিভেচা সে মুখটি ভোলেননি। তাই সে মুহূর্তে পাঁচবছর পর শাহজাহান প্রস্তাব তুলেছিল তার মেয়েকে ছবিতে নামাতে চায়, তৎক্ষণাৎ তার বাড়িতে গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। দিল্লীর কোন প্রদর্শনীতে তিনি নাকি একটা স্টলের দেওয়ালে ভারতীয় ফ্রেস্কো দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তখনই মনে হয়েছিল এই চিত্রকরকে দিয়ে তাজের ছবিখানা আঁকিয়ে নিলে হয়। চিত্রকরকে ডেকে পাঠিয়ে ছিলেন ; কিন্তু তাকে দেখেই মনে হয়েছিল এ একেবারে খাঁটি ইস্পাত। খুন্তি-কোদাল ছুরি-কাঁচি নয়, শান দিলে একে একখানা ঝক্‌ঝকে ডলোয়ার করে তোলা যাবে। প্রিয়দর্শীকে দেখে তাঁর মনে হয়েছিল 'তাজের স্বপ্নে' জয়ন্ত সেনের ভূমিকায় একে চমৎকার মানাবে। উদ্যোগী পুরুষ তিনি—কায়দা করে ওকে বোম্বাই পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন! পরিচালক নিশিনাথ এবং ম্যানেজার সুরযভাই প্যাটেল ছাড়া আর কেউ জানল না তাঁর আসল উদ্দেশ্য। স্বরূপদাস অথবা শাহজাহান যদি জানত যে প্রিয়দর্শী হচ্ছে আগামী দিনের নায়ক তাহলে তাদের প্রাথমিক অভ্যর্থনাটা নাকি অন্য রকম হত—অন্তত সুরযভাইয়ের তাই বিশ্বাস।

প্রিয়দর্শী বলে, 'তাজের স্বপ্ন' গল্পটা কার লেখা ?

প্যাটেল চাউমীনের লম্বা ল্যাজ নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন, ফর্কের প্যাঁচে সেটাকে ম্যানেজ করে নিয়ে বলেন, সেটা গবেষণার বিষয়। লেখক হিসাবে অবশ্য নাম ছাপা হবে শাহজাহানের, যদিও গল্পটা তার লেখা নয়।

—সে আবার কি ?

—বলছি। শাহজাহান গল্প কবিতা লেখে। মানে লিখত। উর্দুতে। ওর একটা গল্প বেরিয়ে ছিল 'তাজের স্বপ্ন'। একটা উর্দু মাসিক পত্রে। গল্পটা ইতিহাস ভিত্তিক। আপনি জানেন হয়তো তাজমহলের পরিকল্পনাকার হচ্ছেন মীর ঈশা মুহম্মদ খাঁ। এই উর্দু গল্পটার বিষয়বস্তু—পীয়র লো নামে একজন ইটালীয়ান আর্কিটেক্টই আমলে তাজমহলের প্ল্যানটা ছকেন। তিনি এসেছিলেন য়ুরোপ খণ্ড থেকে পর্যটক বার্নিয়ের সঙ্গে। আগ্রাতে এসে যখন জানতে পারলেন সম্রাট শাহজাহাঁ বিপুল অর্থব্যয়ে বিগত সম্রাজ্ঞীর স্মৃতি রক্ষার্থে একটি অপূর্ব মুসৌলিয়ম তৈরী করাতে চান তখন তিনি প্ল্যানটা ছকেন। এক্ষু সময়েই পীয়র লো একটি কাশ্মীরী সুন্দরীর প্রেমে পড়েন, যে নাকি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে তাঁর প্ল্যানটা সরিয়ে ফেলে—সেটা এসে পড়ে ঈশা

মুহম্মদের দখলে। ফ্যান্টাস্টিক গল্প মশাই—

প্রিয়দর্শী বলে, কিন্তু এ গল্পে 'জয়ন্তর' স্থান কোথায়? মুঘল দরবারে জয়ন্ত সেন?

—শুনুন তো সবটা। গল্পটা পড়ে দিভেচা সাহেবের মাথায় একটা ব্রেন-ওয়েভ এল। সম্পূর্ণ অন্য একটা প্লট তাঁর মাথায় এল। একেবারে হাল আমলের পটভূমি। যাঁর নায়ক একজন বৃদ্ধ ইতিহাসের অধ্যাপক। মুঘল পিরিয়ড যাঁর গবেষণার বিষয়। একটি প্রাচীন রোজনামচা উদ্ধার করে তিনি আবিষ্কার করেছেন, যে তাজমহলের পরিকল্পনাকার ঈশা মুহম্মদ নয়, পীয়র লো। তাঁর এই রিসার্চের কাগজপত্রগুলি চুরি যায়। এই আধা পাগল অধ্যাপকের মেয়ের রোলটা করেছেন শ্রবণা দেবী, আর তার অপোসিটে প্রয়োজন হয়েছে জয়ন্তের রোলে একজন সুদর্শন যুবকের। বৃদ্ধ অধ্যাপকই অবশ্য কাহিনীর নায়ক, দাদামণি সে পার্টটা করছেন;—কিন্তু জয়ন্ত আর নীলার ভূমিকাটাও গল্পে কম আকর্ষণীয় নয়।

প্রিয়দর্শী প্রশ্ন করে, তাহলে গল্পের লেখক শাহজাহান হল কি করে? এ তো একেবারে অন্য কাহিনী।

—সেটা দিভেচা সাহেবের বদান্যতা। গল্পের মোদ্দা প্লটটা দিভেচা সাহেবেরই। তবু যেহেতু কাহিনীর প্রেরণা তিনি শাহজাহানের ছোটগল্প থেকে পেয়েছিলেন এবং যেহেতু শাহজাহানেরগল্পের আদি নামটা তিনি ব্যবহার করেছেন তাই ওকে লেখক হিসাবে হাজার দুই টাকাও দিচ্ছেন।

প্রিয়দর্শী বলে, আমার মনে হয় শাহজাহানের আত্মসম্মানে বাধবে বলে উনি এভাবে ঘুরিয়ে টাকাটা ওকে পাইয়ে দিলেন। আসলে লোকটার চাকরি গেল বলেই এ ক্ষতিপূরণ।

সুরযভাই হেসে বলেন, কথাটা আপনার ঠিক হল না বাবুজি। প্রথমত হাত পাততে শাহজাহানের কোনদিন লজ্জা হয়েছে বলে শুনিনি। নেশার সময় পকেট খালি থাকলে সে অচেনা লোকের কাছেও অনায়াসে হাত পাতে। দ্বিতীয়ত শাহজাহানকে এ সম্মানটা উনি দিয়েছেন শ্রবণাকে তাঁর হাতে তুলে দেওয়ার জন্য—

—মানে?

—শাহজাহানের মেয়ে হচ্ছেন শ্রবণা দেবী।

—বলেন কী? শ্রবণা দেবী মুসলমান?

—না। যেহেতু শাহজাহানও হিন্দু। অবাক হয়ে যাচ্ছেন, না? শাহ-

জাহান ওর আসল নাম নয়—ছদ্মনাম। এ নামেই উর্দু সাহিত্যে তার একটা স্থান আছে, অন্তত বোম্বাইয়ের উর্দু পত্রিকাগুলিতে। ওর সত্যিকারের নামটা আমার মনে নেই—বোধ করি শাহজাহানের নিজেরই মনে নেই।

—কিন্তু ছদ্মনামের সঙ্গে ও অমন ছদ্মবেশ পরে কেন? ঐ টুপী, মেরজাই,—

—আরে আর্টিস্ট মানেই পাগল! আপনি কিছু মনে করলেন না তো?

প্রিয়দর্শী হাসে। বলে, আর কে আছে ওর সংসারে?

—আর কেউ নেই। বাপ আর মেয়ে।

কথার পিঠে কথা বলার সুরে প্রিয়দর্শী বলে, শ্রবণা দেবী বুঝি অনেক দিন আছেন ফিল্ম্ লাইনে?

—মোটেই নয়। এই প্রথম নামছেন উনি।

—আচ্ছা, একটা কথা। আপনি বলতে পারেন, শ্রবণা দেবী কি মাস-খানেক আগে একবার আগ্রা গিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ গিয়েছিলেন। তাজমহলের কাছে আমাদের কয়েকটা সট নিতে হয়েছিল। কেন বলুন তো?

—আমার মনে হচ্ছে মাসখানেক আগে আগ্রা স্টেশনে ওঁকে দেখেছিলাম। উনি কবে গিয়েছিলেন বলতে পারেন?

পকেট থেকে ডায়েরিটা বার করে পাতা উল্টে দেখে প্যাটেল বলেন, পাঁচই নভেম্বর আগ্রাতে স্যুটিং শুরু হয়। তার আগের দিন সকালে উনি গিয়ে-ছিলেন।

প্রিয়দর্শীর কাছে ডায়েরি নেই। রাঁচি ত্যাগের দিনটা স্মরণীয় একটা তারিখ। মনে মনে হিসাব করে মিলিয়ে নেয়। হ্যাঁ, তারিখটা মিলে যাচ্ছে। ভুল তার হয়নি। যমজ বোন নয়, শ্রবণাই নিজেকে বৈশাখী বলে পরিচয় দিয়েছিল। তাহলে সে এভাবে অস্বীকার করছে কেন?

—কি ভাবছেন বলুন তো?

—কিছু নয়। চলুন যাওয়া যাক্।

এই তো গেল প্রথম দিন। প্যাটেল সাহেবের অতিথি হিসাবেই আশ্রয় নিয়েছিল সে রাত্রে। পরদিন কিন্তু সে কিছুতেই রাজী হল না কণ্ঠস্বরের পরীক্ষা দিতে। সুরযভাইয়ের সনির্বন্ধ অনুরোধের জবাবে ও বলেছিল, ছবি এঁকে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম আমি। নতুন কোন প্রস্তাব আমি বিবেচনাই করব না।

অগত্যা সুরযভাই প্যাটেল নিশিনাথের দ্বারস্থ হলেন। প্রিয়দর্শীর ডাক পড়ল নিশিনাথের ঘরে। বেয়ারার পিছু পিছু প্রিয়দর্শী তাঁর খাস কামরায় এসে দেখে একখানা ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন নিশিনাথ চট্টোপাধ্যায়। আহত ডান পাটা তুলে দিয়েছেন একটা টুলে। একজন ভৃত্য শ্রেণীর লোক আইস-ব্যাগ চাপিয়েছে হাঁটুর কাছে। সামনে একটা চেয়ারে বসে আছে শ্রবণা। নিশিনাথ ওকে আজকের অভিনয় অংশটুকু বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। প্রিয়দর্শী প্রবেশ করতেই নিশিদা ক্রিপ্‌টখানা সরিয়ে রেখে বলেন, আয়ে এস এস ভায়া। তুমি বল্‌ছি বলে কিছু মনে কর না, আমি সবাইকেই তুমি বলি।

—না না, তাতে কি।

—কিন্তু এসব কি শুনছি ? তুমি নাকি ভয়েস টেস্ট করাওনি ?

প্রিয়দর্শী একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে। কোন উত্তর দেবার আগেই নিশিদা আবার বলে ওঠেন, তোমার সঙ্গে এর আলাপ নেই বোধ হয়। এ হচ্ছে শ্রবণা রায়। 'তাজের স্বপ্নে' নীলার পার্ট করছে—জয়ন্তের অপোসিটে। আর ও হচ্ছে—ডিয়ার মি, তোমার নামটা—

প্রিয়দর্শী বলে, পিতৃদত্ত নাম কুন্তল—এখানে অবশ্য সবাই প্রিয়দর্শী বলে জানে—

—হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রিয়দর্শী। পিতৃদত্ত নামের চেয়ে এ নামটা তোমাকে বেশী মানায়, কি বল শ্রবণা ?

শ্রবণা জবাব দেয় না। মুখটা নিচু করে থাকে।

—তা তুমি নাকি অভিনয় করতে রাজী নও ?

—না, রাজী নই। আমি ছবি আঁকার কাজে এসেছি। সেটাই করতে চাই—

—ছবি তৈরী করতেই তো ডাকছি তোমাকে। রঙে আর রেখায় নয়, সমস্ত সত্তা দিয়ে ছবি তৈরী কর এবার।

প্রিয়দর্শী বললে, তাতে অসুবিধা আছে আমার পক্ষে।

—যদি প্রশ্নটা অসঙ্গত মনে না কর—অসুবিধাটা কি জাতীয় ? বাড়ি থেকে আপত্তি ?

—না। বাড়িতে কেউ নেই আমার। সেজন্য নয়।

নিশিনাথ তখন ওকে বোঝাতে থাকেন। উচ্ছ্বাসের মুখে অনেক কথা বলে গেলেন তিনি। সিনেমা শিল্পটাকে যারা এখনও একমাত্র প্রমোদের উপকরণ বলে মনে করে নিশিনাথ তাদের দলে নন। এ দেশের অধিকাংশ

লোক বই পড়তে পারে না—সাহিত্য জগতের কোন খবর তারা রাখে না। তারা সিনেমা দেখে। দেশের আপামর জনসাধারণের রুচি, তাদের চেতনা, তাদের শিক্ষার রূপায়ণে এই চিত্রশিল্পের যে কী প্রচণ্ড প্রভাব তা কেউই তলিয়ে অনুধাবন করে দেখছে না। সকলেই মনে করছে এটা অর্থোপার্জনের একটা অবলম্বন মাত্র। ডিস্ট্রিব্যুটার প্রডিউসারের নজর বক্স-অফিসের দিকে। কুশীলবদের নজর আরও চড়াদামের কনট্রাক্টের দিকে। ভাল ছবি নয়, ভাল বিক্রির সম্ভাবনাময় ছবিই সকলের একমাত্র লক্ষ্য। আর বিক্রি বাড়াবার পন্থাটা কি? অশ্লীল ভঙ্গিমা, অশালীন নাচ গান, অর্ধ-উলঙ্গ নারীদেহ, বেলেল্লাপনা অথবা খুন-জখম রক্তারক্তি। যাঁরা এ শিল্পের নিয়ামক তাঁরা বুঝে নিয়েছেন—সাধারণ দর্শক উচ্চকোটির যে জীবনযাত্রার নাগাল পায় না, যে সব ক্যাবারে নাচ, সুইমিং পুলের অর্ধনগ্ন নারীদেহ তাদের দেখবার সৌভাগ্য হয় না তাই ওদের উপহার দিতে হবে। ওদের সুপ্তকামনা তাতেই তৃপ্ত হবে। খুন-জখম মারামারির দৃশ্যে ওদের বঞ্চিত বিদ্রোহী আত্মা একটা তির্যকতৃপ্তি পায়। ভাইকেরিয়াস এঞ্জয়মেণ্ট! ওরা হুমড়ি খেয়ে পড়ে টিকিটঘরের সামনে। এই বিষচক্রের মাঝখানে সকল যুগেই দেখা দেন কিছু শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ—তাঁরা মুষ্টিমেয়, তাঁরা মোড় ঘোরাতে চান, তাঁদের ছবি মার খায়! ফ্লপ হয়। ফলে বিস্মরণের নেপথ্যে সরে দাঁড়াতে হয় সেসব পরিচালককে। এই লড়াইয়ে রণভূমি থেকে তুমি আমি সরে দাঁড়াতে পারি না। ভাল জাতের বই করতে হবেই; আর সে জন্য প্রয়োজন নতুন দল, নতুন মুখ, নতুন প্রেরণা। জোট বাঁধতে হবে তাদের নিয়ে যারা শুধু পয়সার জন্য এ পথে পা বাড়ায়নি।

হঠাৎ বাধা দিয়ে শ্রবণা বলে ওঠে, মিস্টার রতনচাঁদ দিভেচা বুঝি সেই-জন্যেই নতুন লোক খুঁজছেন?

নিশিনাথ সোজা হয়ে উঠে বসেন। স্থির দৃষ্টিতে শ্রবণার দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেন, না! দিভেচা আমাদের বিপক্ষ শিবিরের লোক! কিন্তু নিশিনাথ চাটুজ্জে যে বই তোলে সে বইয়ে সেই তার প্রাণকেন্দ্র। দিভেচা যে 'তাজের স্বপ্ন' দেখছে, আমি সে তাজের স্বপ্ন দেখছি না। আমার কোন কথায় কথা বলার সাহস যদি দিভেচার থাকত তাহলে এ ছবি আমি হাতে নিতাম না।

শ্রবণা কিন্তু আবার বাধা দিয়ে বলে ওঠে, কিন্তু এ ছবিতেও তো বেদিং কস্টিউম পরা অর্ধনগ্না ছবি দেখানো হচ্ছে?

ভ্রূ কুঞ্চিত করে নিশিনাথ বলেন, কে বলল তোমাকে?

দিভেচাই বলেছিলেন।

একটু চুপ করে থাকেন নিশিনাথ। কি যেন ভেবে নেন। তারপর বলেন —শাহজাহান আর্ট ডাইরেক্টর যে 'তাজের স্বপ্ন' দেখছিল সেটা ফ্যান্টাসটিক হলেও রোমান্টিক, আর দিভেচা যে 'তাজের স্বপ্ন' দেখছে সেটা রোমান্টিক না হলেও ভালগার। দিভেচা যদি শাহজাহানের উর্দু গল্পের খোল নলচে বদলাতে সঙ্কোচবোধ না করে, তবে নিশিনাথ চাটুজ্জেও দিভেচার গল্পের আদ্যোপান্ত বদল করতে কুণ্ঠিত হবে না। নীলার সমুদ্রস্নানের সিকোয়েন্সটা আদ্যন্ত বাদ দিয়েছি আমি! তুমি তো জান শ্রবণা, আমি যদি মাঝখানে এসে না দাঁড়াতাম তুমি এ ছবিতে নামতে না। তুমিও তো সরে দাঁড়িয়েছিলে প্রথমটায়।

শ্রবণা চুপ করে থাকে।

প্রিয়দর্শী বলে, শ্রবণা দেবী কেন আপত্তি করেছিলেন জানি না, কিন্তু আমার আপত্তিটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কারণে। আপনি আমাকে মাপ করবেন।

ইজিচেয়ারের পাশে পড়ে থাকা লাঠিটায় ভর দিয়ে নিশিনাথ উঠে দাঁড়ান বলেন, ফ্লোরে যাবার সময় হল।

প্রিয়দর্শী এবার সরাসরি শ্রবণাকে প্রশ্ন করে, গত চৌঠা অক্টোবর আপনি আগা ফোর্ট স্টেশনে—

শ্রবণা ওকে কথা শেষ করতে না দিয়ে নিশিনাথকে বলে ওঠে, স্ক্রিপ্‌টটা পড়ে থাকল যে নিশিদা—

স্ক্রিপ্‌টটা ওর হাত থেকে নিয়ে নিশিনাথ দ্বারের দিকে এগিয়ে যান, বলেন, তোমরা কথা বল, আমি যাই। আমি তো পারলাম না, দেখ শ্রবণা তুমি যদি ওকে রাজি করাতে পার।

নিশিদার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে শ্রবণা বলে, না, চলুন আমিও যাচ্ছি আপনার সঙ্গে।

প্রিয়দর্শীর অসমাপ্ত বাক্যটা আর সমাপ্ত হল না। হল নাই বা কেন? পরিষ্কার একটি যবনিকা তো টেনে দিয়েগেল শ্রবণা তার উপেক্ষাভরা জবাবে।

এই গেল দ্বিতীয় দিন।

তৃতীয় দিনে এসে পড়লেন দিভেচা।

আবার ডাক পড়ল প্রিয়দর্শীর। খোদ মালিকের ঘরে। কিন্তু প্রিয়দর্শী মনস্থির করে ফেলেছে। না, শ্রবণার বিপরীতে জয়ন্তের ভূমিকায় সে অভিনয় করতে পারবে না। সেকথা অবশ্য খোলাখুলি প্রকাশ করে বলার প্রয়োজন

নেই; ও শুধু দৃঢ়ভাবে জানাল যে, সিনেমায় নামবার ইচ্ছা ওর নেই। কারণটা ব্যক্তিগত। ওর আপত্তির কথা পূর্বেই শুনেছিলেন দিভেচা। কাজের মানুষ তিনি। এবার প্রিয়দর্শীর সামনে যিনি দাঁড়ালেন তিনি আর সেই অশোকা হোটেলের মন্ত্রণ নন, রাশভারী প্রডিউসার। একবার মাত্র অনুরোধ করলেন প্রিয়দর্শীকে, প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানমাত্র বললেন, ও, কে! সরি টু গিভ য়ু ট্রাবলস্। যাতায়াতের ভাড়া আপনাকে দেওয়াই আছে। সো উই কুইট!

—স্কেচো আঁকাবেন না আপনি?

—নো থ্যাঙ্কস্।

সংক্ষিপ্ত আলাপ। প্রিয়দর্শী বেরিয়ে এল শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত ঘর থেকে। সুরযভাই তবু একবার শেষ চেষ্টা করে, কিন্তু প্রিয়দর্শী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সেদিন সন্ধ্যার ট্রেনেই ফিরে যাবে সে। কোথায়? তা এখনও ঠিক করেনি। তবে বোম্বাইয়ে আর একদিনও নয়।

প্যাটেল বলে, বাবুজি, আপনার আসল আপত্তিটা কোথায় তা আমাদের কাউকে বলেননি, এত অল্প পরিচয়ে সে প্রশ্নটা করা হয়তো অশোভন হবে আমার তরফে; কিন্তু একটা কথা আমার কানে এসেছে, তাই কথাটা বললাম, আপনার আপত্তি কি শ্রবণা দেবীর বিপরীতে অভিনয় করতে হচ্ছে বলে?

ভ্রূ কুঞ্চিত করে প্রিয়দর্শী বলে, একথা মনে করার কারণ?

প্রডাক্সন ম্যানেজার হিসাবে সবদিকেই আমাকে নজর রাখতে হয়। শুনেছি আপনি একাধিকবার বলেছেন, শ্রবণা দেবী আপনার পূর্ব-পরিচিত। একথা সত্যি?

একটু ইতস্তত করে প্রিয়দর্শীবলে, হ্যাঁ সত্যি! উনি আমার অপরিচিত নন।

—আপনি কি অন্য কোন চরিত্রে অভিনয় করতে রাজী? অন্য কোন ছবিতে?

—না সুরযভাই। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। বোম্বাই আমার ভাল লাগছে না। আমি বড় খেয়ালী মানুষ; এ জীবন আমার সহ্য হবে না।

—বুঝলাম। কিন্তু এমনও তো পারে যে সর্বসমক্ষে আপনি শ্রবণা দেবীকে জিজ্ঞাসা করছেন বলেই তিনি পূর্ব পরিচয়টা অস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন।

একটু ভেবে নিয়ে প্রিয়দর্শী বলে, হতে পারে।

—হতে পারে নয়, সেটাই সত্য। হয়তো একথা স্বীকার করার মধ্যে শ্রবণা দেবীর তরফে কোন সংকোচ আছে। কিসের সংকোচ সেটা আমার চেয়ে আপনি ভাল জানেন—

প্রিয়দর্শী চুপ করে শুনে যায়।

—আপনি ওঁর সঙ্গে একবার আড়ালে কথা বলে দেখবেন বাবুজি?

—সে সুযোগ আমি পাচ্ছি কোথায়?

—আমি সুযোগ করে দেব। আজ ঠিক সাড়ে আটটার সময় আপনি গেটের কাছে ঐ সাদা এ্যাম্বাসাডার গাড়িটার কাছে থাকবেন। ঐ গাড়িতে করে শ্রবণা দেবীকে বাড়িতে ছেড়ে আসা হয়। আপনিও যাবেন ঐ গাড়িতে। আমি ড্রাইভারকে বলে দেব।

নির্দেশমত রাত আটটার সময় গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল প্রিয়দর্শী। স্টুডিও থেকে শ্রবণা আর প্যাটেল কথা বলতে বলতে বেরিয়ে আসে; এগিয়ে আসে গাড়িটার কাছে। হঠাৎ প্রিয়দর্শীকে দেখতে পেয়ে প্যাটেল বলে ওঠে, এই তো আপনি আছেন। ভালই হয়েছে। আপনিও এ গাড়িতে চলে যান। শ্রবণা দেবীকে নামিয়ে গাড়ি আপনাকেও নামিয়ে দিয়ে আসবে।

শ্রবণা থমকে দাঁড়িয়ে পরে। প্রিয়দর্শীর দিকে একনজর তাকিয়েই নত করে দৃষ্টি। তারপর যেন কিসের একটা দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বলে, তারচেয়ে আমাকে বরং একটা ট্যাক্সি ডেকে দিন। এতটা ঘুর পথে গেলে ওঁর দেরী হয়ে যাবে।

প্যাটেল তৎক্ষণাৎ বলে, না না, ঘুর পথ হবে কেন? উনি তো ঐ দিকেই যাবেন বললেন, তাই নয়? জুহুতেই তো যাবেন আপনি?

প্রশ্নটা প্রিয়দর্শীকে কিন্তু সে জবাব দেবার আগেই শ্রবণা বলে ওঠে, না থাক্। আপনি দয়া করে আমাকে একটা ট্যাক্সিই ডেকে দিন।

রাগে দুঃখে অভিমানে প্রিয়দর্শীর ইচ্ছে হল নিজের গালে ঠাস করে একটা চড় মারে। বললে, তার প্রয়োজন নেই শ্রবণা দেবী। ট্যাক্সি আমিই ডেকে নিচ্ছি। আর তাছাড়া প্যাটেল সাহেব ভুল বলেছিলেন, জুহুর কোন মোহ আমাকে আকর্ষণ করছে না; আমি বরং জুহুর বিপরীত দিকেই যেতে চাই।

প্যাটেল হাত দুটি উল্টে দিয়ে হতাশার ভঙ্গি করে।

ঠিক তখনই যেন দৈববাণীর মত শোনা গেল, ট্যাক্সি কাউকেই ডাকতে হবে না। শ্রবণাকে আমিই পৌঁছে দিচ্ছি। এস শ্রবণা।

তিনজনেই চমকে ওঠে। অন্ধকারের মধ্যে কখন এসে দাঁড়িয়েছেন স্বয়ং রতনচাঁদ দিভেচা।

—এস শ্রবণা। ওকে এ্যাম্বাসাডারটা ছেড়ে দাও! আমি জুহুর দিকেই

যাচ্ছি। আজ রাতে জুহুই আমাকে আকর্ষণ করছে!

হঠাৎ কি যেন হল শ্রবণার। চট করে ঘুরে দাঁড়ায় প্রিয়দর্শীর মুখোমুখী। চেপে ধরে তার হাতখানা। ঠিক সেই মুহূর্তে গেট দিয়ে ঢুকল একটা গাড়ি। তারই হেডলাইটের ক্ষণিক আলোয় প্রিয়দর্শী দেখতে পায় শ্রবণার মুখটা ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেছে। মনে হল ঘামে ভিজে উঠেছে শ্রবণার মুঠি। অদ্ভুত পরিবর্তন হল শ্রবণার। আপ্রাণ প্রচেষ্টায় সে লাস্যময়ী এক নারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হল যেন, হেসে বললে, থ্যাঙ্ক য়ু মিস্টার দিভেচা। কিন্তু আজকের সন্ধ্যাটির জন্য আমাকে মাপ করতে হবে। আমার হলেও-হতে-পারত হিরোর সঙ্গে এই 'লাস্ট রাইড টোগেদার' থেকে বঞ্চিত হতে চাই না! আপনি তো রইলেনই, এঁকে তো আর পাব না!

প্রিয়দর্শীর হাতটা আকর্ষণ করে শ্রবণা।

প্যাটেল যেন প্রস্তরমূর্তি।

দিভেচা হেসে বলেন, ক্লেভার গার্ল!

শ্রবণার দৃঢ় মুঠিতে হাতটা ধরাই ছিল। ওর পিছনে পিছনে গাড়িতে উঠে বসে প্রিয়দর্শী।

গাড়িটা নেমে এল পথে।

শ্রবণা হাতটা শিথিল করে দুহাতে মুখটা ঢেকে গাড়ির ও প্রান্তে বসে থাকে নিশ্চুপ। গাড়ি চলেছে এঁকে বেঁকে জনবহুল বোম্বাইয়ের সড়ক দিয়ে। আর নিজেকে সম্বরণ করতে পারে না প্রিয়দর্শী। অস্ফুটে বলে, ব্যাপার কি বৈশাখী?

শ্রবণা কোন জবাব দেয় না। হাতটাও সরিয়ে নেয় না মুখ থেকে। প্রিয়দর্শী অনুভব করে শ্রবণা কাঁদছে। পিঠটা কেঁপে কেঁপে উঠছে তার। একবার ইচ্ছে হল আলতো করে হাতটা রাখে ওর পিঠে; কিন্তু সে ইচ্ছেকে দমন করল। মেয়েটি রহস্যাবৃত। কী জানি ও কী মনে করবে।

নিজেই সামলে নিল শ্রাবণা। আঁচলে মুখটা মুছে স্থির হয়ে বসল। প্রিয়দর্শী কি একটা কথা বলার উপক্রম করতেই মেয়েটি ঠোঁটে আঙুল ছোঁয়ালো। যে কথা খেয়াল হয়নি প্রিয়দর্শীর, এমন কি প্যাটেলের, সেকথাটা ভোলেনি শ্রবণা, তার সহজাত নারীর প্রবৃত্তিতে। গাড়ির চালক দিভেচা-নিয়োজিত। তাকে বিশ্বাস নেই।

বাঁকের মুখে শ্রবণা বলে বসে, ব্যস। ইহাই রোখো।

প্রিয়দর্শী যন্ত্রচালিতের মত নেমে আসে। জুহু সমুদ্রতীরের কাছেই থেমেছে

গাড়িটা। শ্রবণার বাড়ির অনতিদূরে। প্রিয়দর্শী প্রশ্ন না করে পারে না, এমন মাঝপথে হঠাৎ থেকে পড়লেন যে?

পীচের সড়ক ছেড়ে শ্রবণা বালিয়াড়ির দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ঝোড়ো হাওয়ায় ওর আঁচলটা উড়ছে, চুলগুলো চোখে মুখে উড়ে পড়ছে। হাত দিয়ে চুলের গুচ্ছ সরিয়ে দিয়ে শ্রবণা বলে, সব জিনিসকে শেষ পরিণতি পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়াই কি ভাল? এমন মাঝপথে যবনিকা পড়াই তো রোমান্টিক।

রাত বেশী হয়নি। জুহু সমুদ্রতীরে তখনও ঘর-পালানো মানুষের কল-গুঞ্জন। নানান বেশে নানান জাতের মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সমুদ্র-সৈকতে। সমুদ্রের দিক থেকে সোঁ সোঁ আওয়াজ তুলে অবিশ্রান্ত ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপামি। নারিকেল গাছগুলো ঝাঁকড়া মাথা নুইয়ে কাকে যেন প্রণাম করছে।

প্রিয়দর্শী অনুভব করে মেয়েটি ইতিমধ্যে বেশ সামলে নিয়েছে নিজেকে। গাড়ির ভিতরকার লবণাক্ত আর্দ্র মুহূর্তগুলো যেন সে অস্বীকার করতে চায়। সেও পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে বালিয়াড়ির উপর। বলে, সে কথা একশবার।

কলমুখরিত সমুদ্রসৈকতে আলোবোজ্জ্বল অংশটা এড়িয়ে ওরা উত্তর দিকে চলতে থাকে। সমুদ্র গর্জনের সঙ্গে ট্রানিসিস্টরে বাজানো একটা সঙ্গীত মূর্ছনার অর্কেস্ট্রা। তারই মধ্যে শ্রবণা বলে, তাছাড়া আপনার কাছে অপরাধী হয়ে আছি, এই সুযোগে ক্ষমা চেয়ে নিতে চাই।

—অপরাধটা কিসের শ্রবণা দেবী?

—অপরাধটা কিসের সে তো ভালই জানেন আপনি। শাস্তিও দিয়ে চলেছেন সে অপরাধের।

—শাস্তি! কী শাস্তি দিচ্ছি আমি?

—কেন, ঐ সম্বোধনটায়? আমার নাম কি শ্রবণা?

—তাই তো শুনলাম এখানে এসে। পাঁচজনে ঐ নামেই তো ডাকছে দেখছি আপনাকে।

—পাঁচজনের একজন সেজেই তো শাস্তি দিচ্ছেন আপনি।

—কিন্তু বৈশাখী নামে ডেকেও তো সাড়া পাইনি!

পায়ে পায়ে ওরা চলে এসেছে অপেক্ষাকৃত একটা নির্জন অংশে। কংক্রিটের একটা ভাঙা কূপের উপর শ্রবণা বসল, বললে, অপরাধ করেছিলাম নিভৃতে, কিন্তু আপনি যে তার বিচার করতে বসলেন প্রকাশ্য আদালতে।

—নিভৃত অপরাধের প্রকাশ্য বিচারই তো আইনের নির্দেশ, বললে প্রিয়দর্শী পাথরের অপরপ্রান্তে উপবেশন করে।

আঙুলে শাড়ির আঁচলটা জড়াতে জড়াতে শ্রবণা বলে, অপরাধী শাস্তি ভোগ করে কিন্তু আবার সেই জনান্তিকেই। সেই শান্তি মাথা পেতে নেব বলেই তো আজ আপনাকে ডেকে এনেছি।

প্রিয়দর্শী একটা ঝিনুক কুড়িয়ে নিয়ে সেটার দিকে তাকিয়ে বলে, কিন্তু শস্তি বিধানের আগে অপরাধীর একটা কনফেশান স্টেটমেণ্ট আশা করা অন্যায় হবে না নিশ্চয়। কেন সেদিন আপনি কাকাবাবু, মানে বনবিহারী বাবুকে বলেছিলেন—যে আপনি বিধবা, কোন এক মথুরাবাবুর ভাগ্নের সঙ্গে আপনার বিয়ের আয়োজন হয়েছিল?

হঠাৎ খিল খিল করে হেসে ওঠে শ্রবণা বেণী দুলানো ছোট মেয়ের মত। বলে, অপরাধী তার আগে স্বয়ং বিচারকের একটা কনফেশান স্টেটমেণ্ট দাবী করছে। আপনি স্বীকার করুন, আপনার জীবনের ঘটনাই বলেছিলেন সে রাত্রে!

—অর্থাৎ কুন্তলের কাহিনী আমার নিজের জীবনের ঘটনা মনে করেই আপনি কাকাবাবুকে এক ঝুড়ি মিথ্যে কথা বলেছিলেন, না? যাতে আপনি নেমে গেলে কাকাবাবু আমাকে সেই গল্প করেন, আর আমি হা হুতাশ করি। তাই নয়।

শ্রবণা জবাব দেয় না। হাসতেই থাকে।

—কিন্তু কখন এসব বললেন তাঁকে?

—আপনি ঘুমিয়ে পড়ার পর। এক ঘুম দিয়ে নিয়ে উনি উঠে বসলেন, শুরু করলেন গল্প। আগ্রায় আমি কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, আমার বাবা-মা আছেন কিনা, বিয়ে করেছি কিনা, ইত্যাদি।

—আপনি তো সাংঘাতিক লোক। আপনি তো মানুষ খুন করতে পারেন।

ঠোঁট উলটে শ্রবণা বলে, আপনি কিন্তু তা বলে খুনী আসামীর বিচার করছেন না, কুন্তলবাবু।

—আবার কুন্তলবাবু। বলছি, কুন্তল আমার গল্পের নায়ক। ও ঘটনা আমার জীবনে ঘটেনি।

—সত্যি বলছেন? আমার গা ছুঁয়ে বলতে পারেন?

প্রিয়দর্শী চুপ করে যায়। সমুদ্রের অন্ধকারে দৃষ্টি মেলে দিয়ে বলে, না তা

পারি না। কেন পারি না, তাও আজ আপনাকে বলতে পারব না—যদি কখনও সুযোগ পাই, বলব। আপনাকেই বলব।

ওর এ কথায় এমন একটা বেদনাবিধুর ব্যঞ্জনা ছিল যে চমকে গেল শ্রবণা। বুঝল, ভিতরে কিছু একটা আছে। কৌতূহল দমন করে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে, সে যাই হোক, নিশিদার প্রস্তাব আপনি এভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন কেন? এমন হঠাৎ বোম্বাই ছেড়ে চলেই বা যাচ্ছেন কেন?

প্রিয়দর্শী অন্তহীন সমুদ্রের উপর থেকে দৃষ্টিটা ফিরিয়ে আনে তার সঙ্গিনীর দিকে। মৃদু হেসে বলে, সব জিনিসকে শেষ পরিণতি পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়াই কি ভাল শ্রবণা দেবী? মাঝপথে থেমে পড়াই তো রোমান্টিক।

শ্রবণা হেসে বলে, আমি কিন্তু বলব না 'সে কথা একশবার।'

—তবে কি বলবেন?

—বলব, বৈশাখীর উপর অভিমান করে আপনি শ্রবণাকে শাস্তি দিচ্ছেন।

আবার কিছুটা চুপচাপ।

প্রিয়দর্শী আবার বলে, আর একটা কথা। দিভেচা-সাহেব আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেবার প্রস্তাব করায় আপনি ওভাবে চমকে উঠেছিলেন কেন? হঠাৎ আমার হাতেই বা চেপে ধরলেন কেন? তার কারণটা আমাকে জানাতে পারেন?

এবার শ্রবণার দৃষ্টি চলে যায় সঙ্গীর কাছ থেকে দূর সমুদ্রের দিকে। গম্ভীর হয়ে বললে, না পারি না। কেন পারি না, তাও এখন আপনাকে বলতে পারব না—যদি কখনও সুযোগ পাই তো বলব—আপনাকেই বলব শুধু।

প্রিয়দর্শী হেসে বলে, আমরা কি শুধু একই কথার পুনরাবৃত্তি করে যাব?

শ্রবণা অবাক হয়ে বলে, তার মানে?

প্রিয়দর্শী অনুভব করে, শ্রবণা এই মাত্র কোন বাকচাতুরি করেনি। প্রিয়দর্শীর কথা সে সজ্ঞানে ফিরিয়ে দেয়নি, সে যেমন ভাবে দিয়েছিল শ্রবণার মাঝপথে থেমে পড়ার কথাটা। শ্রবণা যে কথাটা বলেছে সেটা প্রিয়দর্শীর ভাষণের প্রতিধ্বনি; কিন্তু সেটা ওর সজ্ঞান-চয়ন নয়, কাকতালীয়। প্রিয়দর্শী বুঝতে পারে, দুজনেরই মনে জমে আছে নানান কথা, যা তারা অপরজনকে বলতে চায়, কিন্তু স্বল্প পরিচয়ের বাধা অতিক্রম করে বলতে পারছে না। ওকে নীরব দেখে শ্রবণা বলে, আপনি কি জয়ন্তের চরিত্রটা করতে রাজী হবেন?

—রাজী হলেই যে সেটা আমাকে দেওয়া হবে এমন কোন কথা নেই, তবু চেষ্টা আমাকে করে দেখতে হবে।

—হঠাৎ মত বদলালো কিসে? সকৌতুকে প্রশ্ন করে শ্রবণা।

প্রিয়দর্শী কিন্তু গম্ভীর হয়েই জবাব দেয়, যে প্রশ্নটার জবাব আপনি দিতে পারলেন না, সেটা জানার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। আমি তার যে কারণ আন্দাজ করেছি তা যদি সত্য হয়, তবে হয়তো সহজে আমার যাওয়াও চলবে না।

হঠাৎ ঘড়ি দেখে শ্রবণা সচকিত হয়ে বলে. রাত অনেক হয়েছে, চলুন। এবার যাওয়া যাক।

প্রিয়দর্শীও উঠে পড়ে, বলে, চলুন। কাল সকালে আমি নিশিদার সঙ্গে দেখা করব। পরীক্ষায় যদি পাশ হই তবে তো বারে বারেই দেখা হবে, যদি না হই—কাল সন্ধ্যায় আর একবার এখানে আসবেন কি?

—না! আপনি বরং কাল বেলা দুটোর সময় স্টুডিও গেটের কাছে অপেক্ষা করবেন। দুজনে এক সঙ্গেই আসব। তারপর একটু ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলে, যে কদিন দিভেচা বোম্বাইয়ে আছে সে কদিন আপনাকেই এস্কর্ট করতে হবে।

প্রিয়দর্শীর মনে যেটুকু সন্দেহ ছিল তাও ঘুচে গেল।

ওরা উঠে পড়ে সমুদ্র-সৈকত থেকে।

এই প্রিয়দর্শীর তৃতীয় দিনের অভিজ্ঞতা।

চতুর্থ দিনটা ছিল এলোমেলো। নিশিদা খুশি হয়ে ওঠেন ওর মত পরিবর্তনে। উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল প্যাটেল। একটা জবর ওঠশাই কিস্তি দিয়ে নিশিদা বলেন, বাজারে গুজব, প্রিয়দর্শীর মত পরিবর্তনের পিছনে একটা রোমান্টিক টাচ আছে, এবং আমাদের সুরযভাই নাকি সেই রোমান্টিক পরিবেশটি রচনা করে আমাদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন?

প্যাটেল মিটি মিটি হাসে।

পাঁচজনের সামনে প্রিয়দর্শী আর কথা বাড়ায় না। নিশিনাথ এক টুকরো কাগজে প্রিয়দর্শীর মত পরিবর্তনের সংবাদটা লিখে পাঠিয়ে দিলেন দিভেচার কাছে এবং আবার দাবায় ডুবে গেলেন।

প্যাটেল বলে, তাহলে ওঁর ভয়েস টেস্টিংটা সেরে ফেলতে বলি আখতারকে?

—আলবৎ! দাঁড়াও ঘোড়াটা চাপার তলায় পড়ে গেল যে।

নিশিদা ঘোড়াটাকে বাঁচাতে বাঁচাতেই ফিরে এল পিয়নটা। ঘোড়াটাকে আর বাঁচানো গেল না। নিশিনাথ চিরকুটখানা পেয়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। ঘোড়াটা মারা গেল। নিশিনাথ কাগজখানা প্যাটেলের হাতে দিয়ে আবার

দাবার চাল ভাবতে বসে গেলেন। প্যাটেল দেখল দিভেচা ওঁর নোটের নিচে লিখছেন, 'দুঃখিত। জয়ন্তের চরিত্রে প্রিয়দর্শীর পরিবর্তে আমি অন্য একজনকে মনোনীত করেছি।'

প্যাটেল চিরকুটটা প্রিয়দর্শীকে দেখায়। দুজনেই চুপ করে প্রতীক্ষা করে নিশিদার পরবর্তী চাল। প্রতিপক্ষও তাগাদা দেয়, কই চাল দিন নিশিদা।

—হ্যাঁ দিই; কই হে কাগজটা দাওতো? বলে সেই চিবকুটের নিচে আবার নিশিনাথ লিখে দিলেন, 'দুঃখিত! পরিচালকের বিনা সম্মতিতে আপনি যথেচ্ছভাবে চরিত্র বণ্টন করতে পারেন না। এ ক্ষেত্রে নিশিনাথের পরিবর্তে আপনি অন্য একজন পরিচালককে মনোনীত করলে বাধিত হব।'

আবার দাবাখেলায় ডুবে গেলেন নিশিনাথ।

একটু পরে ফিরে এল পত্রবাহক। এবার শুধু লেখা আছে, 'আই উইথড্র!'

বাঁ-হাতে কাগজখানা নিয়ে এক নজর চোখ বুলিয়ে নিশিনাথ দাবাটাকে ডান হাতে ঠেলে দিলেন অপর পক্ষের রাজার ঘাড়ের উপর, হেসে বললেন, —মাৎ!

কিন্তু দুর্ভাগ্য প্রিয়দর্শীর। পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হতে পারল না! সাউণ্ড রেকর্ডার আখতার বারে বারে পরীক্ষা করে রায় দিল প্রিয়দর্শীর কণ্ঠস্বর মাইকের উপযোগী নয়। প্যাটেল মর্মান্তিক হতাশ হল, নিশিদা ভ্রূ-কুঞ্চিত করে রিপোর্টটা দেখছিলেন। প্যাটেল সহানুভূতি দেখিয়ে বললে, বাবুজির বরাতটাই খারাপ!

নিশিনাথ নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, শুধু তাই নয়, দিভেচার দেখছি আবার তুঙ্গে বৃহস্পতি। পিছু হটে গিয়েও বেটা মাৎ করে দিল আমাকে!

সুতরাং দিভেচা-কোম্পানীর সঙ্গে প্রিয়দর্শীর সব সম্পর্ক চুকে গেল। ছবি ওকে দিয়ে দিভেচা আঁকাবেন না, কণ্ঠস্বরের পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হতে পারল না; ফলে যোগসূত্র আর রইল কোথায়? প্যাটেল প্রশ্ন করে, কি করবেন এখন? আজই বোম্বাই ছেড়ে চলে যাবেন নাকি?

—না, বোম্বাইয়ে থাকতে হবে কিছুদিন; কিন্তু তোমার বাসায় আর নয়। আমাকে একটা হোটেল কিম্বা মেস খুঁজে দাও বরং।

কথা হচ্ছিল প্যাটেলের অফিসে। আর কেউ ছিল না সেখানে। একবার চকিতে দ্বারের দিকে দেখে নিয়ে প্যাটেল ওর দিকে ঝুঁকে পড়ে বলে, আমি জানি, জবাবে আমার ভদ্রতা করে বলা উচিত, তাতে কি? যে কদিন

আছেন, আমার ওখানেই থাকুন আপনি। তা কিন্তু আমি বলব না বাবুজি।

প্রিয়দর্শী তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করে ওঠে, না না, সে কথা কেন উঠছে? আপনাদের কোম্পানীর সঙ্গে আর আমার কোন সম্পর্কই তো রইল না।

ওর হাতটা টেনে নিয়ে প্যাটেল বললে, সেজন্য নয় বাবুজি। কোম্পানীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক থাক আর না থাক আপনার সঙ্গে আমার হৃদ্যতার সম্পর্ক তাতে ছিন্ন হবার নয়। কিন্তু কারণটা তো শুধু তাই নয়—

—তাহলে?

—চলুন, আজও আমরা ঐ চীনে হোটেলে গিয়ে লাঞ্চ করি—এখানে সব কথা, মানে—

প্রিয়দর্শী বলে, রাজী। তবে এক সর্তে। সেদিন আপনি খাইয়েছিলেন, আজ আমি খাওয়াব।

সুরযভাই বলে, বেশ। তবে সওয়া একটার সময়।

কাঁটায় কাঁটায় সওয়া একটার সময় সেই চীনা হোটেলে গিয়ে প্রিয়দর্শী দেখে সুরযভাই তার আগেই এসেছে। দুজনে গিয়ে বসল একটা নিভৃত কোণায়। খাবারের অর্ডার নিয়ে বেয়ারাটা চলে গেল। প্যাটেল বললে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে ভয়েস্ টেস্টে আপনি উৎরে যাননি। এ অতি নোংরা জায়গা মশাই, এখানে আপনাদের মত মানুষের ঠাঁই নেই।

—অথচ এই নোংরা জায়গায় আমাকে টেনে নামাবার জন্য গতকাল পর্যন্ত আপনাদের চেষ্টার অন্ত ছিল না।

প্যাটেল হাসে। বলে, তা ছিল না; কিন্তু এই স্টুডিও-চৌহদ্দির মধ্যে জীবনের পনেরটা বছর কেটে গেল আমার। এত দলাদলি, এত খাওয়া-খাওয়ি, এত পরশ্রীকাতরতা আর স্বার্থপরতা বোধহয় অন্য কোন ইনডাস্ট্রিতে নেই। আপনি আন্দাজ করতে পারেন, কেন আপনার ভয়েস-টেস্টিং রিপোর্ট খারাপ হল? আখতারুদ্দিন কেন বারে বারে পরীক্ষা করেও আপনার কণ্ঠস্বর মাইকে ধরতে পারল না ঠিকমত?

—কেন আবার? আমার কণ্ঠস্বরের গলতি।

—মোটেও নয়। তার কারণ গতকাল সন্ধ্যায় আপনি দিভেচা সাহেবের বিরাগভাজন হয়েছেন। তার মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিয়েছেন।

ভ্রূ কুঞ্চিত হয় প্রিয়দর্শীর। গম্ভীর হয়ে বলে, এ কথা সত্যি?

প্যাটেল নিম্নকণ্ঠে বলে, আর সেই জন্যেই অধমের গরীবখানায় আর আপনার ঠাঁই হচ্ছে না। আপনি হোটেলে যেতে চাওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস

ফেলতে পারছি আমি। এ লাইনে যেদিন এসেছি, সেদিন থেকেই মনুষ্যত্বকে বিসর্জন দিয়ে এসেছি।

সে কথায় কান না দিয়ে প্রিয়দর্শী বলে, নিশিদা জানেন?

—না! আমি সাহস পাইনি সে কথা জানাতে।

—আমি যদি জানাই?

—তাহলে আমার ক্ষতি হবে। নিশিদা ফ্রি-লান্সার। পাঁচটা প্রডিউসারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে ছবি পরিচালনা করেন। আর আমি দিভেচা প্রডাকসন্সের বেতনভুক কর্মচারী!

প্রিয়দর্শী একটু ইতস্তত করে বলে, নিজের জন্য বলছি না, ভুল বুঝবেন না আমাকে—কিন্তু জেনে শুনে এতবড় একটা অন্যায়কে প্রশ্রয় দিচ্ছেন আপনারা?

প্যাটেল ম্লান মুখে বলে, সেইটেই তো এ চাকরির ট্রাজেডি বাবুজি! এক একবার ভাবি সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ি, যেদিকে দুচোখ যায়। কিন্তু ভাবা সোজা, করা বড় কঠিন। নিশিদার মত লোকের হাতে যদি প্রচুর টাকা থাকত—

প্রিয়দর্শী হেসে বলে, তাহলে নিশিবাবুও ঐ দলে গিয়ে নাম লেখাতেন।

তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ জানায় সুরযভাই, আপনি নিশিদাকে চেনেন না, তাই একথাটা বলে ফেললেন। আমি ওঁকে দীর্ঘদিন ধরে জানি। ওঁর য়ুনিটের সবলোক ওঁকে দেবতার মত ভক্তি করে।

প্রিয়দর্শী এ উচ্ছ্বাসে বাধা দেয় না।

খাবার এসে গেল ঠিক তখনই।

এরপর আরও তিনটে দিন কেটে গেছে। প্যাটেলের বাসা ছেড়ে প্রিয়দর্শী উঠে এসেছিল একটা মেসে। নিম্ন মধ্যবিত্তের মেস। নানান জাতের মেহনতি মানুষ থাকে সেখানে। পুঁজিটাও ফুরিয়ে এসেছে। কোথায় যাবে কি করবে স্থির করে উঠতে পারছে না। একেবারে যদি বাঁধনছেঁড়া হত তাহলে যেদিকে দুচোখ-যায় বলে বেরিয়ে পড়তে পারত অনির্দিষ্টের উদ্দেশ্যে; কিন্তু নূতন গ্রন্থিও যে পড়তে শুরু করেছে ওর জীবনে।

দিনান্তে জুহুবীচে শ্রবণার সঙ্গে দেখা হয়। প্রথম দিনের আড়ষ্টতা দুপক্ষই কাটিয়ে উঠেছে ক্রমে। দুজনের কথাই দুজনে শুনেছে। অবাক হয়ে গেছে দুজনেই। কোথায় যেন যোগসূত্র আছে ওদের জীবনে। প্রিয়দর্শী জানে না তার বংশ পরিচয়, শ্রবণারও প্রায় তাই। প্রিয়দর্শীর কোন বন্ধন

নেহ, শ্রবণার আছে—শাহজাহান ; যাদও সেহ বন্ধনটাকে ছিন্ন করতে পারলেই সে যেন স্বস্তি পায়! প্রিয়দর্শী ধীরে ধীরে পেশ করেছে তার জীবনেতিহাস—রাঁচির জীবন, সদারঙ্গনী-সাহেবের পরিচয়, মায়ের হারিয়ে যাওয়া ছবির কথা। বলেছে, তার মানসিক বিকলতার কথা—যে কোন সময়ে তার পুনরাক্রমণের আশঙ্কার কথাটাও। শ্রবণা প্রশ্ন করেছিল, ডাক্তার সাহেব আপনার পরিচয় তাহলে জানেন ?

—বোধহয় জানেন, আমাকে বলেননি। আমাকে বারণ করেছেন কখনও যেন তাঁকে চিঠি না লিখি, কখনও যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে না যাই।

—ডাক্তারসাহেব বোধহয় চেয়েছিলেন, আপনি যেন আপনার জীবনের ঐ অংশটা ভুলে যান। যে আঘাত থেকে আপনার স্মৃতিবিভ্রম হয়েছিল কোনসূত্রেই যাতে সে আঘাতটা আবার আপনার মস্তিকে না লাগে তাই সুপরিকল্পিতভাবে আপনার জীবন থেকে সরে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন তিনি।

—তাই হবে হয়তো। সম্ভবতঃ তাঁর সঙ্গে জীবনে আমার দেখাই হবে না—

—সেটাও আপনার ভুল ধারণা। দেখা হবে, দেখা করা উচিত।

—তাঁর সুস্পষ্ট নিষেধ সত্ত্বেও ?

—হ্যাঁ, তা সত্ত্বেও। বিয়ে করে বউ নিয়ে তাঁকে প্রণাম করতে যাবেন। আপনি না জানলেও আপনার স্ত্রীর জানা উচিত কোন্ আঘাতে আপনার এভাবে স্মৃতিবিভ্রম ঘটেছিল—তাহলেই দ্বিতীয়বার যাতে এ দুর্ঘটনা না ঘটতে পারে সে সম্বন্ধে সচেতন থাকা যাবে।

প্রিয়দর্শী হেসে বলে, যুক্তির দিক থেকে আপনি ঠিকই বলছেন—কিন্তু পাগল হয়ে যাবার সম্ভাবনা যার রয়েছে এমন অজ্ঞাতকুলশীল মানুষকে বিয়েই বা করবে কোন মেয়ে, আর আমিই বা করব কোন আক্কেলে ?

শ্রবণা এ কথার জবাব খুঁজে পায়নি।

আবার শ্রবণাও নিজে থেকে শুনিয়েছে তার কাহিনী ; আগ্রাতে আউট-ডোর স্যুটিং হবে, সমস্ত য়ুনিট বোম্বাই থেকে আগ্রা গিয়েছিল। শ্রবণার সেখানে কোন ভূমিকা ছিল না। তবু ওর আগ্রহ দেখে ওকেও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাজমহল দেখাতে। সে কিন্তু য়ুনিটের সঙ্গে যায়নি। সে কথা শাহজাহানও জানে না। সে সোজা চলে গিয়েছিল ক'লকাতায়। সেখান থেকে আগ্রা।

বাধা দিয়ে প্রিয়দর্শী বলেছিল, ঠিক কথা, বোম্বাই থেকে আগ্রা যেতে

আপনি ইস্টার্ন রেলের কামরায় কেমন করে উঠলেন এ প্রশ্নটা তো আমার মনে জাগেনি, কলকাতা গিয়েছিলেন কেন? কোথায় ছিলেন?

শ্রবণা হেসে বলে, বিশ্বাস করবেন, যদি বলি পথে পথে? একত্রিশে অক্টোবর বোম্বাই থেকে রওনা হবার কথা। সবাই ট্রেনে চাপল সেণ্ট্রাল স্টেশনে—আমি সবাইকে লুকিয়ে পালিয়ে গেলাম ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে। ক্যালকাটা মেল ধরে ক'লকাতা পৌঁছাই দোশরা নভেম্বর। এ বছর সেদিন ছিল জগদ্ধাত্রীপূজা। হাওড়া স্টেশন থেকে লোকাল ট্রেন ধরে চলে গেলাম চন্দননগর। তারপর কি করে যে পৈত্রিক বাড়িটা খুঁজে পেলাম সে এক রোমাঞ্চকর কাহিনী।

সে কথা সত্যি। দু-দিন লম্বা ট্রেনজার্নি করে অস্নাত অভুক্ত একটি তরুণী সুটকেশ আর বিছানা নিয়ে এসে নামল চন্দননগর স্টেশনে। রায়বাড়িতে জগদ্ধাত্রীপূজা হচ্ছে, সেখানে সে যেতে চায়। রায়বাড়ি? কোন রায়বাড়ি? পঞ্চানন তলায় বীরেশ রায়ের বাড়ি, না রেলপারের গোবিন্দ রায়ের বাড়ি? নাকি মন্‌সাতলায় জগদানন্দ রায়ের বাড়ি? ভাঙা-ভাঙা-বাঙলা-বল্‌তে-পারা একটি সুন্দরী তরুণীকে সাহায্য করতে অনেকেই এগিয়ে আসে। বোকা বন্‌লে চলবে না, শ্রবণা দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বললে, মন্‌সাতলায় জগদানন্দ বাবুর বাড়ি।

রিক্‌শা-ওয়ালাকে যথোচিত নির্দেশ দিয়ে বিদায় নিল উৎসাহী যুবকের দল। রিক্‌শা এসে থামে পুজোতলায়। মালপত্র নিয়ে একটি মহিলাকে রিক্‌শা চেপে আসতে দেখে মাজায়-গামছা একজন যুবক এগিয়ে আসে, কাকে খুঁজছেন আপনি?

—এটা কি জগদানন্দ রায় মহাশয়ের বাড়ি?

—হ্যাঁ, কিন্তু আপনাকে তো ঠিক—

—এখানে আজ জগদ্ধাত্রীপূজা হচ্ছে?

—তা হচ্ছে। আপনি কোথা থেকে আসছেন?

কোনক্রমে ঢোক গিলে শ্রবণা বলে, আচ্ছা এ বাড়িতে হিমাদ্রী রায় বলে কেউ কি কখনও থাকতেন?

—হিমাদ্রী রায়?—চিন্তা করে যুবকটি।

—হ্যাঁ, হিমাদ্রী রায়। অনেক অনেক দিন আগে, ধরুন পঁচিশ বছর আগে তিনি চন্দননগর ছেড়ে বোম্বাই চলে যান—

ছেলেটি জবাব দেয় না। আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে দেখতে থাকে

শ্রবণাকে। কত রকম ঠগ-জোচ্চোরের কথাই তো শোনা যায় আজকাল। এরপর এগিয়ে আসেন একজন বৃদ্ধ। আপ্যায়ন করে বলেন, পথের মাঝে দাঁড়িয়ে কেন মা? ওরে কে আছিস? ওঁর বাক্স বিছানাটা—

বাধা দিয়ে শ্রবণা বলে, একটু সবুর করুন। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, ঠিক জায়গায় এসেছি কিনা। আমি রায়বাড়ির খোঁজ করছি, যেখানে জগদ্ধাত্রী পূজা হয়, যে বাড়ি থেকে পঁচিশ বছর আগে হিমাদ্রী রায় বলে একজন নিরুদ্দেশ হয়ে যান—

বৃদ্ধ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার ওকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলেন, হিমাদ্রী আপনার কে হয়?

শ্রবণা যেন অকূলে কূল পায়, বলে, আপনি হিমাদ্রী রায়কে চেনেন?

—চিনি। কিন্তু সে তো এ বাড়ি নয় মা! কোথা থেকে আসছ তুমি?

শ্রবণা কি বলবে ভেবে পায় না। তার পূর্বেই যুবকটি বলে, হিমাদ্রী রায় কে মেজকাকা?

—তুই চিনবি না। হিমু রায় হচ্ছে ৺জ্যোতির্ময় কাকার মেজ ছেলে। তোর জন্মের আগেই সে মোছলমান হয়ে যায়। শ্রবণার দিকে ফিরে আবার পেশ করেন তাঁর পূর্বপ্রশ্ন, হিমু রায় তোমার কে হন বললে না তো?

কোনক্রমে সে প্রশ্ন এড়িয়ে শ্রবণা বলে, জ্যোতির্ময় রায়ের বাড়ি কি রেলপারে?

বৃদ্ধ এবার কঠিন হয়ে বলেন, সে কথা তো বলব না আমি। ওরা আমাদের সড়িক—বনিবনাও নেই, একথা ঠিক। কিন্তু আজকের এই জগদ্ধাত্রী পূজার দিনে হিমু রায়ের নাম করে কেউ যদি সে বাড়ির খোঁজ করে তবে তার পুরো পরিচয় না পেয়ে তো আমি কিছু বলতে পারব না মা!

রেল ভ্রমণের ক্লান্তিতে এমনিতেই আধমরা হয়ে পড়েছিল শ্রবণা। এ কথায় জ্বলে উঠল, বেশ বলবেন না। যেটুকু বলেছেন তার জন্যই আপনাকে ধন্যবাদ। রিকশা-ওয়ালাকে বলে, গাড়ি ঘোরাও, রেলপারের গোবিন্দ রায়ের বাড়ি চল।

স্তম্ভিত বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে থাকেন অবাক দৃষ্টি মেলে।

বাস্তভিটা শেষ পর্যন্ত শ্রবণা খুঁজে বার করেছিল! অস্নাত অভুক্ত সমস্তদিন চন্দন নগর শহরটা চষে ফেলে অবশেষে এসে হাজির হয় পঞ্চাননতলায় বীরেশ রায়ের বাড়িতে। অনতিদূরে একটি মিষ্টির দোকানে বাক্স আর বিছানা জমা রেখে পায়ে হেঁটেই সে গিয়েছিল বীরেশ রায়ের বাড়ি। ইতিমধ্যে সে জানতে পেরেছে বীরেশ রায় হচ্ছেন ৺জ্যোতির্ময় রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র, অর্থাৎ ওর ছোট কাকা।

বেলা পড়ে এসেছে এতক্ষণে। দলে দলে নারী পুরুষ ঠাকুর দেখতে আসছে। শ্রবণাকে কেউ খেয়ালই করে না। এমন রবাহূত তো কতই আসে ঠাকুর দেখতে। শ্রবণা অবাক হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল চারিধার। প্রকাণ্ড চক মেলানো সাবেক বাড়ি। চুনবালির পলেস্তারা খসে খসে পড়েছে। কার্নিসের খাঁজে অশ্বত্থের চারা জন্মেছে নিরুপদ্রবে। মারাত্মক ভাবে ঝুলছে জল-নিকাশী একটা লোহার পাইপ। সামনেই ভারি পাল্লার সদর-দরজা। সেটা পার হলেই পূজা-দালান। গোল গোল মোটা মোটা থাম। ইট বার করা। তার কার্নিসে পারাবতের কলগুঞ্জন। ওপাশে চওড়া একটা বারান্দা। তাতে পুরাতন আমলের তৈলচিত্র। কে জানে ওরা কারা। নিঃসন্দেহে ওরা শ্রবণার পূর্ব-পুরুষ। পুজামণ্ডপে লালপাড় গরদের শাড়ি পরা মহিলার দল হাতে হাতে পূজার জোগাড় দিচ্ছেন। ছোট ছোট ছেলে মেয়ের দল লুকোচুরি খেলছে থামের আড়ালে। সর, সর, সরে যাও, বলতে বলতে একজন লোক ছুটে এল ভিতরবাড়ি থেকে। তার পিছনে বড় পিতলের হাঁড়িতে করে ভোগ নিয়ে আসছে আর একজন, তার নাক মুখ আবার গামছা দিয়ে বাঁধা। শ্রবণা সরে দাঁড়ায়। চুপটি করে দেখতে থাকে কাণ্ড কারখানা।

বুক ফেটে কান্না আসে তার। কেন সে এল এখানে? কেন মরতে এল? এখানে তো তার জন্য কোন স্থান নেই। এখানে কেউ তাকে চিনবে না, চিনলেও স্বীকার করবে না। এ কী সর্বগ্রাসী কৌতূহল? ভারতবর্ষের একপ্রান্ত থেকে একেবারে অপর প্রান্তে কেন, কী জন্য, কিসের প্রত্যাশায় সে ছুটে এসেছে এমন বদ্ধ উন্মাদের মত। এমনি করে ভিখারিনীর মত, অন্তেবাসী অচ্ছুতের মত থামের আড়ালে একটি বেলা ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে? সম্বিত ফিরে পায় কার কণ্ঠস্বরে। তাকিয়ে দেখে, ওর চেয়ে অল্প ছোট একটি কুমারী মেয়ে শালপাতার ঠোঙায় প্রসাদ এনে ধরেছে ওর সামনে, নিন, প্রসাদ নিন।

শ্রবণা যেন ইনফ্লুয়েঞ্জার রুগী। ক্ষীণস্বরে বললে—তোমার নাম কি ভাই?

—অঞ্জলি।

—বীরেশবাবু কে হন তোমার!

—আমার বাবা। আপনি?

শ্রবণা বলে—ঠাকুর দেখতে এসেছি।

—ও!

খোসগল্প করার সময় নেই অঞ্জলির! তার কত কাজ। সে একাজের

ছোট কর্তার মেয়ে। ঠাকুর দেখতে-আসা উটকো লোকের জন্য একটি মুহূর্তের বেশী ব্যয় করবার মত সময় সত্যিই ছিল না ওর হাতে। অঞ্জলি চলে যাবার পর শালপাতার ঠোঙাটি শ্রবণা মাথায় ঠেকায়। সমস্ত দিন উপবাসের পর শশা-কলা আর নারকেলের কুচির স্বাদ অমৃতের মত মনে হল ওর।

৺মায়ের প্রসাদ যে!

আবার চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা। কতক্ষণ এভাবে কেটে গেছে খেয়াল নেই। ইতিমধ্যে বাতি জ্বলে উঠেছে পূজামণ্ডপে। নবমীপূজা সমাপ্ত হয়েছে, শেষ হয়েছে সন্ধ্যারতি। কত লোক এল ঠাকুর দেখতে, প্রণাম করে চলে গেল, শ্রবণা জানেও না। আবার সে চমকে ওঠে অঞ্জলির কণ্ঠস্বরে, আপনাকে ঠাকুমা ডাকছেন।

চমকে ওঠে শ্রবণা, আমাকে? ঠিক জান তো তুমি?

—হ্যাঁ, ঐ তো দাঁড়িয়ে আছেন উনি।

এতক্ষণে নজর পড়ে, পূজামণ্ডপের শেষপ্রান্তে বারান্দায় ঐ অন্ধকার কোণটায় দাঁড়িয়ে আছেন একজন অশীতিপরা বৃদ্ধা। পরনে তাঁর সাদা থানের তসর একখানা কপালের উপর হাত দিয়ে আলো আড়াল করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি দেখছিলেন শ্রবণাকে। পায় পায়ে শ্রবণা এগিয়ে আসে —চুপটি করে দাঁড়ায় ওঁর সামনে।

—কি নাম তোমার?—কাঁপা কাঁপা গলায় প্রশ্ন করেন বৃদ্ধা।

—শ্রবণা রায়।

—রায়! কোথা থেকে আসছ তুমি?

শ্রবণা জবাব দেয় না। এঁর সম্মুখে এই পূজাতলায় দাঁড়িয়ে কিছুতেই মিথ্যা কথাটা বলতে পারল না। ও চিনতে পেরেছে তাঁকে। উনি ওর ঠাকুরমা, ৺জ্যোতির্ময় রায়ের বিধবা, হিমাদ্রী রায়ের মা। বুকটা দুরু দুরু করে ওঠে শ্রবণার। ইচ্ছে করে ওঁর পায়ে লুটিয়ে পড়তে।

—তুমি আমার সঙ্গে এস তো বাছা। তুই যা।

শেষ নির্দেশটা অঞ্জলিকে। আতঙ্কতাড়িত দৃষ্টিতে শ্রবণাকে একবার দেখে গিয়ে অঞ্জলি চলে যায় ওদিকে। বৃদ্ধার পিছু পিছু শ্রবণা এগিয়ে আসে বারান্দা পার হয়ে একটা ছোট চোরা কুঠুরিতে। এটা তাঁর ঘর। সিঁড়ি ভাঙতে পারেন না বলে দ্বিতলে বাস করেন না। নিত্য দুবেলা তাঁকে যে ঠাকুর দালানে আসতে হয়। সারা বাড়িতে বিজলি বাতি; কিন্তু ঐ ছোট্ট ঘরখানিতে জ্বলছে তেলের প্রদীপ। ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধার কাছে আলো-আঁধার দুইই

সমান। হাতড়ে হাতড়ে ভাঙা দেহখানাকে বয়ে বেড়ান তিনি। তোমরা যাঁরা ওঁর ঘরে যাবে দু-দণ্ডের জন্য সেই তোমাদের জন্যই ঐ প্রদীপের আয়োজন। তাছাড়া সাঁঝের বেলায় ঘরে বাতি জ্বালতে হয়, আলো নজরে আসে বা না আসে। বৃদ্ধা ঘরে ঢুকে পিছন ফিরে দরজায় খিল দিলেন। তারপর শ্রবণার মুখোমুখী হয়ে দাঁড়ালেন। মাজায় হাত দিয়ে ন্যুব্জ পৃষ্ঠদেশকে সোজা করে খাড়া হয়ে দাঁড়াবার একটা ব্যর্থ প্রয়াস করলেন। পুরো একটি মিনিট দুজনে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে আছে, কারও মুখে কথা নেই, তারপর যেন অনেক দূর থেকে প্রতিটি কথা পরিষ্কার উচ্চারণ করে বৃদ্ধা বললেন, হিঁদু হস্ আর মোছলমান হস্, সাকুরবাড়ি এসে আমার সামনে মিছে কথা বল্‌বি না খবরদার! তুই হিমুর মেয়ে।

সমস্ত দেহের রোমকূপ খাড়া হয়ে উঠল শ্রবণার। থর থর করে কেঁপে উঠল সে। পরমুহূর্তেই বৃদ্ধার পায়ের কাছে উবুড় হয়ে পড়ে। বসে পড়লেন বৃদ্ধাও—পড়েই গেলেন তিনি। তারপর ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেন অশীতিপর বৃদ্ধা। শতাব্দীর একপাদ ধরে যত অশ্রু জমেছিল সেই নিরুদ্ধ অশ্রুর বন্যায় তিনি ভেসে গেলেন, ভাসিয়ে দিলেন শ্রবণাকে। কত যুগ যুগান্ত পার হয়ে গেল যেন। নীরব অশ্রুর স্রোতে দুই যুগের দুটি নারী একাত্ম হয়ে উঠলেন বিনা সম্ভাষণে। অনেকক্ষণ পর মুখ মুছে শ্রবণা বললে, রেলের কাপড়ে তোমাকে ছুঁয়ে ফেলেছি ঠাকুমা, না হলে এই অবেলায় তোমার স্নান করার আর কোন প্রয়োজন ছিল না।

কাঁধ ধরে ওকে খাড়া করে দিয়ে বৃদ্ধা বলেন, হিমু জাত দেয়নি, একথা বলতে চাস?

—হ্যাঁ, তাই বলতে চাই! কে বলেছে তোমাদের তিনি মুসলমান হয়ে গেছেন? পৈতে তাঁর গলায় নেই বটে, কিন্তু অখাদ্য মাংসও তিনি খান্ না—ঠাকুর দেবতাকে প্রণাম করতেও দেখেছি তাঁকে!

—কিন্তু ওরা যে বলে, তার নাকি নাম হয়েছে—

—তুমি কি তোমার পাগল ছেলেকে চেন না ঠাকুমা? তোমার উপর অভিমান করেই সে আজ শাহজাহান সেজেছে!

আবার ওকে বুকে টেনে নেন বৃদ্ধা, বলেন, কেমন করে খুঁজে পেলি দিদি?

শ্রবণা কি জবাব দেবে?

হঠাৎ কি এক অজানা আশঙ্কায় শিউরে ওঠেন উনি। ওঁর হাড়-পাঁজরা বের করা বুকে মুখ দিয়ে পড়েছিল শ্রবণা, সেও চমকে ওঠে; কী হল?

—হিমুর কি···হিমু কি—?

—না, না তিনি ভালই আছেন। বোম্বাইয়ে আছেন—তিনি অবশ্য জানেন না যে, আমি লুকিয়ে তোমার কাছে চলে এসেছি। তা, হ্যাঁ ঠাকমা তুমি আমাকে দেখেই কেমন করে চিনতে পারলে?

বৃদ্ধা চোখের জল মুছে বলেন, তা বাপু সত্যি, পথে ঘাটে দেখলে চিনতে পারতুম না—এই আমার হিমুর মেয়ে। দুপুর বেলাতেই ছোট তরফের মনি-ঠাকুরপো যখন এসে বললে, কে একটি মেয়ে এসে হিমু রায়ের বাড়ি খুঁজছে; আর কারও নাম বলতে পারছে না, তখনই ছাঁৎ করে উঠেছে বুকের মধ্যে। তারপর অঞ্জু এসে যেই বলল—ঠাকমা একটি মেয়ে তিনঘণ্টা ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠাকুর দেখছে, আর কাঁদছে, তখনই বুঝলুম এ আমার বুক জুড়ানো ধন। হিমুর যে মেয়ে হয়েছে তাই কি ছাই আমি জানি? আমি যেন শুনেছিলুম ওর একটি ছেলেই হয়েছে—

—ছেলে? আমার দাদা? ঠিক জান তুমি?

—ও মা! তোর দাদা নেই? ক'ভাইবোন তোরা?

—আমি একা—

—আর তোর মা? মমতা?

—আমার মার নাম যে মমতা তা তোমার কাছে এই মাত্র জানলাম। তাঁকে জ্ঞানে দেখিনি আমি—

—তাহলে হাড় জুড়িয়েছে আবাগীর!

শ্রবণা ঘনিয়ে এসে বলে, বাপি কেন তোমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল ঠাকমা?

বৃদ্ধা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলেন, থাকনা দিদি সেসব কথা—

—না, আমাকে বল। আমি জানতে চাই, কার পাপে এমন সোনার সংসারে আমি জন্মাতে পারিনি!

বৃদ্ধার চোখদুটি জ্বলে ওঠে, বলেন, ঐ মমতা! তোর মা মাগী। ও হ'ল গিয়ে আমার বোন কুসুমের মেয়ে। হিমুর মাসতুত বোন।

—আপন মাসতুত বোন?—আর্তকণ্ঠে বলে শ্রবণা।

—না ঠিক আপন নয়, কুসুম আমার সতাতো বোন। আমার বাপের ছিল দুই বিয়ে। তাহলেও ওর মাসতুত বোন তো। ধর্ম সইবে কেন? দুটিতে কেমন করে জানি ভাব হয়েছিল—তারপর, যাকগে সেসব ছেঁড়া কথা—

ঠিক সেই মুহূর্তেই বাইরে থেকে করাঘাত হ'ল দ্বারে। শ্রবণা উঠে

দাঁড়ায়। বৃদ্ধা সামলে নেন নিজেকে। ধীরে ধীরে উন্মোচন করে দেন দ্বার। ও পাশে দাঁড়িয়ে আছেন একজন মাঝ বয়সী ভদ্রলোক। উপবীতটা দেখা যাচ্ছে। গায়ে তাঁর একখানা মটকার চাদর।

—মা! এ কী পাগলামি শুরু করেছ তুমি?

বৃদ্ধা কঠিন হয়ে প্রতিপ্রশ্ন করেন, পাগলামি তুই কোথায় দেখলি ছোট খোকা?

—পাগলামি নয়? কাজের বাড়ি, জ্ঞাতগুষ্টিরা আসছেন, তোমার খোঁজ করছেন—আর তুমি এখানে দোর বন্ধ করে—

—এ কে জানিস?—প্রশ্ন করেন বীরেশ রায়ের মা।

—জানি। মনি কাকা দুপুরবেলা যখন উপযাজক হয়ে এসে সর্বনাশের কথাটা বলে গেলেন তখন থেকেই জানি, এমনি একটা অঘটন ঘটবে আজ।

অঘটন কিসের? ও বলছে হিমু জাত দেয়নি।

ধমকে ওঠেন বীরেশ রায়, চুপ কর মা। তা যদি হত তবে তোমার মেজছেলে এসে নিজে মুখে সেকথা বলে যেত। তাকে যে দেখে এসেছে আমাদের কাখাল। একমুখ দাড়ি, মাথায় ফেজ টুপি, যাকে শুধায়, সেই বলে ওর নাম শাহজাহান।

শ্রবণা এতক্ষণে প্রথম কথা বলে, আপনারা ভুল শুনেছেন, ছোটকাকা।

—চুপ কর! কে তোমার কাকা?—ধমকে ওঠেন বীরেশ রায়: শোন বাছা, এ বাড়িতে তোমার ঠাই হবে না। এখনও কাকপক্ষী জানে না, তুমি ভালয় ভালয় বিদায় হও। আর তুমিও স্নান করে এস মা।

বৃদ্ধা চিৎকার করে কি একটা কথা বলতে যান। বীরেশ রায় সবলে চেপে ধরেন মায়ের মুখ, বলেন, অঞ্জলি-মঞ্জরীর বিয়ে আমাকে দিতে হবে মা। এতদিনে সবাই সে সব কেলেঙ্কারির কথা ভুলে গেছে। খুঁচিয়ে ঘা তুমি কর না বলে দিচ্ছি। এতবড় সর্বনাশ আমার করো না। ঠাকুর বিসর্জনের আগেই আমি আত্মঘাতী হব তাহলে।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে এতক্ষণ শুনছিল শ্রবণা। অপ্রাণ চেষ্টায় চোখের জল ঠেকিয়ে রেখেছিল। এবার বললে, উনি ঠিকই বলছেন ঠাকুমা। অঞ্জলি-মঞ্জরীর সর্বনাশ করতে আমি আসিনি। আমি এসেছিলাম আমার পৈত্রিক বাড়িখানা দেখতে। তোমাকে প্রণাম করতে। আমার সাধ মিটেছে। ছোটকাকা, কথা দিচ্ছি আর কোনদিন ফিরে আসব না আমি— শুধু যাবার বেলায় পায়ের ধুলোটা নিতে দাও।

নিচু হয়ে বৃদ্ধা এবং বীরেশ রায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকালো। তারপর কোন দিকে না তাকিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। সে জানতেও পারল না বীরেশ রায়ের বাহুবন্ধে মূর্ছিতা হয়ে পড়ে রইলেন জ্যোতির্ময় রায়ের বিধবা,—হিমাদ্রী রায়ের মা!

কাহিনী শেষ করার পর প্রিয়দর্শী বলেছিল, তুমি আমার চেয়েও হতভাগা। আমি কী পাইনি তার হিসাবও পাইনি, কিন্তু তুমি জান, তুমি কি হারিয়েছ।

ম্লান হেসেছিল শ্রবণা।

সেদিনটা কেটেছিল নিরানন্দ কথার আলাপনে। দুঃখের ধারা স্নানে-স্নান করেছিল একত্রে। এর দুঃখ, ওর দুঃখ। বেদনা ভাগ করে নেবার যে আনন্দ সেই আনন্দটুকুই এ দিনের আলাপনে লাভের অঙ্ক।

কিন্তু তার পরের দিনটা?

সেদিনটা ছিল অনাবিল আনন্দের। বাঁধন ছেঁড়া মুক্তির দিন।

সেদিনটায় শ্রবণার স্যুটিং ছিল না। ছুটির দিন। আর প্রিয়দর্শী তো বেকার মানুষ। শাহজাহানকে শ্রবণা জানতে দেয়নি যে তার সেদিন স্যুটিং নেই; প্রতিদিনের মত সকালবেলা বের হয়ে পড়েছিল বাড়ি থেকে। শাহজাহান একবার প্রশ্ন করেছিল, আজ যে তোর গাড়ি এল না বড়? প্রতিদিন পিক্-আপ ভ্যান এসে ওকে তুলে নিয়ে যায়। শ্রবণা সোজা মিথ্যা কথা বললে, গাড়িটা গণ্ডগোল করছে। ড্রাইভার কালকেই বলে রেখেছিল, আজ গাড়ি সারাতে দেবে। তুমি ভেব না, বাসেই চলে যাব আমি।

শাহজাহান আগ বাড়িয়ে বলেছিল, তোকে পৌঁছে দিয়ে আসব?

—কী দরকার? রাস্তা তো আমি জেনেই গেছি।

শাহজাহান আর আপত্তি করেনি।

শ্রবণা চলে এসেছিল মেরিন-ড্রাইভের নির্দিষ্ট ল্যাম্পপোস্টের কাছে নির্ধারিত সময়ে। দুজনে বেরিয়ে পড়েছিল তারপর এলোমেলো যাত্রায়। এ-বাস থেকে সে-বাসে, শহরের এ-প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়ে ইণ্ডিয়া-গেটের সামনে। শ্রবণা বলে, এলিফেণ্টা দেখেছেন?

—এলিফেণ্টা কেভ? না, সে তো বোম্বাই থেকে যেতে হয়, তাই না?

ছোট মেয়ের মত লাফিয়ে ওঠে শ্রবণা, চলুন, আজ এলিফেণ্টা দেখিয়ে আনি আপনাকে।

ইণ্ডিয়া গেট থেকে টিকিট কেটে দুজনে চলল এলিফেণ্টা গুহা দেখতে। সমুদ্রের মাঝখানে ছোট্ট দ্বীপ। সকালে স্টিমার ছাড়ে, ফিরে আসে সন্ধ্যায়।

ছুটির দিনে বোম্বাইয়ের মানুষ দল বেঁধে ছোটে এলিফেণ্টা দেখতে। আজ ছুটির দিন নয়, তবু বেশ ভিড় হয়েছে ষ্টিমারে। নানাজাতের, নানা দেশের মানুষ চলেছে একটি দিন খেয়াল-খুশিতে কাটিয়ে দিতে। সমুদ্রের হাওয়ায় দিনটাকে ভাসিয়ে দিতে। ষ্টিমারে উঠেই প্রিয়দর্শীর নজরে পড়ে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক আর তাঁর সঙ্গের ভদ্রমহিলার উপর। না পড়ে উপায় নেই। এতগুলি যাত্রীর মধ্যে তাঁরাই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। ভদ্রলোকের ষাটের কাছাকাছি বয়স। নিঃসন্দেহে বাঙালী। গায়ে সার্জের পাঞ্জাবি, মুক্তোর বোতাম বসানো। কাঁধে দামী একখানা কাশ্মীরী শাল, হাতের চারটে আঙুলে চার আংটি। পবনের ধুতিটা কিন্তু মাপে ছোট, কালো চওড়া পাড় এবং পায়ে ফিতে বাঁধা বুটজুতো। ভদ্রমহিলার বয়স অনেক কম, পঁচিশ ত্রিশের কাছাকাছি, পরিধানে মুর্শিদাবাদী সিল্ক, গাঢ় হলুদ রঙের, এক-গা গহনা। মনে হয় বেশী-দিন বিয়ে হয়নি। মস্ত ঘোমটা দিয়েছেন মাথায়। প্রিয়দর্শী শ্রবণার কানে কানে বলে, ওই ভদ্রমহিলা এ বৃদ্ধের পুত্রবধূ বোধহয়, কত বড় ঘোমটা দিয়েছে দেখেছ? কিন্তু তাহলে ছেলেকেও নিয়ে আসেননি কেন?

শ্রবণা মুখে রুমাল চাপা দিয়ে খিলখিলিয়ে ওঠে।

—এই, অত হাসছ কেন?—চাপা গলায় প্রশ্ন করে প্রিয়।

হাসির দমক সামলে শ্রবণা কৈফিয়ৎ দেয়, ছেলেকে কেন সঙ্গে আনেননি জানেন? ছেলে এখনও জন্মায়নি।

—তার মানে? ও ভদ্রমহিলা এঁর পুত্রবধূ নয়, বলতে চাইছ? মেয়ে? দূর! তাহলে কখনও অতবড় ঘোমটা দেয়?

—ছাই বুঝেছেন আপনি। ভদ্রমহিলা ওঁর তৃতীয় কিংবা চতুর্থ পক্ষের ধর্মপত্নী।

—স্ত্রী?—আকাশ থেকে পড়ে প্রিয়দর্শী,—কেমন করে বুঝলে?

—শুনুন না ওদের কথা। ভারি মজার ব্যাপার।

কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই প্রীতিপদ লাগছিল না প্রিয়দর্শীর, পরের কথা শোনা। তবু উপায় নেই। ওঁরা এত উচ্চকণ্ঠে দাম্পত্য আলাপ চালাচ্ছেন যে, কানখাড়া না করলেও শোনা যাচ্ছে সে কথা! বৃদ্ধ বলছিলেন, ওরা কি-বলে-ভাল, বাঙলা বোঝে না তাই বক্ষে, না হলি এই বিদেশ বিভুঁইয়ে শেষে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড করি ছাড়ত।

ভদ্রমহিলা ঘোমটার ফাঁক দিয়ে বৃদ্ধের দিকে একনজর দোখ নিয়ে বলেন, তা অত রক্তারক্তির ভয় থাকলি বিদেশ বিভুঁয়ে ছেলে ছোকরার পারা বউ নে

বেড়াতে আসার সখ কেনে? গোলাপটির আড়ৎ আঁকড়ি পড়ি থাকলিই হত! অসৈরণ কথাটা আমি কি বলনু যে অমন চোখ পাকাইতিছ?

—না না, চোখ পাকাতি যাব কেনে? চোখ পাকানির কথা লয়। কথা হতিছে অরা ভিনজাতের মনুষ্য। অদের ব্যাভারটাই ভেন্ন-রকম—অদের দিকে নজর ছাওয়া কেনে রে বাপু। তার্থিকে সমুদ্দর দেখনা কেনে?

—আমি তো সমুদ্দরই দেখতেছি; তুমিই তো ত্যাখন থিকে প্যাট প্যাট করি দেখতিছ ঐ মাগীকে!

—আহ্! ছোটবউ। কী ত্যাখন থিকে মাগী মাগী করতিছ! ভদ্দর মহিলাকে—

ঘোমটাখানা দু-আঙুলে একটু ফাঁক করে ধরে ছোটবউ তেড়ে ওঠে। তার প্রাকৃত-ভাষায় কয়েক মিনিট ধরে যে বসান-তুবড়ির ফুলঝুরি ফাটলো তার সংক্ষিপ্তসার ছাপার অক্ষরে এই রকম, ওরে আমার ভদ্রমহিলা রে! ভদ্রমহিলা আমি চিনি না? ছটকু ঠিকই বলেছিল দেখছি; বলে, দিদি, দ্বারকা থেকে সোজা ফিরে এস কলকাতায়। জামাইবাবুর পাল্লায় পড়ে আবার মরতে বোম্বাই চলে যেও না যেন! বোম্বাইয়ের পথে ঘাটে শুধু সিনেমা-স্টার! বেলেল্লাপনার চূড়ান্ত!

বৃদ্ধ চাপা ধমক দেন, আহ্! তোমায় ছোট্কু তো সবজান্তা! তুমি কি ভাবিছ অরা সিনেমা-ইস্টার? মোটেও লয়।

—নিশ্চয় ছিনেমা করে! দেখছনি কি বিতিকিচ্ছিরি পুরুষ মানুষের পারা পোষাক পরিছে!

শ্রবণা প্রিয়দর্শীর কানে কানে বলে, আপনার আমার কথাই হচ্ছে কিন্তু।

প্রিয় বলে, অনেকক্ষণ বুঝেছি। ভাগ্যে সালোয়ার পাঞ্জাবি পরে এসেছিলে আজ—তাই ওরা আমাদের বাঙালী বলে বুঝতে পারছে না।

বৃদ্ধ ততক্ষণে বলছেন, রও, দেখাই তোমারে! অগ্রসর হয়ে আসেন উনি। প্রিয়দর্শী না-দেখার ভঙ্গি করে দূর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থাকে। একবার গলা খাঁকারি দিয়ে বৃদ্ধ প্রিয়দর্শীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রিয় এদিকে ফিরতেই বলেন, আপ্ বুঝি বোম্বাইকা বাসিন্দা হায়?

প্রিয়দর্শী বলে, জি হাঁ, ম্যয় তো খুদ বোম্বাইকা রহ্নেবালা হুঁ, হ্যয় মেরা মিসেস্।

শ্রবণা রীতিমত গায়ে পড়া হয়ে বলে, নমস্তে জী! আপলোক কাঁহাসে আ-রেহে হেঁ? কলকাত্তাসে ক্যা?

হঠাৎ শ্রবণা যে গায়েপড়া হয়ে এমন পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলে বসতে পারে, এটা বৃদ্ধ বোধহয় আশঙ্কা করেননি। আমতা আমতা করে বলেন, হ্যাঁ। হামারা গোলাপটিমে আরৎ হায়। বোম্বাই বেড়ানো কো লিয়ে আয়া হায়। তারপর প্রিয়দর্শীর দিকে ফিরে বলেন, আপ্ স্টুডেণ্ট হায়, মালুম পড়তা হায়!

প্রিয়দর্শীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে শ্রবণা বলে, জী নহি, হম্ দোনো তো ফিল্ম-লাইন মে হৈঁ। বৈঠিয়ে না জী। জগাহ্ তো পড়া হুয়ো হ্যয় কাফি!

বেঞ্চিতে নিজের পাশে স্থান নির্দেশ করে শ্রবণা। ভদ্রলোক ফুঁ দিয়ে বেঞ্চিটা সাফা করে বসবার উপক্রম করতেই অন্তরীক্ষ থেকে যেন দৈববাণী হল: মরণ!

যেন মরণ-কামড় খেয়েছেন! চম্‌কে খাড়া হয়ে ওঠেন বৃদ্ধ। বলেন, না থাক্! ওধারসে হামার ইস্ত্রি, অর্থাৎ কিনা ঔরৎ একা একা বৈঠা হায় তো? হাম ওদিকে গিয়েই বৈঠি? কেমন?

জুতো মস্‌মসিয়ে বৃদ্ধ ফিরে যান নিজ কোটরে। প্রাণপণ শক্তিতে এরা হাসি চেপে থাকে।

এলিফেণ্টা দেখবে কি, 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা' দেখতেই ওদের দিন কাটে। শ্রবণা প্রিয়র কানে কানে বলে, আপনি গিয়ে বরং ভাবীজির সঙ্গে আলাপ জমান, আমি বুড়োকে সামলাচ্ছি।

প্রিয়দর্শীও ভারি মজা পায় এ খেলায়। বৃদ্ধ বোধকরি ধর্মপত্নীর কাছে প্রচণ্ড ধমক খেয়ে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। কেমন যেন একটা 'ডোণ্ট কেয়ার' ভাব জেগেছে তাঁর। বোধহয় স্ত্রৈণ বলে লোকে তাঁকে খেপায়। তাই বেপরোয়াভাবে আবার বিবর ছেড়ে বেরিয়ে আসেন শ্রবণার সঙ্গে আলাপ জমাতে। প্রিয়দর্শী এ সুযোগ ছাড়ে না—সেও পিছিয়ে এসে চোস্ত উর্দুতে ভাবীজির কুশল প্রার্থনা করে। ভদ্রমহিলা ঘোমটাখানা আরও আধহাত নামিয়ে দিয়ে পুনরুক্তি করেন, মরণ!

এবার ভবিৎগতি ফিরে আসতে হল বৃদ্ধকেই, হামার ইস্ত্রি হিন্দি বাৎ বলতে তো নয়ই এমন কি বুঝতে ভি পার্তা নেই!

—ক্যা আপসোস কি বাতে—বললে প্রিয়, শ্রবণার কাছে ফিরে আসতে আসতে।

ঘুরে ঘুরে সমস্ত মূর্তিগুলো দেখল ওরা দুজনে। বৃদ্ধ এবং তাঁর তরুণী ভার্যা এর পর থেকে দূর দূরেই রইলেন। এক ষ্টিমার লোক ছোটো দ্বীপে উড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল। ঘুরতে ঘুরতে ওরা এসে পড়ে একটা নির্জন অংশে।

প্রিয়দর্শী বলে, তুমি গান জান ?

—জানি না বলতাম, কিন্তু বলব না। আজ গানই শোনাব আপনাকে।

—এই নির্জন পরিবেশই বোধকরি তোমার গানের প্রেরণা।

—না! স্থানটা মোটেই নির্জন নয়। আর সেইজন্যই গাইব। আপনি নজর করেননি। বৃদ্ধ এই পাথরটার ওপাশে এসে থানা গেড়েছেন। উনি বোধকরি আমার প্রেমে পড়ে গেছেন। প্রেমের গানই গাইব আমি, তবে মনে রাখবেন, এ গান আমি ওঁনার জন্য গাইছি শুধু।

গান শোনাল শ্রবণা। গান শুরু করেই কিন্তু সে ভুলে গেল কাকে শোনাচ্ছে। আনন্দের দিনে মানুষে গান গায় কি কাউকে শোনাতে ? তার অন্তরের আনন্দমূর্ছনাই তো সুর হয়ে বেরিয়ে আসে কণ্ঠ দিয়ে। সূর্যাস্তের দিকে মুখ করে শ্রবণা আপন মনে বিভোর হয়ে গান গাইল—মিলনের গান নয়, বিরহের গান নয়—সুন্দরের গান, আনন্দের গান!

ফেরার পথে প্রিয়দর্শী বলে, তুমি এখনও আমাকে 'আপ' বলছ। বৃদ্ধ যেমন উৎকর্ণ হয়ে আছেন, তাতে অন্তত ষ্টিমারে ফেরার সময়টুকু আমাকে 'তোম্' কর।

শ্রবণা হেসে বলে, এ আর বেশী কথা কি ? এ তো অভিনয় মাত্র। আপনি জয়ন্তের রোল করলেও তো তাই বলতে হত। ইস্, কী দুর্ভাগ্য আপনার। ভয়েস টেস্টে যদি উৎরে যেতেন!

প্রিয়দর্শী হঠাৎ গম্ভীর হয়ে পড়ে। কেন যে সে কণ্ঠস্বরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি সে গূঢ় রহস্য এখনও প্রকাশ করেনি শ্রবণার কাছে। প্যাটেলের কাছে সে সত্যবদ্ধ! শ্রবণা লক্ষ্য করে ওর ভাবান্তর, হেসে বলে, কি হল ? ফেল হয়েছেন সে কথা মনে করিয়ে দিয়েছি বলে অমনি রাগ হয়ে গেল বাবুর ?

প্রিয়দর্শী সহজ হবার জন্য বলে, সেজন্য নয়, তুমি এখনও 'আপ' চালাচ্ছ তাই।

—বেশ তো আর না হয় তোমাকে 'আপ' করব না, শুধু ডাউনই করব।

ষ্টিমারে উঠে ওরা অনুভব করে স্বামী-স্ত্রীতে কথা বন্ধ হয়েছে। দুজনে দুদিকে মুখ করে বসে আছেন। উল্টো দিকে মুখ রেখেই স্ত্রী কি একটা কথা বললেন অস্ফুটে, ঠিকমত শোনা গেল না। অমনি বৃদ্ধ ওদিকে ফিরে বেশ জোর গলাতেই বলে ওঠেন, করিছি, বেশ করিছি। তা অত চেঁচাইছ কেনে ?

অমনি স্ত্রীও ঘুরে বসলেন। এবার তাঁর দাম্পত্য আলাপও শ্রুতিগোচর হল, আমি চেঁচাইছি না তুমি চেঁচাইছ ? তখন থিকে খালি ঐ ভেটকিমুখী

মাগীর পিছনে ঘুর্-ঘুর্ ঘুর্-ঘুর্ !

—আর তুমি যে ঐ ছুক্‌রার পানে ট্যারায়ে ট্যারায়ে দেখতিছিলে, ঘোমটার ফাঁক দে ?

—ঈমা গ ! কি মিথ্যুক গা তুমি ! আমি ঐ ড্যাক্‌রার পানে একবারও তাকাইছি ?

বৃদ্ধ চাপা কণ্ঠে বলেন, চুপ যাও কেনে ছোট বউ ! অরা বাঙলা বোঝে না, তাই রক্ষা। নইলে তোমার এই বাজখাঁই আওয়াজ সবই কানে যাচ্ছে অদের ! ড্যাক্‌রা, ভেট্‌কিমুখী—ইসব কী ইতরের ভাষা।

—কী ! তুমি আমারে ইতর বুললে ?

—চুপ যাও কেনে, ছোট বউ, হাত জোড় করতেছি। ক্ষ্যামা দাও ! ঘোমটার মধ্যে আর খ্যামটা নেচনি !

—কী ! তুমি আমারে নাচউলি বুললে !

প্রিয়দর্শী ঘুরে বৃদ্ধকে বলে, ভাবীজি ক্যা বোলতী ? এলিফেণ্টা বহুৎ আচ্ছা লগা ক্যা ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ বাবা ! বহুত আচ্ছা লাগা তাই বোল্‌তা।

কর্তা গিন্নি দুজনেই চুপ করে গেলেন।

শ্রবণা প্রিয়র দিকে ফিরে কণ্ঠে মধু ঢেলে বলে, দেখতো, ভাইসাব ভাবীজিকো কীৎনা প্যার করতে !

বৃদ্ধ দাঁতে দাঁত চেপে অস্ফুটে শুধু বলেন, গুষ্টির পিণ্ডি করতে !

ইণ্ডিয়া গেটে নেমে বৃদ্ধ বিদায় জানাতে এলেন। প্রিয় ততক্ষণে একটা ট্যাক্সিকে থামিয়েছে। উঠতে যাবে হঠাৎ পিছন থেকে বৃদ্ধ বলেন, একদিন কা আলাপ যদিও তবু আপলোক কা বাত হামলোকদের বহুৎ দিন ইয়াদ রয়েগা।

প্রিয়দর্শী একগাল হেসে বাঙলায় বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ ! এ ড্যাক্‌রা মিনসেও সহজে বৌ-ঠানকে ভুলতে পারবে না।

ভদ্রমহিলার মাথার ঘোমটাখানা খসে পড়ল। চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে তাঁর। আর বৃদ্ধ ভদ্রলোক কি প্রিয়দর্শীকে ডেন্টিস্ট বলে ভুল করলেন ? দাঁত তোলবার সময়েও তো মানুষে অত বড় হাঁ করে না !

শ্রবণা ততক্ষণে গাড়িতে উঠে বসেছে। মুখটা বার করে বলে, দাদুকে কড়া নজরে রাখবেন দিদিমা, ছোট্‌কু ঠিকই বলেছে—বোম্বাইয়ের পথে ঘাটে ছিনেমা-ইস্টার !

এক পাইপ এক্সস্টের ধোঁয়া ছেড়ে ট্যাক্সিটা মেরিন ড্রাইভ ধরে বেরিয়ে গেল উত্তর মুখে।

ইংরেজরা বলে, সকাল দেখেই বোঝা যায় দিনটা কেমন যাবে। আবার বলে, ব্যতিক্রমটাই নিয়ম! এই দিনটা তেমনি একটি ব্যতিক্রম। হাসি খুশি হৈ হুল্লোড়ের মধ্যে দিনটা কেটে গেলেও রাতটা সেভাবে উৎরালো না। জুহুবীচের কাছে শ্রবণাকে নামিয়ে দিয়ে প্রিয়দর্শী ফিরে আসে তার মেসে। রাত তখন নটা বেজে গেছে। ক্ষুধা-ছিল, কিন্তু খাওয়ার চেয়ে জামা জুতো খুলে কেলে টান হয়ে শুয়ে পড়তেই ইচ্ছা হল ওর। প্যাটেল-সাহেব এই মেসটার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল। তিন বিছানার কামরা। এত সস্তায় এ রকম আস্তানা বোম্বাই শহরে সহসা জোটানো বড় সহজ নয়। এ দিক থেকে প্রিয়দর্শীর ভাগ্যটা ভাল। তালা খুলে ঘরে ঢোকে, আলোটা জ্বালে। বিছানাটা আগোছালো হয়ে পড়ে আছে। তার উপর ছাড়া পায়জামা, ড্রয়িং বোর্ড, ঈজেল, সিনেমা-সাপ্তাহিক—কী নেই? সকালবেলা যেভাবে রেখে গিয়েছিল ঠিক সে ভাবেই পড়ে আছে। কেই বা হাত দেবে, গোছাবে? এখন আর ওসব সাফা করতে ইচ্ছে হয় না। জুতো জামা খুলে বসে পড়ে খাটে। আবার ওঠে। নজরে পড়ে টেবিলের উপর পড়ে রয়েছে এক কাপ চা আর খানকতক থিন-এ্যারারুট বিস্কুট। চা-টা সকালে এসেছিল—তখন বেড়াতে যাওয়ার আনন্দে চা খাওয়ার কথা মনে ছিল না। সারা দিন সেই অভুক্ত চায়ের কাপের উপরে জমেছে সর। একটা মরা মাছি ভাসছে তাতে। বিস্কুট দুটো হাতে তুলে নিয়ে দেখে নরম হয়ে গেছে। তা যাক। সে দুটোই খেয়ে নেয়। কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে নিয়ে নৈশ আহার সমাধা করে। ওর রুমমেট দু'জন এখনও আসেনি। প্রিয়দর্শীর মনে পড়ে যায়, ওরা সকালেই বলেছিল—নাইট শো দেখতে যাবে। তার মানে, তাদের ফিরতে সেই যার নাম রাত বারোটা।

হাত দিয়ে বিছানার খানিকটা অংশ সাফা করে নেয়। নাঃ, ঘুম পাচ্ছে! রাত সাড়ে দশটা। বারোটা পর্যন্ত জেগে থাকা কষ্টকর। তার চেয়ে দরজায় ছিটকিনি দিয়ে এক ঘুম ঘুমিয়ে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। সজাগ হয়ে ঘুমাবে—যাতে সিনেমা-ফেরত বন্ধুদের সাড়া পেলেই উঠে দোর খুলে দিতে পারে!

দরজাটা বন্ধ করে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ে অবশেষে।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছে কে জানে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল প্রিয়দর্শীর। দরজার

কে যেন কড়া নাড়ছে। ওরা এসে গেছে। ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে, দরজাটা খুলে দেয়।

অবাক কাণ্ড! চৌকাঠের ওপারে দাঁড়িয়ে আছে শ্রবণা! রাত নটায় তাকে যে বেশে জুহুবীচে নামিয়ে দিয়ে এসেছিলো ঠিক সেই বেশে—শুধু চুলগুলো একটু আগোছালো, চোখ মুখ বসে গেছে। প্রিয়দর্শী ঘরের আলোটা জ্বালেনি। করিডোরের তির্যক আলোর আবছা আভাসে চোখ মুখের এ পরিবর্তন অবশ্য প্রিয়দর্শীর নজরে পড়ে না।

ঘুম-ঘুম চোখে দুরন্ত বিস্ময়ের অভিব্যক্তি, প্রিয়দর্শী অস্ফুটে বলে, বৈশাখী!

একটি মাত্র সুইচের সঙ্কেতে যেমন নেমে আসে লকগেটের ডালা, দুর্বার জলস্রোত ছুটে এসে আছড়ে পড়ে বাঁধের বেড়া টপকিয়ে—ঠিক তেমনিভাবেই শ্রবণার অন্তরের নিরুদ্ধ উচ্ছ্বাস ভেঙে পড়ল ঐ একটি মাত্র অসতর্ক সম্বোধনে! ছুটে চলে আসে সে চৌকাঠের এপারে। আছড়ে পড়ে প্রিয়দর্শীর বুকে। দৃঢ় আলিঙ্গনে ওকে জড়িয়ে ধরে বললে, আমি সব ছেড়ে তোমার কাছে চলে এসেছি প্রিয়, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না, এ নরক-যন্ত্রণা থেকে আমাকে উদ্ধার কর তুমি।

তিনটি মাত্র বাক্য। কিন্তু ওতেই হাল্কা হয়ে গেল শ্রবণার বুকের বোঝা! যা বলার ছিল এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলেছে সে। এখন আর তার দায় নেই! মুখ ফুটে নির্লজ্জের মত কেমন করে নিজের মনের কথা বলতে পারবে এটাই ভাবতে ভাবতে আসছিল এতক্ষণ! কী বলবে, কেমন করে বলবে? আকর্ষণের তাগিদে নয় বিকর্ষণের তাড়নায় কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মত ছুটে বেরিয়ে এসেছিল সে। এ নরক-যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না তার। শাহজাহান যে তার রোজগারে মেয়ের গায়ে হাত পর্যন্ত তুলতে পারে এতটা জানা ছিল না শ্রবণার। শাহজাহান যে স্টুডিওতে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানবার চেষ্টা করবে এ আশঙ্কার কথা তার মনে হয়নি। রাগ নয়, অভিমান নয়, দুরন্ত ঘৃণায় ওর সমস্ত অন্তঃকরণটা অসার হয়ে গিয়েছিল। ট্যাক্সিটা যখন এই মেসবাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াল তখনও ওর পা চলতে চাইছিল না। আরও দু'জন অপরিচিত রুমমেটের সামনে এভাবে মধ্যরাত্রিতে একজন ব্যাচিলার মেসবাসীর সামনে এসে দাঁড়ানো যে কতদূর বিসদৃশ তা যেন হঠাৎ সে অনুভব করল দরজার ওপাশে এসে দাঁড়ানোর পর, কিন্তু তখন আর ফিরে যাবার পথ নেই। মরিয়া হয়ে সে কড়ায় হাত দিয়েছিল। এখন নির্জন অন্ধকার কক্ষে প্রিয়দর্শীর অসতর্ক সম্বোধনে সে যেন আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। যা বলার

ছিল এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলেছে। আর তার কোন দায় নেই—এখন ও যা ভাল বোঝে করুক।

কিন্তু এ কী? পুরো দু-মিনিট ওর বুকে মাথা গুঁজে পড়ে থেকে শ্রবণা অনুভব করে, কই প্রিয়দর্শীর তরফে তো কোন সাড়া নেই। সে তো ওদিক থেকে আলিঙ্গন দৃঢ়বদ্ধ করেনি—সে তো কোন জবাব দিল না? ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে এল শ্রবণার বাহুবন্ধন। আস্তে আস্তে সরে দাঁড়াল সে। চুপটি করে গিয়ে বসল ওর খাটের প্রান্তে। প্রিয়দর্শী তখনও নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মূর্তির মত—তার দৃষ্টি জানালা দিয়ে নক্ষত্রময় দূর আকাশের দিকে নিবদ্ধ। সেখানে কালপুরুষ দাঁড়িয়ে আছে নিস্পন্দ নিথর—'লুব্ধকের' দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে।

লজ্জায় যেন মাটির সঙ্গে মিশে গেল শ্রবণা। লজ্জা, অপরিসীম লজ্জা! কিন্তু এখন আর কোন উপায় নেই। তার আত্মনিবেদনের ভাষা, তার আত্ম-উৎসর্গের আকুতি আর ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না ঐ পাষাণ মানুষটার কাছ থেকে। লুব্ধক-কে কোন দিনই বুকে টেনে নেবে না কালপুরুষ! দাঁত দিয়ে ঠোঁটের কামড়ে ধরে শ্রবণা কোনক্রমে বলে, তুমি তো কিছু বললে না?

—উঁ? সাড়া দিল প্রিয়দর্শী। তারপর যেন সম্বিত ফিরে পেয়ে ধীরে ধীরে গিয়ে বসল সামনের খাটে। মাথার লম্বা চুলগুলো নির্মমভাবে টানতে টানতে বললে, না, ব্যাপারটা কি জান? আমার মনে হল, এই মুহূর্তে যে ঘটনাটা ঘটল এটা আগেও আমার জীবনে ঘটেছে। ঠিক এমনি ভাবে, ঐ ভঙ্গিতে আরও একবার আমার বুকের উপর ভেঙে পড়েছিল আর একজন মেয়ে! আর আশ্চর্য! সেও বলেছিল ঠিক ঐ কথাগুলোই—আমি সব ছেড়ে তোমার কাছে ছুটে এসেছি প্রিয়, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না, আর হ্যাঁ, সেও বলেছিল এ নরক-যন্ত্রণা থেকে তুমি উদ্ধার কর আমাকে।

দু-হাতে মুখ ঢেকে মাথা নাড়তে নাড়তে প্রিয়দর্শী বলে, কিন্তু কবে, কোথায়? কে সেই মেয়ে?

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ায় শ্রবণা। ভিজে তোয়ালে লোকে যেভাবে নিঙরায় ঠিক তেমনিভাবে প্রিয়দর্শী এক্ষুণি ওর অশ্রু-আর্দ্র হৃদপিণ্ডটাকে নিঙরে নিঃশেষ করে দিয়েছে! দেওয়ালটা হাত বাড়িয়ে ধরে, পায়ের উপর আর ভরসা রাখতে পারছে না শ্রবণা। দিভেচার দেওয়া অপমান, শাহজাহানের দেওয়া আঘাত এই মুহূর্তে ওর মনে হল—অতি তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর! আর যাই হোক এমন নির্মমভাবে চাবুক চালায়নি তারা। না হয় এসেইছিল আর কোন

নারী ঐ দেবদুর্লভকান্তি মানুষটার জীবনে, না হয় বলেইছিল আর কোন হতভাগিনী ঐ একই কথা, একই নির্লজ্জ ভাষায়, কিন্তু সেগুলো ঠিক এই মুহূর্তে এভাবে বুক ফুলিয়ে ঘোষণা করার কী তাৎপর্য? বিরহ মধুর, বিচ্ছেদ দুঃসহ, প্রত্যাখ্যান দুর্বিষহ—কিন্তু ব্যঙ্গ? তোমার হৃদয়-নিঙরানো আত্মদানের আকুতি শুনে কেউ যদি ফস্ করে বলে বসে, এ আর নতুন কথা কি শোনালে হে? কতবার শুনেছি!—তাহলে? মাতালের মত টলতে টলতে শ্রবণা এগিয়ে যায় দ্বারের দিকে।

হঠাৎ মুখ তুলে ওকে দেখতে পায় প্রিয়দর্শী। ছুটে এসে ওর হাতখানা টেনে নেয়। বলে, কী হল? কোথায় যাচ্ছ?

জানিনা, বলতে গেল শ্রবণা, পারল না।

প্রিয়দর্শী ওকে টেনে নিয়ে গিয়ে আবার বসিয়ে দেয় খাটে। বলে, আমি নির্বোধ! কিন্তু আমি বড় অসহায় শ্রবণা। আমার কেমন যেন সব গুলিয়ে যায়। আমি নিশ্চিত জানি, এমন ঘটনা আমার জীবনে কখনও ঘটেনি, ঘটতে পারে না। তোমার আগে আমার জীবনে আর কোন নারী আসেনি। তুমি অনন্যা। আর কাউকেই কখনও ভালবাসিনি আমি। তবু আমার এমন মনে হয় কেন? আমি কি জাতিস্মর? গত জন্মে কি কোন মেয়ে—যাক্ ওকথা। কি হয়েছে, বল?

আপ্রাণ প্রচেষ্টায় নিজেকে সামলে নিয়ে শ্রবণা বলে, কিছু না। আমাকে যেতে দাও!

প্রিয়দর্শী ওকে বুকে টেনে নেয়, বলে, তুমি আমার উপর এখনও রাগ করে আছ! রাগ করার কথাই। আমি জানি এ অপরাধের ক্ষমা নেই। তবু তুমি তো জান, আমি আধা-মানুষ! ভুল বুঝো না আমাকে। বল, কেন তুমি এভাবে চলে এসেছ? কিছু হয়েছে?

—সেখানে আমি আর ফিরে যাব না। আজ রাতের মত আমাকে একটা আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিতে পার? আর কিছু চাই না আমি।

প্রিয় জানালা দিয়ে চার্চের বড় ঘড়িটার দিকে তাকায়। সাড়ে এগারো। জামাটা পরে নেয়। জুতোটা পায়ে গলিয়ে নিতে নিতে বলে, আমার কাছে টাকা নেই। তোমার কাছে কিছু আছে?

—গোটা চল্লিশ টাকা এখনও নগদে আছে। কেন?

—এস তাহলে আমার সঙ্গে।

ঘরে তালা দিয়ে ওরা পথে বেরিয়ে আসে। রাস্তা নির্জন হয়ে পড়েছে।

মাঝে মাঝে দ্রুত গতিতে ছুটে চলেছে রাত্রিচর গাড়ি। বাস প্রায় নেই বললেই চলে। একটা ট্যাক্সি খালি পাওয়া গেল! ওরা এসে থামল খানদানি একটা হোটেলের সামনে। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে প্রিয়দর্শী বললে, আজ রাতটুকু এখানেই থাক। কাল যা হয় করা যাবে।

রিসেপশান কাউন্টারের জিজ্ঞাসায় এবং সন্দিগ্ধ দৃষ্টিটায় প্রিয়দর্শী একটু বিব্রত বোধ করে। কৈফিয়তের ভঙ্গিতে বলে, আমার বান্ধবী শহরতলীতে থাকেন। লাস্ট ট্রেন মিস্ করেছেন। একটা সিংগল সীটেড ঘর পাওয়া যাবে?

—সিংগল সীটেড নেই, ডবল-বেড আছে। কেন, উনি কি একা থাকবেন?

—হ্যাঁ, আমার মাথা-গোঁজার আশ্রয় এই শহরে আছে। ডবলবেডই দিন।

—নামটা?

—শ্রীমতী বৈশাখী রায়। আচ্ছা এখান থেকে একটা টেলিফোন করা যাবে?

—কেন যাবে না? করুন না।

প্রিয়দর্শী কাউন্টারের ওপাশে সরে গেল। আবল-তাবল একটা নাম্বার ডায়াল করে। ও প্রান্তে রিঙিং টোন বেজেই চলেছে; কিন্তু প্রিয়দর্শী এক তরফা বলে চলে, হ্যালো কে? ভাবীজি? আরে এক কাণ্ড হয়েছে। বৈশাখী লাস্ট ট্রেনটা মিস্ করেছে। আজ রাতে যেতে পারছে না।···না না, আমার বাসায় নয়।···প্রাজা হোটেলে থাকছে ও।···না না, সে সব ভয় নেই, সম্ভ্রান্ত হোটেল।···কাল সকালে প্রথম ট্রেনেই ওকে আমি নিজে তুলে দিয়ে আসব।

মনগড়া একটা শহরতলীর ঠিকানা খাতায় লিখে দিয়ে প্রিয়দর্শী ওকে নিয়ে গেল দ্বিতলের ঘরখানায়। বিছানার চাদর, জানালার পর্দা এবং খাবার জলের বোতল দিয়ে বেয়ারা প্রশ্ন করল, ভোরে চা দিতে হবে কিনা। শ্রবণার জবাব দেওয়ার আগেই প্রিয়দর্শী বলে বসে, হ্যাঁ, সাড়ে পাঁচটায়।

সেলাম করে চলে গেল লোকটা দরজা ভেজিয়ে দিয়ে।

শ্রবণা আলতোভাবে বসে বিছানাটার কোণায়। ডানলোপিলোর নরম গদি, বলে, ফোন করলে কাকে?

জানলার পাল্লাটা বন্ধ করে দিতে দিতে প্রিয়দর্শী মুখ না ঘুরিয়েই জবাব দেয়, হোটেল ম্যানেজারটা যাতে সন্দেহ না করে যে, তুমি পালিয়ে যাচ্ছ তাই মনগড়া এক ভাবীজিকে ফোন করতে হল।

ড্রেসিং টেবিলের টুলটা টেনে নিয়ে প্রিয়দর্শী বসে।

শ্রবণা বেণীটা খুলতে খুলতে বলে, ভোরে চায়ের কথা আবার বললে কেন? অত সকালে আমি তো চা খাই না।

যেন এটাই সবচেয়ে জরুরী কথা। প্রিয়দর্শী কিন্তু সেই সূত্রেই ফিরে এল জরুরী কথার প্রসঙ্গে, বললে, না হয় চা খেও না। তবু সাড়ে পাঁচটায় ঘুমটা ভাঙবে নিশ্চিত। উঠে তৈরী হয়ে নেবে। ছটার মধ্যে এসে যাব আমি। তারপর দু'জনেই বোম্বাই ছেড়ে চলে যাব।

—দু'জনে? কোথায় যাব আমরা?

—রাঁচি। তুমিই তো বলেছিলে বিয়ে করে প্রথমে আমাকে তাঁর কাছে যেতে হবে।

শ্রবণা কি জবাব দেবে ভেবে পায় না। কেমন যেন লজ্জা করে তার। ও প্রসঙ্গ এড়িয়ে তাই বলে, কিন্তু রাঁচি যাব তো কলকাতা হয়ে, ক্যালকাটা মেলে—সে ট্রেন তো ছাড়বে সন্ধ্যা বেলায়।

—না! আমরা সকালে বাসে করে যাব দাদার। সেখান থেকে লোকাল ট্রেনে নাসিক। নাসিকে আমরা ক্যালকাটা মেল ধরব। তুমি ভুলে গেছ—শাহজাহান কাল সকালেই দিভেচাকে খবর দেবে। দিভেচার লোক সেণ্টাল আর ভি, টি-তে প্রত্যেকটি ট্রেন তন্নতন্ন করে খুঁজবে। শহরের সব কটি হোটেলেও হয়তো কাল সকাল থেকেই তল্লাসী চলবে।

একটু ইতস্তত করে শ্রবণা বলে, এতরাত্রে তুমিই বা আর ফিরে গিয়ে কি করবে? আরও একটা বিছানা তো আছে ঘরে।

ম্লান হাসলে প্রিয়। তারপর বললে, না, আজ নয়।

মুখটা নিচু হয়ে গেল শ্রবণার। চোখ না তুলে বলে, কেন? আজই বা নয় কেন?

না, আজ নয়—আবার বললে প্রিয়,—আজ উত্তেজনার বশে তুমি ছুটে এসেছ আমার কাছে। আশ্রয় চেয়েছ শুধু। আজ রাতের জন্য তোমাকে বিশ্রাম, নিরাপত্তা আর নিদ্রার জোগান দেবার দায় ছিল আমার।

প্রিয়দর্শী বোঝে না কেন? ভাবে শ্রবণা। আর কি ভাবে বলা যায়? তবু শেষ চেষ্টা করে, কিন্তু আমি কি শুধু এটুকুই চেয়েছিলাম তোমার কাছে? ঐ ভাবে?

প্রিয়দর্শী উঠে দাঁড়ায়। শ্রবণার মাথায় হাতটা রাখে। মাথাটা নেড়ে দেয়। বলে, জানি গো জানি! তবু বলব, আজ নয়। তুমি ভুলে গেলেও

আমি ভুলতে পারিনি—আমি আধা-মানুষ! আমি যে কোন সময়ে আবার পাগল হয়ে যেতে পারি! তোমার ক্ষণিক দুর্বলতার সুযোগে আজ যদি এ ঘরে রাত্রিবাস করে যাই, তবে হয়তো একদিন তোমাকে তার জন্য অনুতাপ করতে হবে। তোমাকে আগে নিরাপদ বন্দরে পৌঁছে দিই, তারপর যদি তুমি আমন্ত্রণ জানাও—নিশ্চয়ই আসব আমি। ধন্য হয়ে যাব সেদিন!

শ্রবণাও উঠে দাঁড়ায়—কি যেন বলতে চায়।

প্রিয়দর্শী তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, তুমি বুঝছ না কেন? আমার কতটা কষ্ট হচ্ছে তোমাকে এভাবে একা ফেলে রেখে যেতে?

শ্রবণা আর কোন কথা বলে না।

ছুটে বেরিয়ে যায় প্রিয়দর্শী। পালিয়ে যায় যেন। শ্রবণার কাছ থেকে, নিজের কাছ থেকে।

প্রিয়দর্শীর আশঙ্কা দেখা গেল সম্পূর্ণ অমূলক। টেলিগ্রাফখানা পেয়ে ছেলেমানুষের মত খুশীয়াল হয়ে উঠলেন ডাক্তার সদারঙ্গনী। লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি ভেঙে একতলা থেকে দ্বিতলে উঠে এসে বললেন, রামদয়াল, ত্রিবেদী সাব'কে সেলাম দো! অলকাকেও ডাক!

সকলে সমবেত হ'লে পোস্টাপিসের ছাপমারা কাগজখানা ওদের সামনে নেড়ে বলেন, কে আসছে যে বলতে পারবে তাকে একসের মিঠাই খাওয়াব।

দেখতে রাশভারী হলেও ওঁর অন্তরে যে একজন চিরশিশু লুকিয়ে আছে একথা সবাই জানে!

অলকা বলে, একসের মিঠাই খেয়ে আমি হজম করতে পারব না স্যার, তার চেয়ে কে আসছে বলে দিন।

কাগজখানা ওদের সামনে মেলে ধরে বলেন, প্রিয়! আজই বিকেলের ট্রেনে। একা নয়, সঙ্গে তার বাগ্‌দত্তা বধূ। আমি স্থির করেছি এ বাড়ি থেকেই বিয়ে হবে, দিনটা স্থির হবে ওরা এলে। অলকা, যাবতীয় দায়িত্ব তোমার। আমি ওসব কিছু জানি না—

ত্রিবেদী মাথা চুলকে বলে, আমি বলছিলাম স্যার—

—না না, তোমার দ্বারা ওসব হবে না। তুমি বিয়ে করেছ, আমি জানি—কিন্তু সেটা নেগশিয়েবল্ ম্যারেজ। তোমার বাবা বিয়ে দিয়েছিলেন। অলকা নিজে ব্যবস্থা করে বিয়ে করেছে। এসব কাজ সেই ভাল পারবে।

অলকা হেসে বলে, আপনি কিছু ভাববেন না ডক্টর। আমরা সব ব্যবস্থা

করে দেব। আপনি খালি বর-কনেকে নিয়ে আসার ব্যবস্থাটা করে দিন।

—হ্যাঁ, আমি নিজেই যাব।

নিজেই গিয়েছিলেন তিনি। ট্রেন থেকে নামামাত্র প্রিয়দর্শীকে জড়িয়ে ধরেছিলেন, হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো। কই বৌ কোথায়?

শ্রবণা নেমে এসে হাসিমুখে প্রণাম করে তাঁকে।

—আরে এ যে খাসা বৌ? অ্যাঁ!

প্রিয়দর্শী লাজুক লাজুক মুখে বলে,আমি কিন্তু এখনও বিয়ে করিনি স্যার।

—জানি আমি। চল চল। এই কুলি—

ব্যস্ত হয়ে ওঠেন উনি। সদলবলে স্টেশনের বাইরে এসে গাড়িতে উঠে বসেন। সেই কালো ষণ্ডের সিডান-বডি গাড়িখানা। ড্রাইভার গাড়ি থেকে ডানহাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে ইংরাজিতে অভিবাদন জানায়, হার্টি কনগ্রাচুলেসন্স টু য়ু, এ্যাণ্ড য়োর মিসেস্।

চমকে ওঠে প্রিয়দর্শী, তুমি! ডেভিড! তুমি চালাবে নাকি?

ডাক্তার সদারঙ্গনী বলেন, ওর চেয়ে ভাল ড্রাইভার রাঁচি শহরে নেই—সারা বিহারেও আছে কিনা সন্দেহ! কি ব'ল ডেভিড?

ডেভিড একগাল হাসল।

গাড়ি ছাড়ল। প্রিয়দর্শী জনান্তিকে ডাক্তার সাহেবকে বলে, ওর ড্রাইভিং লাইসেন্স আবার হয়েছে নাকি?

— ক্ষেপেছ তুমি? কিন্তু ভয় নেই। ও ঠিকই পৌঁছে দেবে আমাদের।

প্রিয়দর্শী জানে এর উপর কথা চলবে না। এটাও ডাক্তার সাহেবের চিকিৎসার অন্তর্গত। ডেভিডের উপর উনি যখন আস্থা স্থাপন করেছেন, তখন সে নিশ্চিত আস্থাভাজন হয়ে উঠেছে। লাইসেন্স তার থাক আর না থাক।

সত্যিই ওরা নিরাপদে পৌঁছে গেল হাসপাতালে। সেই করুণাময়ী স্যাঙচুয়ারি লেখা সাইনবোর্ডটা অতিক্রম করে গাড়ি এসে দাঁড়ালো পোর্টিকোর নিচে। রামদয়াল এসে খুলে দিলে দরজা। যুক্ত করে প্রণাম করল প্রিয়দর্শীকে, শ্রবণাকে। ত্রিবেদীও এসে রিসিভ করল, করমর্দন করল প্রিয়দর্শীর সঙ্গে, সস্মিত নমস্কার জানাল তার ভাবী বধূকে।

ভারি ভাল লাগছিল শ্রবণার। সে যেন এখানকার একজন বিশিষ্ট অতিথি। যেন বধূবরণ হচ্ছে। তারা নাই বা কেউ বাজালো শাঁখ, নাইবা দিল হুলুধ্বনি; ওদের আন্তরিক ব্যবহারেই বোঝা যায় প্রিয়দর্শী ওদের কত প্রিয়, তার ভাবী বধূ কত আদরণীয়।

ভীড়ের মাঝখান থেকে অলকা এগিয়ে এসে ওর হাতটা ধরে। বলে, আমার নাম অলকা, আমি হচ্ছি—

—জানি, অনেক শুনেছি আপনার কথা।

অলকা খুশী হল। ছোটভাইয়ের মত সেবা করেছে এতদিন প্রিয়কে। প্রিয়দর্শী তাহলে সে কথা ভোলেনি। ভাবী বধূকে তার কথাও বলেছে সে।

ডাক্তার সাহেব বলেন, ওদের উপরে নিয়ে যাও, আমি হাতের কয়েকটা কাজ সেরে আসছি।

অলকা আর ত্রিবেদী ওদের পথ দেখিয়ে উপরে নিয়ে যায়। ডাক্তার সাহেবের কোয়ার্টার্স দ্বিতলে। সর্বসমেত চারখানা ঘর। দুখানা উনি ব্যবহার করেন। একটা শয়ন কক্ষ, দ্বিতীয়টা লাইব্রেরী-কাম-ড্রইং। বাকি ঘর দুখানা তালাবন্ধই থাকে। সে দুটি গেস্ট-রুম। আবাসিকদের কোন আত্মীয়-স্বজন এলে তাঁদের থাকতে দেওয়া হয় সে দুটি ঘরে। তারই এক-খানাতে ওদের নিয়ে যাওয়া হল। বেশ বড় ঘর। দুটি খাট, দুটি বিছানা, লাগাও স্নানাগার। মালপত্র রামদয়াল নিয়ে এল উপরে। অলকা ওকে ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে বলে, দেখ ভাই, ঘর পছন্দ হয়েছে তো? ঐ যাঃ! প্রথমেই তোমাকে তুমি বলে ফেললাম।

শ্রবণা তাড়াতাড়ি বলে, তাই তো বলবেন। আপনার ছোট বোনের মত তো আমি।

অলকা বলে, যাঃ!

শ্রবণা অবাক হয়ে বলে—'যাঃ' মানে?

অলকা মুখ টিপে বলে, তোমাকে 'যাঃ' বলিনি আমি। বলেছি 'জা'। তুমি আমার ছোট বোনের মত নও। 'জা'-য়ের মত।

অলকা রাঙিয়ে ওঠে। তাড়াতাড়ি মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে জানলাটা খুলে দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। পশ্চিমদিকের খোলা জানলা দিয়ে একঝলক শীতের পড়ন্ত রোদ এসে পড়ে ঘরের ভিতর। অনেকটা বাগান, তার ওপারে পাঁচিল। তারও ওপারে রুক্ষ প্রকৃতি, লাল কাঁকরে একটা রাস্তা দক্ষিণ দিকে চলে গেছে কোথায়। নির্মেঘ আকাশে ভাসছে কয়েকটা চিল।

ওরা ঘরটা গুছিয়ে নেওয়ার আগেই হন্তদন্ত হয়ে ডাক্তার সাহেব এসে হাজির, কই, কোন্ ঘর দিয়েছ কাকে?

ত্রিবেদী এগিয়ে এসে বলেন, এই যে স্যার, পশ্চিমদিকের বড় ঘরখানা।

—হুঁ! কার ঘর এটা?

—এঁদের, এখানে দুটো বেড আছে, অসুবিধা হবে না। পাশের ঘরখানা খালিই থাকল—অন্য কোন গেস্ট যদি আসেন—

সদারঙ্গনী একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসেন। চোখ থেকে চশমাটা খুলে নিয়ে গম্ভীর হয়ে বলেন, ব্যবস্থাপনাটা কার? তোমার না অলকার?

ত্রুটি একটা কিছু নিশ্চয় হয়েছে। কিন্তু কী সেটা? ত্রিবেদী আর অলকা পরস্পরের দিকে তাকায়। দায়িত্বটা কেউই ঘাড়ে নিচ্ছে না দেখে ডাক্তার সাহেব বলেন, মানলাম। দোষ তোমাদের নয়, আমারই দোষ। তোমাদের দায়িত্ব দেওয়াই ভুল হয়েছে আমার!

ত্রিবেদী তার অলকাকে নীরব দেখে প্রিয়দর্শী নিজেই এগিয়ে আসে, কেন স্যার, ভুলটা কি হ'ল?

—য়ু সাট আপ! রামদয়াল!

রামদয়াল এগিয়ে আসে। ডাক্তার সাহেব বলেন, এই ঘরে মেমসাহেব থাকবেন—ও ঘরে প্রিয়র বাক্স বিছানা নিয়ে যাও।

কোন্‌টা কার বাক্স প্রশ্নমাত্র না করে হাতের কাছে যেটা পেল উঠিয়ে নিয়ে রামদয়াল স্থান ত্যাগ করে। ডাক্তার সাহেবকে সে চেনে।

ডাক্তার সাহেব এবার প্রিয়দর্শীর দিকে ফিরে বলেন, এতদিন যা করেছ, করেছ—আমার বাড়িতে ওসব অনাচার চলবে না। দুহাত মিলিয়ে দিই, তখন এক ঘরে থাকতে পারবে। যত সব অনাসৃষ্টি!

অলকা আর ত্রিবেদীর মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হল।

হল প্রিয়দর্শী আর শ্রবণারও।

ডাঃ সদারঙ্গনী পাগলের ডাক্তার অথবা ডক্টরেট-ইন-পাগলামি এ সম্বন্ধেই সন্দেহ জাগছে প্রিয়দর্শীর। রীতিমত ছেলের বিয়ের আয়োজন করতে থাকেন তিনি। পার্টি দিতে হবে, নিমন্ত্রণপত্র ছাপতে গেল। চীনে-লণ্ঠন আর ফুল দিয়ে সাজাতে হবে বাড়িটা। সামনের মাঠে প্যাণ্ডেল বানাতে হবে। ভাল দেখে একজন ডেকরেটারের সঙ্গে বরং কথা বলে আসুক ত্রিবেদী। রসুন চৌকি? না, না, সে বড় সেকেলে ব্যাপার। তার চেয়ে মাইকে লঙ-প্লেইং রেকর্ড, বিশমিল্লার সানাই, মাইক্রোফোন একটা ভাড়া করে নিয়ে এস না। বায়নার টাকা? টাকা ভাণ্ডারীর কাছ থেকে চেয়ে নাও। যখন যা লাগবে ভাণ্ডারীর কাছ থেকে নিও। এক হাত থেকে খরচ হওয়া ভাল, ঠিকমত হিসেব থাকে তাতে। হিসাব আর ক্যাশ ভাণ্ডারীই রাখছে।

আঁৎকে ওঠে প্রিয়দর্শী, ভাণ্ডারী মানে? আমাদের ভাণ্ডারী সাহেব?

সদারঙ্গনী গম্ভীর হয়ে বলেন, আবার কে? ওর চেয়ে ভাল হিসাব-রক্ষক রাঁচি শহরে নেই, সারা বিহারেও আছে কিনা সন্দেহ!

প্রিয়দর্শী না বলে পারে না, শেষকালে একটা কেলেঙ্কারি কাণ্ড হবে স্যার!

সদারঙ্গনী জবাব দিলেন না, এমনভাবে তাকালেন প্রিয়র দিকে যে, সে বেচারি পালাবার পথ পায় না।

সন্ধ্যাবেলা ডাক্তার সাহেবকে জনান্তিকে পেয়ে শ্রবণা বললে, আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল—

সদারঙ্গনী কাছে এসে বলেন, হ্যাঁ মা, তোমার সঙ্গে আমারও কয়েকটা কথা আছে। তোমার বক্তব্যটাই আগে শুনি।

—ও নিজের সম্বন্ধে কিছুই জানে না। ওর বাবার নামটা পর্যন্ত নয়। আপনি নিশ্চয় জানেন ওর পরিচয়—

—সবটা নয়, তবে অনেকটা জানি। জানাব তোমাকে—

—ওকে কি সব কথা বলা যাবে না?

একটু ভেবে নিয়ে ডাক্তার সাহেব বলেন—আমার তো মনে হয়, এখন যাবে। ও এতদিনে বেশ স্বাভাবিক হয়ে গেছে। বিয়েটা মিটে গেলে আমার তো মনে হয় ওর রোগের পুনরাক্রমণের আশঙ্কাটাও ঘুচবে। তখন ওকে জানানো যাবে ওর পূর্ব-ইতিহাসটা। আসল কথা হচ্ছে মানসিক শান্তি। সেটার যেটুকু অভাব আছে তুমি মিটিয়ে দিতে পারবে, এ ভরসা রাখি।

—ও পাগল হয়ে গিয়েছিল শুনেছি—

—ভুল শুনেছ!

—ভুল?

—হ্যাঁ ভুল। পাগল কাকে বলে? যার চিন্তাধারায় কোন পারম্পর্য নেই, ওয়ান হু হ্যাজ নো সিকোয়েন্স ইন হিজ থট-প্রসেস। সে জাতের পাগল ও কোনদিনই হয়নি। ওর যা হয়েছিল তাকে বলে 'ট্রম্যাটিক্ এ্যাম্‌নেশিয়া', অর্থাৎ আঘাতজনিত কারণে স্মৃতিবিভ্রম। আরও কতকগুলো আনুষঙ্গিক কমপ্লিকেশন্স অবশ্য ছিল। ওর মাথায় আঘাত লেগেছিল। প্রিয়র কপালে একটা কাটা দাগ আছে লক্ষ্য করে থাকবে। সেই আঘাতের শকে ও স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল,—ও ভুলে গিয়েছিল আত্মপরিচয়। বস্তুত শুধু আত্ম-পরিচয়টুকু নয় আঘাতের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত ওর যা কিছু এ্যাকোয়ার্ড নলেজ ছিল

প্রায় সমস্তই ভুলে গিয়েছিল সে। সতের বছর বয়সে আবার নতুন করে সে সদ্যোজাত শিশু হয়ে পড়েছিল মনের দিক থেকে। এরকম কেস খুব কম পাওয়া যায়। তিল তিল করে পূর্ব-অভিজ্ঞতাগুলো ওর নূতন করে ফিরে এসেছে, শুধু আসেনি পূর্ব-পরিচয়ের স্মৃতি। সেটা ওর অবচেতন মন ইচ্ছে করে ভুলে থাকতে চায়।

—কিন্তু সে সব কথা মনে পড়িয়ে দিলেও কি ওর মনে পড়বে না? যেখানে ওর বাল্যকাল কেটেছে সেখানে গেলেও কি ওর মনে পড়বে না? ওর বাবা-মা-ভাই-বোনদের হঠাৎ পথে-ঘাটে দেখলেও কি ও চিন্‌তে পারবে না?

ডাক্তার সাহেব বলেন, বলা কঠিন। অবশ্য যতদূর জানি, বাবা-মা-ভাই-বোন ওর কেউ নেই; কিন্তু বাল্যের পরিবেশে গেলে হয়তো ওর সব কথা মনে পড়ে যাবে। প্রশ্ন সেটা নয়, প্রশ্ন এই যে, সেটা মনে পড়ে যাওয়া কি ওর পক্ষে মঙ্গলের হবে?

—ওর কি আবার স্মৃতিভ্রংশ হয়ে যেতে পারে?

—পারে। যে বনিয়াদের উপর ওর মানসিক স্থাপত্য খাড়া হয়ে আছে, সেই বনিয়াদে কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন হলে সমস্ত কাঠামোটা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে পারে।

—মানসিক-স্থাপত্যের বনিয়াদ বল্‌তে কি বোঝাতে চাইছেন?

—সে বনিয়াদ ওর মা! ওর মায়ের নৈতিক চরিত্র।

—ওর মা? কে ওর মা?

জবাবে ডাক্তার সাহেব বলেন, বেশ বিকালে হুড্রু ফল্‌স্‌ই দেখে এস বরং। গাড়িটা নিয়ে যেও। ডেভিড চালাবে। আমার গাড়ির প্রয়োজন নেই।

একটু হকচকিয়ে যায় শ্রবণা, পরমুহূর্তেই অনুভব করে ওর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে প্রিয়দর্শী। সে বলে, আমাকে বাদ দিয়ে বেড়াতে যাবার পরামর্শ হচ্ছে বুঝি?

ডাক্তার সাহেব হেসে বলেন, এই দেখ। চোরের মন বোঁচ্‌কার দিকে। একটু গোপন পরামর্শ করবার যো নেই।

বিকালে হুড্রু জলপ্রপাত দেখতে গেল ওরা। ডেভিড নয়, শেষ পর্যন্ত সদারঙ্গনী নিজেই ড্রাইভ করে নিয়ে গেলেন ওদের। রামদয়াল টিফিন-ক্যারিয়ারে করে খাবার নিয়ে বসল সামনের সীটে। অলকাকেও ডেকে নিল শ্রবণা, কোন আপত্তি শুনল না।

উচ্চ মালভূমির উপল-মুখর পথে এঁকে বেঁকে চলতে চলতে পার্বত্য স্রোতস্বিনী হঠাৎ দুরন্ত উচ্ছ্বাসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে নিম্নভূমির উপর। বর্ষাকালে এর ভরা যৌবন দেখবার মত। সে রূপ ভয়ঙ্কর সুন্দর। এখন সে ঘোলা-জলের উন্মাদনা নেই—ফটিকস্বচ্ছ নীলজলের সঙ্কীর্ণতর ধারা। তবু সমস্ত এলাকাটা গম্ গম্ করছে হুড্রুর নিরুদ্ধ গুমরানিতে। সূক্ষ্ম জলকণার একটা ভাসমান লুতাজালে পড়ন্ত সূর্যের আলোয় সাতরঙা ইন্দ্রধনু। দূরে দূরে আরও কয়েকটি টুরিস্টদল—ওরাও এসেছে রাঁচি থেকে—জলপ্রপাত দেখতে।

পাথরের উপর সমতল একটা স্থানে ওরা এসে বসে। রামদয়াল গাড়ি থেকে নামিয়ে নিয়ে আসে টিফিন-কেরিয়ার, চায়ের ফ্লাস্ক, গ্লাস-প্লেট।

অলকা খাবারগুলি প্লেটে সাজিয়ে দেয়। ডাক্তার সাহেবের দিকে একটি প্লেট বাড়িয়ে ধরে শ্রবণা। সদারঙ্গনী বলেন, না, না আমাকে অত দিও না—অবেলায় ওসব খেলে আমার হজম হবে না।

শ্রবণা দ্বিতীয় প্লেটখানা প্রিয়দর্শীর দিকে এগিয়ে দেয়, বলে, আপনার তো আর হজমের বয়স যায়নি, আসুন—

প্রিয়দর্শী জবাব দেয় না। অন্যমনস্কভাবে প্লেটটা হাত বাড়িয়ে নেয়। খায় না কিন্তু। জলপ্রপাতের দিকে ছুটে-যাওয়া জলধারার দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবতে থাকে।

অলকা রামদয়ালের ভাগটা সরিয়ে রাখছিল, আড় চোখে প্রিয়দর্শীকে দেখে নিয়ে বলে, কি ভাবছেন বলুন তো?

—উঁ? না কিছু না—তন্ময়ভাবটা কেটে যায় প্রিয়দর্শীর। প্লেট থেকে লুচি তুলে নেয়।

শ্রবণা বলে, উনি ভাবছিলেন, ঠিক এমনিভাবে ওঁকে আরও কে একটি মেয়ে এক প্লেট খাবার অফার করেছিল, আর বলেছিল—'আপনার তো খাবার বয়স যায়নি, আসুন—'

প্লেটটা পাথরের উপর নামিয়ে রেখে প্রিয়দর্শী বলে, কী আশ্চর্য! তুমি কি করে জানলে, আমি কী ভাবছি!

—কেমন করে জানলাম সে কথা অবান্তর। তোমার জীবনে এ ঘটনা ঘটেছিল ট্রেনের কামরায়। যে মেয়েটি তোমাকে প্লেটটা এগিয়ে দিচ্ছিল তার নাম—

—মনে পড়েছে! তাই হঠাৎ 'আপনি' বলেছ তুমি। শুধু শুধু 'লেগ পুলিং'!

অলকা মিটিমিটি হাসতে থাকে।

প্রিয়দর্শী বলে, জানেন ডাক্তার সাহেব, এই ব্যাপারটা আমার প্রায়ই হয়। কোন একটা ঘটনা ঘটামাত্র মনে হয় এমন একটা ব্যাপার, ঠিক এই রকম একটা ঘটনা আমার জীবনে আগেও ঘটেছে। যে কথাটা এইমাত্র শুনলাম, সেটা যেন আগেও শুনেছি। তখনই আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি। ভুলে যাওয়া স্মৃতিটাকে ফিরিয়ে আনতে চাই—পারি না। আবার কেমন যেন সব মিলিয়ে যায়। এই এক্ষণি যেমন হল আর কি। এ ক্ষেত্রে ট্রেনের মধ্যে যে মেয়েটি থাবার অফার করেছিল সে আর শ্রবণা একই লোক—ফলে সমস্যাটা সহজেই মিটে গেল; কিন্তু কখনও কখনও এমন হয় যে, দু'তিনদিন আমি শুধু অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াই। একরাত্রের কথা বলি। মেসে একা ঘুমাচ্ছি। রাত প্রায় বারোটা হবে। হঠাৎ দরজায় কে যেন কড়া নাড়ল—

শ্রবণা বাধা দিয়ে বলে, থাক্ বাপু ওসব ভূতুড়ে গল্প। শুনুন ডাক্তার সাহেব—

ডাক্তার সাহেব বলেন, না, না, ব্যাপারটা শোনাই যাক না—

—হ্যাঁ, যা বলছিলাম। দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। প্রথমটা ভেবেছিলাম, আমার রুমমেট সিনেমা দেখে ফিরেছে বুঝি। অত রাতে আর কে আসবে? উঠে গিয়ে দরজা খুলতেই—

শ্রবণা আবার বাধা দিয়ে বলে ওঠে, কী সব আবোল-তাবোল গল্প—

ডাক্তার সাহেব এবার বিরক্ত হয়েই বলে ওঠেন, আঃ! বারে বারে থামিয়ে দিচ্ছ কেন ওকে?

অলকাও বিরক্ত হয়ে বলে ওঠে, বেশ করছে দিচ্ছে! প্রিয়দর্শীবাবু ডাক্তারের কাছে যা-ইচ্ছে কনফেশন করতে পারেন—কিন্তু আমাদের সামনে কেন?

হঠাৎ যেন সম্বিত ফিরে পায় প্রিয়, লাজুক লাজুক মুখে বলে, ও, আচ্ছা, আচ্ছা—আয়াম সরি!

ডাক্তার সাহেব পাইপটা বার করতে করতে তিনজনের দিকে পরপর তাকিয়ে বলেন, আই সী!

অস্বস্তিকর পরিবেশটা কাটিয়ে উঠবার উদ্দেশ্যেই প্রসঙ্গটা বদলে নেয় শ্রবণা। প্রশ্ন করে—আচ্ছা আপনার হাসপাতালের নাম 'করুণাময়ী' হল কেন? করুণাময়ী কে?

ডাক্তার সাহেব পাউচ থেকে পাইপে তামাক ভরছিলেন। বলেন, এটা

হাসপাতাল নয় কিন্তু শ্রবণা, এর নাম করুণাময়ী স্যাঙচুয়ারী—'উন্মাদ আশ্রম' নয়। আর করুণাময়ী নামের ইতিহাসটা বলতে গেলে আমার জীবনের আদিপর্বের অনেক কথা বলতে হয়।

অলকা বলে, কিছু কিছু আমি জানি—সবটা নয়। বলুন না শুনি।

একটুক্ষণ চুপ করে কি যেন ভেবে নেন সদারঙ্গনী। পাইপটা ধরিয়ে নিয়ে শুরু করেন তাঁর কাহিনী:

সদারঙ্গনী সাহেব এদেশের শিক্ষা শেষ করে মার্কিন মুলুকে গিয়েছিলেন মনোবিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষ একটা গবেষণা করতে। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্রটি বিদেশেও সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন একের পর এক, পরীক্ষার ধাপে। শেষে আমেরিকার 'বোর্ড অফ সাইকিয়াট্রি এ্যাণ্ড নিউরোলজি' ওঁর মাথায় এমন একটি সম্মান-মুকুট পরিয়ে দিলেন যা অতি অল্প কয়েকজন এশিয়াবাসীর ভাগ্যে জুটেছে। মার্কিন মুলুকেই লোভনীয় এবং সম্মানজনক একটি পদ তাঁকে অফার করা হল। সবিনয়ে তিনি সেটা প্রত্যাখ্যান করলেন, বলেছিলেন—বিদেশে যা তিনি শিখেছেন স্বদেশেই তার প্রয়োগ করতে চান। ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমে তাঁর মনোবাসনার কথাটা দিল্লীর বড়কর্তাদের কাছে পেশ করলেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যদপ্তর ওঁর আবেদনে সাড়া দিল। কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত একটি মানসিক চিকিৎসালয়ে তাঁকে সহকারী প্রধান কর্ণধারের চাকরিটি অফার করা হল। মার্কিন মুলুকে থাকতেই এ চিঠি হস্তগত হল তাঁর। সদারঙ্গনী হিসাব কষে দেখেননি, কিন্তু যে অধ্যাপকের অধীনে গবেষণা করেছিলেন, তিনি সদারঙ্গনীর দৃষ্টিটা এদিকে আকর্ষণ করেন। মার্কিন ভূখণ্ডে বিদেশী মুদ্রায় যে অর্থ তিনি উপার্জন করতে যাচ্ছিলেন তার প্রায় এক-চতুর্থাংশ দিতে চেয়েছেন ভারত সরকার। সদারঙ্গনী তাঁর শিক্ষককে সবিনয়ে বলেছিলেন, ভারতবর্ষ বড় গরীব দেশ স্যার!

শুনে মৃদু হেসেছিলেন সেই বিশ্ববিশ্রুত মনস্তত্ত্ববিদ। ছাত্রের ডান হাতটা টেনে নিয়ে তাতে মৃদু চাপ দিয়ে বলেছিলেন, আই বেগ্ টু ডিফার! যে দেশে তোমার মত ছেলে জন্মায়, সে দেশ গরীব নয় মোটেই!

দেশে ফিরে এলেন সদারঙ্গনী। যোগদান করলেন কর্মস্থলে। নিয়োগকর্তা দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন, বাধ্য হয়ে তোমাকে সহকারী প্রধানের পদটা দিতে হচ্ছে! মাত্র আঠাশ বছর বয়স তোমার। যিনি তোমার 'বস্' তিনি আর বছর তিনেকের মধ্যেই অবসর গ্রহণ করবেন—তখন তুমিই হবে এ প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার। কি করা যায় বল, সরকারী আইন!

সে তো বটেই, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে দেখা গেল ঐ সরকারী আইনটাই প্রতিপদে জগদ্দল পাথরের মত পথরোধ করে দাঁড়াচ্ছে। মনোবিজ্ঞানের অধুনাতন পরীক্ষা-নিরীক্ষার খবর এঁরা কেউ রাখেন না। মান্ধাতার আমলের চিকিৎসা-পদ্ধতি। আমূল সংস্কার করা উচিত। একটা মানুষ যদি কোন কারণে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে তখন তাকে শুধু ঔষধ প্রয়োগে ভাল করে তোলা যায় না। আচারে-ব্যবহারে সর্বতোভাবে তাকে সেই গর্ত থেকে টেনে তুলতে হবে স্বাভাবিকতার মালভূমিতে। তাকে বিশ্বাস করতে হবে, তার উপর নির্ভর করতে হবে, সব ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করেও। তুমি পাগল, তুমি বাতিল, তুমি আমাদের স্কন্ধে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে আছ—সুতরাং তুমি ওষুধ খাও, ঘরে বন্ধ হয়ে থাক— এ দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে কোন ফল হবে না। তরুণ বৈজ্ঞানিক অনেক খেটে প্রস্তুত করলেন তাঁর স্কীম। তাঁর বস্ এ পরিকল্পনার অনেক কিছুই বুঝতে পারলেন না—কিন্তু সেকথা স্বীকার করতে বাধল বোধহয়। কোন মন্তব্য না করেই স্কীমটা উপরে পাঠিয়ে দিলেন। স্বাস্থ্যদপ্তরের কোন আলমারির কোন ফাইলে সেটার অন্তিমগতি হল জানবার কৌতূহলের তাড়নায় সদারঙ্গনী নিজ ব্যয়ে দিল্লী দৌড়ালেন ছুটি নিয়ে। পাত্তা পেলেন না।

গতানুগতিকভাবে কাজ করে চলেন। কিছুদিনের মধ্যেই অনুভব করেন, এভাবে চলতে চলতে অচলায়তনের একটা স্থবির অঙ্গ হয়ে পড়বেন ক্রমশঃ। তিন বছর পর এ প্রতিষ্ঠানের সর্বময় কর্তা হয়েই বা কি চতুর্বর্গ লাভ হবে? বাঁধা ছকের বাইরে তো পা বাড়াতে পারবেন না কোনদিন! এই সময়েই নূতন করে ভাবতে শুরু করেন, এ চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে আবার বিদেশেই ফিরে যাবেন কিনা। দেশের কল্যাণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না—পাত্র যদি ফটো হয় অমৃত ঢেলে কি লাভ? দেশ তো চায় না তাঁকে, তাঁর শিক্ষাকে, বিজ্ঞানের নবতম আবিষ্কারের আশীর্বাদকে। দেশের প্রতি তাঁর কর্তব্য আছে —সে কর্তব্য যদি তাকে না করতে দেওয়া হয় তাহলে অন্তত মনুষ্যসমাজের প্রতি তিনি তাঁর দায়িত্ব কেন পালন করে যাবেন না? কেবলমাত্র লজ্জা, একমাত্র সঙ্কোচ, সেই বিশ্ববরেণ্য অধ্যাপককে এবার গিয়ে জানাতে হবে— ভারতবর্ষ তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছে।

ঠিক এই সময়েই ঘটল একটা ঘটনা যাতে মোড় ঘুরে গেল সদারঙ্গনীর জীবনে। প্রেমচাঁদ সিং নামে একজন ধনী জুয়েলারের একমাত্র ছেলেটি বদ্ধ উন্মাদ হয়ে আশ্রয় নিল ওঁদের হাসপাতালে। তাকে রাখা হল একটি নির্জন

একান্ত-কক্ষে। যে পরিচারক তার ঘরে খাবার পৌঁছে দিতে যায়, জল দিতে যায়, যে জমাদার ময়লা সাফা করতে যায় সে তাদের আক্রমণ করে। ফলে ওর হাত পা বেঁধে দেওয়ার হুকুম দেওয়া হল। সদারঙ্গনী আপত্তি জানালেন। ওর আপত্তি টিকল না। বড়কর্তা ওঁর কথা মানতে রাজী হলেন না। বললেন, দেখছেন না ও হ'ল ভেরুলেণ্ট টাইপ। বেঁধে না রাখলে ওর ঘরে কেউ ঢুকতেই পারবে না।

—কেন পারবে না? কই আমাকে তো ও মারতে আসছে না?

—আপনি রোজ ওকে খাবার দিয়ে আসবেন? ঘর সাফা করবেন?

সদারঙ্গনী এ কথার জবাবে মেজাজ ঠিক রেখেই বললেন, যারা সেসব কাজ করে তাদের শেখাতে হবে কায়দাটা—

—না! ওসব থিয়োরেটিক্যাল কথাবার্তা বাস্তব ক্ষেত্রে অচল।

সদারঙ্গনী তবু যুক্তির সাহায্যে বোঝাতে চাইলেন, ভুল চিকিৎসা হচ্ছে ছেলেটির। বড়কর্তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, বললেন, যতদিন আমি এ চেয়ারে বসে আছি ততদিন আমার হুকুমেই চল্‌বে সব। যাঁদের অসুবিধা হবে, তাঁরা অন্যত্র সরে গেলেই ভাল হয়।

তবু অসীম ক্ষমায় সদরঙ্গনী উপেক্ষা করে গেলেন এ রূঢ় ভাষণ, শুধুমাত্র রুগীটির মুখ তাকিয়ে, বললেন, আপনি নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে, শ্যামসুন্দরের কেসটা একটা এ্যাকুট 'নিউরেস্‌থেনিয়া'র কেস। ওর এ দশা হয়েছে একটা সেক্স্‌য়াল পার্ভার্সান থেকে। ওর যে সাইকো-এ্যানালেটিক্যাল ডায়গ্‌নসিস আমি করেছি সেটা আপনি নিশ্চয় দেখেছেন।

—ডায়গ্‌নসিস্ ঠিকই হয়েছে আপনার। প্রগ্‌নসিস্‌টা নয়। বছর খানেক আগে হলেও এ রোগের কিছু উপশম হয়তো সম্ভব ছিল। এখন ও শিবের অসাধ্য।

—কিন্তু চেষ্টা তো করে দেখতে হবে।

—কী চেষ্টা করবেন? বিয়ে দেবেন শ্যামসুন্দরের? এই অবস্থায়?

—না তা দেওয়া যাবে না। কিন্তু হাত পা বেঁধে ফেলে রেখে দিলেই বা ওকে ভাল করে তুলবেন কেমন করে—

—আপনি অহেতুক তর্ক করছেন ডক্টর সদারঙ্গনী। আমি তো আগেই বলেছি, এ রুগী ভাল হবার নয়। যে কবছর বাঁচবে ঐ ভাবেই ওকে বেঁধে রাখতে হবে। ওর যা ক্ষতি হয়েছে তার আর কোন চারা নেই। দেখতে হবে ও যেন সমাজের কোন ক্ষতি না করতে পারে।

ডাক্তার সাহেব ম্লান হেসে বলেছিলেন, অর্থাৎ এটা মানসিক চিকিৎসালয় নয়, কয়েদখানা!

রুখে উঠেছিলেন বড়কর্তা, তাহলে আপনি কি করতে চান?

—যেমন করে হক ওর অবদমিত কামনাটা চরিতার্থ করতে। তার পরেই ও ভাল হতে শুরু করবে।

বাঁকা হেসে বড়কর্তা বলেছিলেন, আর সেটা কেমন করে সম্ভবপর করা যাবে? হাসপাতালে প্রস্টিট্যুট আমদানী করতে চান বোধহয়!

—এক্সাক্টলি! এ ছাড়া আমি তো কোন পথ দেখি না।

ওঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বড়কর্তা বলেন, বাঃ বাঃ! আর সেই প্রস্টিট্যুটকে যে টাকা দিতে হবে তার ভাউচার বোধকরি আমাকে এ. জি. সি. আর-এ পাঠাতে হবে, ক্যাশ এ্যাকাউন্টের সঙ্গে।

—তা তো হবেই! খরচ যা হ'ল তার হিসাব দিতে হবে বই কি!

মুখচোখ লাল হয়ে ওঠে বড়কর্তার। এর পরেও ধৈর্য-রক্ষা করে বলেন, চমৎকার! আর চিকিৎসা ঠিকমত হচ্ছে কিনা, পারিশ্রমিক নিয়ে মেয়েটি ঠিকমত কাজ করছে কিনা সেটা কে দেখে নেবে?

—আপনি, আমি। যারা এ ব্যবস্থাপনা করছে!

—বুঝেছি! মাপ করবেন ডক্টর সদারঙ্গনী। আমার মনে হয় আপনার নিজেরই চিকিৎসার প্রয়োজন। বোধকরি এজন্যই আপনি ব্যাচিলার!

—হোয়ট ডু য়ু মীন!—চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন সদারঙ্গনী।

—য়ু নো হোয়ট আই মীন!—বড়কর্তাও উঠে দাঁড়িয়েছিলেন চেয়ার ছেড়ে। কুৎসিত হেসে বলেছিলেন, আপনার চিকিৎসাপদ্ধতিই প্রমাণ করে যে, আপনি মিক্সোস্কোপিয়ায় ভুগছেন!

সদারঙ্গনী এ অভিযোগের উপযুক্ত জবাব দিয়েছিলেন। মুখে নয় হাতে। কষে একটি চড় বসিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর 'বসের' গণ্ডদেশে!

বিভাগীয় অনুসন্ধান চালানো হয়নি। তার কারণ নিজের ঘরে ফিরে এসেই সদারঙ্গনী পদত্যাগপত্র পেশ করেছিলেন। অনতিবিলম্বে তাঁর পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়ে এল। এত শীঘ্র সরকারী ফাইল সচরাচর নড়ে না। এ ক্ষেত্রে নড়েছিল। সদারঙ্গনীর প্রথমটায় ধারণা হয়েছিল যে, তার কারণ ওঁরা কেলেঙ্কারিটা ঝুলিয়ে রাখতে চাননি-এ লজ্জাকর অধ্যায়টা অবিলম্বে চাপা দিতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন। আসল কারণ যে তা নয়, এটা তিনি জানতে পারেন অনেক পরে। দিল্লীর যে বড়তর-কর্তা ওঁর পদত্যাগপত্রটায় 'এ্যাক্সেপ্টেড'

বলে সই দিলেন তৎক্ষণাৎ, কোন অনুসন্ধান না করেই, তাঁর একটি ভাইপো মনস্তত্ত্বের একটি মামুলী দেশী ডিগ্রি নিয়ে বেকার বসেছিল।

সে যাই হোক, এমন সুখরোচক খবরটা চাপা থাকল না। হাসপাতালের ভিতরে এবং বাইরে পল্লবায়িত হয়ে সংবাদটা ঘূর্ণি হাওয়ার বেগে ছোটাছুটি করতে থাকে। একদিন সদারঙ্গনীর বাড়িতে দেখা করতে এলেন পাগল ছেলেটির বাবা হীরক-ব্যবসায়ী প্রেমচাঁদ সিং। প্রশ্ন করলেন তিনি, আপনি কি শ্যামসুন্দরকে ভাল করে দিতে পারেন?

—তার আগে বলুন ওঁরা কতদূর কি পারবেন বলেছেন?

—ওঁরা বলেছেন, এ রোগ ভাল হবার নয়। তাকে চিরকাল ওখানেই আটক রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অবশ্য পেয়িং বেড-এ।

—আর আমি বলছি, ও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে উঠবে আমার নির্দেশমত চিকিৎসা করলে। দুই থেকে আড়াই বছর। ম্যাক্সিমাম তিন বছর। গ্যারান্টিড।

—আপনি ওর দায়িত্ব নিতে রাজী আছেন?

—আছি। অনেক খরচ পড়বে কিন্তু আপনার।

—কত? পঞ্চাশ হাজার? এক লাখ?

—না না—অত হবে কেন!

—আপনি ওর ভার নিন ডাক্তার সা'ব। আপনি তো চাকরি ছেড়েই দিয়েছেন। নতুন চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত এখানে আপনি যা পাচ্ছিলেন তাই আমার কাছ থেকে নিয়ে আপনি চেষ্টা করে দেখুন। আর যদি শ্যামসুন্দরকে আপনি আবার ভাল করে দিতে পারেন, না ডাক্তার সা'ব, আপনিই বলুন তাহলে আপনাকে কী দিতে হবে—

—আমাকে সেজন্য এক কপর্দকও দিতে হবে না। তবে কথা দিন, যদি আপনার ছেলেকে ভাল করে দিতে পারি, তাহলে এমন একটা হাসপাতাল আপনি তৈরী করে দেবেন যেখানে আমি নিজের ইচ্ছায় চিকিৎসা করতে পারি।

সদারঙ্গনীর হাত দুটি ধরে ধনকুবের বলেছিলেন, আমি রাজী!

কাহিনী শেষ করে সদারঙ্গনী হাসলেন।

শ্রবণা বলে, তারপর?

সদারঙ্গনী বলেন, তারপর আবার কি? গল্পের তো এখানেই শেষ!

—সে কি! শ্যামসুন্দরের তারপর কি হল?

—সে প্রশ্ন অবান্তর! ছোট গল্পের তো এইভাবেই শেষ হয়!

অলকা বলে, কিন্তু গল্পের নাম যে "করুণাময়ী স্যাঙচুয়ারী"? করুণাময়ী চরিত্রটাই তো এল না।

পাইপ থেকে ছাইটা ঝাড়তে ঝাড়তে সদারঙ্গনী বলেন, করুণাময়ী হচ্ছে শ্যামসুন্দরের মায়ের নাম। প্রেমচাঁদ সিংজীর স্বর্গগতা স্ত্রী।

শ্রবণা বলে, অর্থাৎ করুণাময়ী স্যাংচুয়ারি হচ্ছে সিংজীর কাছে—তাজের স্বপ্ন!

সদারঙ্গনী হাসলেন শুধু।

প্রিয়দর্শী কিন্তু কিছু বল্‌লে না। সে ভাবছিল ঐ কথা কয়টা—'ছোট-গল্পের তো এইভাবেই শেষ হয়।' কথাগুলো আগেও যেন সে শুনেছে কোথায়! সে কেমন যেন অন্যমনস্ক উদাস হয়ে যায়।

শুভদিনের আর মাত্র দিন চারেক বাকি। নানান রকম আয়োজন হচ্ছে। শ্রবণার কেমন যেন লজ্জা করে! রাগ হয় প্রিয়দর্শীর উপর। কী দরকার ছিল বাপু প্রথমেই এখানে এসে ওঠার? ডাক্তার-সাহেবের অনর্থক কতকগুলো অর্থদণ্ড। অবশ্য তিনি আপন সখেই করছেন সব কিছু। নির্ঝঞ্ঝাট ব্যাচিলার মানুষ, এই উপলক্ষে হয়তো পাচজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে চান। অনেকের ছেলেমেয়ের বিয়েতে গিয়েছেন এতদিন—এই সুযোগে তার একটা প্রতিদান দিতে চান হয়ত। প্রিয়দর্শীকে তিনি পুত্রের মতই স্নেহ করেন।

দিনের বেলায় প্রিয়দর্শীর সঙ্গে শ্রবণার দেখাই হয় না প্রায়। সারাদিন খেয়ালী মানুষটা তার স্কেচ্ বই নিয়ে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ায়। স্কেচ্ আঁকে, ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকে। নেহাৎ না হ'লে অবিনাশদা, ভাণ্ডারী সা'ব, পাণ্ডেজীদের আসরে গিয়ে জাঁকিয়ে বসে। শ্রবণার লজ্জা করে ওর কাছে যেতে। সবাই যে ওদের চেনে। সবাই যে জেনে ফেলেছে ওদের বিয়ে হবে। প্রিয়দর্শীর ঘরের দিকে পা বাড়ালেই অলকা মুখ টিপে হাসে!

আর সন্ধ্যার পর তো সদারঙ্গনী সাহেবের ব্যবস্থাপনায় চথা এপারে, চথী ওপারে। দুঘরের মাঝে দরজা নেই। বারান্দা পার হ'য়ে ও ঘরে যেতে কেমন যেন লজ্জা করে। গল্পের বই পড়ে কাটিয়ে দেয় সন্ধ্যাটা। কখনও অলকার হাতে হাতে কাজ করে। কখনও বা রান্নাঘরে গিয়ে হানা দেয়।

আশ্চর্য মানুষ প্রিয়, ভাবে শ্রবণা। শ্রবণা মেয়েমানুষ, তার না হয় লজ্জা করে—ও তো আসতে পারে। কিন্তু সেও কেমন যেন পালিয়ে পালিয়ে

বেড়াচ্ছে। ধরা দেবার দিন যতই এগিয়ে আসছে ততই যেন প্রিয়দর্শী গুটিয়ে নিচ্ছে নিজেকে। হাতে কাজ থাকে না, শ্রবণা তাই বসে বসে রোমন্থন করে ওদের পূর্বরাগের পালাটা। ট্রেনের কামরায় ওর বৈশাখী চরিত্রে অভিনয়, স্টুডিওর চত্বরে প্রিয়দর্শীকে চিনতে না পারা, এলিফেণ্টা গুহায় সূর্যাস্তের দিকে মুখ ক'রে ওর গান গাওয়া—আর সবচেয়ে বেশি করে মনে পড়ে সেই অদ্ভুত রাত্রিটার কথা—যে রাত্রে সব বাধা-বিঘ্ন অস্বীকার ক'রে শ্রবণা পাগলের মত ছুটে গিয়েছিল প্রিয়দর্শীর কাছে। আচ্ছা সে রাত্রে প্রিয়দর্শীর কেন মনে হল এ ঘটনা তার জীবনে আগেও ঘটেছে? এই তো পরশুদিন ওর একই রকম বিভ্রম হয়েছিল হুড দেখতে গিয়ে। খাবারের প্লেটটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে সে নিথর হয়ে গিয়েছিল—সে স্মৃতি তো তার বাস্তব অভিজ্ঞতা। মনে পরিয়ে দিতেই ওর মনে গড়ে গিয়েছিল। তাহ'লে সে রাত্রে মেসে যেকথা প্রিয়দর্শীর মনে হয়েছিল তাও কি তার বাস্তব অভিজ্ঞতা? আরও একটি নারী কি অমনি ভাষায় প্রেম নিবেদন করেছিল প্রিয়দর্শীকে? আরও একটি নারী কি একদিন অমনিভাবে হঠাৎ এসে মনে পড়িয়ে দেবে ওকে? শ্রবণা এ চিন্তাটা সহ্য করতে পারে না! প্রিয়দর্শীর জীবনে আর কোন নারী এসেছিল, আসবে, এটা তার চিন্তা করতেই কষ্ট হয়! এটা ও সহ্য করতে পারবে না! শ্রবণার মনে পড়ে যায়, সে রাত্রে প্রিয়দর্শী ধরা দেয়নি। শ্রবণার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত অস্বীকার করে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল প্রিয়দর্শী। কারণ একটা সে দেখিয়েছিল —কিন্তু সেটাই সত্য তো? অদ্ভুত সংযত ছেলেটা, ভাবে শ্রবণা—আজ পর্যন্ত অনেক সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও ওকে বুকে টেনে নিয়ে একবার চুমো পর্যন্ত খায়নি। বুকটা হঠাৎ দুলে ওঠে! তার কারণ এই নয় তো যে, প্রিয়দর্শী স্বাভাবিক নয়, সাধারণ নয়? তাকে কাছে পাওয়ার জন্য শ্রবণার প্রতি রোমকূপে যে তীব্র কামনা জাগে, ঠিক তেমনি করে কি প্রিয়দর্শীও তাকে কাছে পেতে চায় না? কিন্তু তা কেমন করে হবে? প্রিয়দর্শী নিজেই তো সে রাত্রে বলেছিল, তোমাকে এভাবে এখানে ছেড়ে যেতে হচ্ছে বলে আমার কষ্টটাই কি কম হচ্ছে?

একবার তার সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলতে পারলে হত। ওর কী মনে হচ্ছে, ও কী ভাবছে, ও কী স্বপ্ন দেখছে জানতে ইচ্ছা করে।

সুযোগ হয়ে গেল সেদিন সন্ধ্যাবেলায়। ডাক্তার সাহেব বললেন, সন্ধ্যাবেলায় কী বসে আছ ঘরের মধ্যে? যাও একটু বেড়িয়ে এসো না। প্রিয়টা কোথায় গেল? কি করে সে? আর কিছু না পারুক বিকেল বেলা

তোমাকে নিয়ে একটু বেরিয়েও তো আসতে পারে।

ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকিতে ঘর ছেড়ে প্রিয় বেরিয়ে আসে। বলে, কী আশ্চর্য, আমি কি বলেছি কেউ বেড়াতে যেতে চাইলে সঙ্গে নিয়ে যাব না?

ডাক্তার সাহেব ধমক দেন, তা কেন? তুমি নিজে থেকেও তো প্রস্তাবটা করতে পার?

প্রিয়দর্শী মুচকি হেসে বলে, সাহস পাই না স্যার—কি জানি আপনি যদি বলে বসেন, 'এতদিন যা করেছ করেছ, এখানে ওসব অনাসৃষ্টি চলবে না'।

এবার ডাক্তার সাহেবও হেসে ফেলেন।

ফাঁকায় এসে শ্রবণা বলে, তোমার ব্যাপারখানা কি? সারা দিনে তোমার দেখাই পাওয়া যায়না যে?

প্রিয় বলে, বেশ যা হোক। আমি তো ভেবে রেখেছিলাম, তোমার সঙ্গে দেখা হলে ঐ অভিযোগটাই সবার আগে পেশ করব!

—বেশ মানুষ তুমি!

কথায় কথায় শ্রবণা বলে, আচ্ছা বিয়ের পর আমরা কোথায় যাব?

—নাসিক। বন্ধুকে চিঠি লিখেছিলাম, জবাব দিয়েছে সে, সিংজী আমাকে অবিলম্বে যেতে বলেছেন।

—বন্ধু কে?

প্রিয়দর্শী বলতে থাকে। বন্ধু, প্রীতমদাস ওদের কথা। সিংজীর সিনেমা হল তৈরী হচ্ছে নাসিকে। সেখানে ফ্রেস্কো এঁকে দিয়ে আসার কথা আছে তার। বিয়ের পরই দুজনে নাসিকে চলে যাবে। প্রিয়দর্শী বন্ধুকে জানিয়েছে তার বিয়ের কথা। একটা ছোট বাড়িও দেখে রাখতে বলেছে। পুণ্যভূমি নাসিক তীর্থে ওদের মধুচন্দ্রিমার আয়োজন করেছে বন্ধুবিহারী।

পায়ে পায়ে ওরা অনেকটা চলে এসেছে। প্রিয়দর্শী হঠাৎ বলে, আসল কথাটা জেনে নিয়েছ?

—আসল কথা মানে? ও, না। এখনও আমাকে উনি কিছু বলেননি। তবে যাবার আগে আমাকে সব কথা জানাবেন বলেছেন।

খানিক পরে প্রিয়দর্শী বলে, আচ্ছা 'তাজের স্বপ্ন' কি হবে?

—সব স্বপ্নের যেভাবে শেষ হয়—স্বপ্নভঙ্গে! আমাকে নিয়ে যে কয়শ' ফুট তুলেছে সেটা বাতিল করে আবার তুলতে হবে। কয়েক হাজার টাকা গচ্ছা যাবে দিজেচার। ঠিক হবে। লোকটা অতি বদমায়েস! আমাকে কী বলেছিল জান?

—কী ?

শ্রবণা তখন বলতে থাকে তার সঙ্গে দিভেচার প্রথম সাক্ষাতের কথা। বেদিং কস্টিউম্ পরে মাপ দেবার কথা—তার কদর্য প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতের কথাটা।

প্রিয়দর্শী সব শুনে বলে, ব্রুট! বেটার ঠিক শাস্তি হয়েছে। তাহ'লে আমার ব্যাপারটাও বলি তোমাকে—

—তোমার ব্যাপার মানে ?

—আমি কেন ভয়েস টেস্টে ফেল করে গেলাম।

সে কাহিনী শুনে শ্রবণাও বলে, লোকটা জানোয়ার একটা।

—আচ্ছা, তুমি কি ওর সঙ্গে কণ্ট্রাক্টে সই করেছিলে ?

—হ্যাঁ, কেন বলত ?

—তাহ'লে সে তোমার বিরুদ্ধে মামলা আনতে পারে। খেসারৎ দাবী করতে পারে।

—আমাকে ধরতে পারলে তো ?

—তা বটে !

অন্ধকার হয়ে এসেছে। শীতের রাত। রাঁচির শীত। শ্রবণা বলে, চল, এবার ফেরা যাক্।

—চল।

ফেরার পথে শ্রবণা বলে, শুধু বাপির জন্য দুঃখ হয়। বেচারি সত্যিকারের গুণী, সত্যিকারের শিল্পী।

প্রিয়দর্শী হঠাৎ বলে বসে, না! সত্যিকারের শিল্পী হলে তার 'তাজের স্বপ্নের' এ রূপান্তর সে মেনে নিত না।

—কিন্তু দিভেচার বিরুদ্ধে বাপি কি করতে পারত ?

—অনেক কিছুই! প্রথমতঃ, তার নাম লেখক হিসাবে প্রচার করায় আপত্তি। দ্বিতীয়তঃ, এ জন্য যে সম্মানমূল্য তাকে দেওয়া হয়েছিল সে টাকাটা প্রত্যাখ্যান!

—টাকা হাতে পেয়ে ফেরত দেবার মানুষই নয় সে। এটাই ওর চরিত্রের সব চেয়ে বড় দুর্বলতা। এই পাপেই ও সারাটা জীবন কষ্ট পেয়েছে। টাকা আর মদ, এ দুটোতে ওর বড় আসক্তি।

একটু চুপ করে থেকে প্রিয়দর্শী বলে, এখানেও তোমার ভুল হল শ্রবণা। ওর জীবনের সবচেয়ে বড় পাপ তা নয়। সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি সেটা নয়।

শ্রবণা দাঁড়িয়ে পড়ে। জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকায় প্রিয়র দিকে। প্রিয় বলে,

শাহজাহান সাহেবের জীবনে সবচেয়ে বড় পাপ জেনে শুনে সে তার নিজের মাসতুতো বোনকে নিয়ে—

—থাক্ প্রিয়, তিনি আমার মা!

—মা!—হ্যাঁ তাই তো!—হঠাৎ কেমন যেন নিভে যায় প্রিয়! শ্রবণার হাতখানা টেনে নিয়ে বলে, কী আশ্চর্য! আমার একেবারে খেয়ালই ছিল না। আমার অন্যায় হয়ে গেছে। আমাকে মাপ কর শ্রবণা।

শ্রবণা বলে, চল, ফেরা যাক্ এবার।

যাবার জন্য সে পা বাড়ায়। কিন্তু প্রিয়দর্শী ওর হাতটা ছাড়ে না, বলে, কিন্তু তুমি আমাকে ক্ষমা করে গেলে কিনা বল্‌লে না তো?

শ্রবণা ম্লান হেসে বলে, ক্ষমা করার কথা উঠছে কিসে? তুমি তো সত্য কথাই বলেছ—একদিন সারা চন্দননগর শহর শুদ্ধ লোক তো সেই কথাই বলেছে—

—তা হোক—তবু আমি অন্যায় করেছি! তিনি তোমার মা!

—আমি অবশ্য আমার মাকে দেখিনি, তাঁর ছবি দেখেছি মাত্র—

—জানি শ্রবণা। তুমি গল্প করেছ। শাহজাহান সাহেবের আঁকা সে ছবিটা তোমাদের বাড়িতে আছে। আমিও তো আমার মাকে মনে করতে পারি না। তাঁর ফটোই দেখেছি শুধু। তবু সেই মায়ের নামে যদি কেউ এভাবে বল্‌ত আমি সহ্য করতে পারতাম না।

হাতটা ধরাই থাকে। ওরা বাড়ির দিকে ফিরে চলে। উত্তর আকাশে সবে উদয় হচ্ছে সপ্তর্ষি। বশিষ্ঠ আর অরুন্ধতি।

পরদিন ডাক্তার সদারঙ্গনী শ্রবণাকে ডেকে পাঠালেন নিজের ঘরে। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বলেন, তোমাকে আমার যেটুকু বলার আছে এইবেলা বলে নিই। আমি প্রিয়র কেস্‌টার কথা বল্‌ছি। অফিস থেকে ওর ফাইলটা নিয়ে এসেছি। তবে ফাইলের দরকার হবে না। সমস্ত কেসটা আমার পরিষ্কার মনে আছে।

ডাক্তার সাহেব কেস হিস্ট্রিটা বলে যান অতঃপর।

প্রায় সাত আট বছর আগেকার কথা। একদিন সকালে বসে আছেন চেম্বারে, বেয়ারা একটা কার্ড এনে দিল হাতে। দামী আইভরি-ফিনিস কার্ড, মনোগ্রাম করে লেখা নাম—বিনয়কৃষ্ণ দত্তরায়। ডেকে দিতে বল্‌লেন চাকর-টাকে। পরমুহূর্তে ঘরে ঢুকলেন একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। মাথার চুলগুলো

পিছনে ফিরানো—কালোর চেয়ে সাদাই বেশী। গিলে করা পাঞ্জাবি, কোঁচানো ধুতি, কালো পামসু। কাঁধে দামী শাল, হাতে মোষের শিং-এর হাতল লাগানো সৌখীন ছড়ি। তাঁর চেহারায় বেশ একটা আভিজাত্যের ছাপ।

নমস্কারান্তে সামনের চেয়ারখানায় বসলেন ভদ্রলোক। হাতের ছড়িটা পাশে ঠেকিয়ে রাখেন, শালখানা নামিয়ে রাখেন চেয়ারের হাতলে। তারপর পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা সুগন্ধি রুমাল বার করে চশমার কাচটা মুছতে থাকেন।

—আমি আপনার কি করতে পারি বলুন।

—একটি ছেলেকে আপনার এখানে ভর্তি করতে চাই।

—আপনার ছেলে?

—আজ্ঞে না—আমার কেউ নয়। আমার পরিচিত মাত্র। বছর সতেরো বয়স হবে ছেলেটির। পাগল হয়ে গেছে।

—কতদিন মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ লক্ষ্য করেছেন আপনারা?

—আজ প্রায় মাস তিনেক।

—হঠাৎ এমন হয়ে যাবার কী কারণ থাকতে পারে বলে মনে করেন?

—সব কথাই আপনাকে খুলে বলব। আপনি শুধু কথা দিন ওকে ভর্তি করে নেবেন।

—সব কথা না শুনে তা কেমন করে বলব আমি? ধরুন, আমি যদি মনে করি সে সম্পূর্ণ সুস্থ, কিংবা চিকিৎসার বাইরে—তাহলে কেন তাকে এখানে ভর্তি করতে যাব?

ভদ্রলোক চশমা জোড়া নাকের উপর বসিয়ে বলেন, ঠিক কথা। তাহলে কেসটা আপনাকে খুলেই বলি। আপনি কেসটা নিন না নিন, আমি যা বলছি তা গোপন থাকবে তো?

—নিশ্চয়ই।

এ আশ্বাস পেয়ে ভদ্রলোক বিস্তারিত বলে গেলেন তাঁর কাহিনী:

—আমি পূর্ববঙ্গের জমিদার। অবশ্য কাশীতেই বাস করছি দীর্ঘদিন। গঙ্গাতীরে চৌষট্টি যোগিনী ঘাটে। জমিদারীর আয়ে আমার অর্থের কোন অভাব নেই, কিন্তু সংসারে শান্তিও নেই আমার! তিনটি সন্তান হয়েছিল—তার একটি বিকলাঙ্গ, দ্বিতীয়টি জন্মান্ধ। ছোট ছেলেটির দৈহিক কোন বিকলতা নেই বটে, কিন্তু সেও মানুষ হয়নি।

ডাক্তার সাহেব বাধা দিয়ে বলেছিলেন, আপনার বংশে উপদংশ রোগে

কেউ ভুগেছিল কখনও ? আপনার নিজের—

বিনয়কৃষ্ণ বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, যে ছেলেটিকে আপনার কাছে রেখে যেতে চাই সে কিন্তু আমার বংশের কেউ নয়—

—এ কথা আপনি আগেও বলেছেন। বেশ বলে যান—

—ছেলেটি আমাদের বামুনদির ছেলে। বামুনদি সধবা মানুষ, ঐ একটিই সন্তান। আমার বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন মাস ছয়েক আগে। তার আগে কোথায় ছিলেন, তাঁর স্বামীর নাম কি, কোথায় থাকেন, আমি কিছুই জানি না। কাশীতে এমন স্বামীত্যক্তা কত অনাথাই তো বাস করে। বছর তেত্রিশ চৌত্রিশ বয়স হবে তাঁর। রীতিমত সুন্দরী ছিলেন তিনি। অতটা বয়স হয়েছে, অতবড় ছেলে আছে তা তাঁকে দেখে বোঝা যেত না। আমার ছোট ছেলেটির বয়সও ঐ রকম, বছর ত্রিশ-বত্রিশ। আগেই বলেছি তার স্বভাব-চরিত্র ভাল ছিল না। তাই এই মহিলাটিকে বহাল করতে প্রথমটায় আমি রাজী হইনি। কিন্তু ঘটনাচক্রে এবং দয়াপরবশ হয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁকে স্থান দিতে বাধ্য হই। ছেলেটি বেশ বুদ্ধিমান, বিনয়ী এবং সচ্চরিত্র—বাজার-হাট করত, ফাই-ফরমাস খাটত। সে পড়ত একটু নিচু ক্লাসে—সতেরো বছর বয়সে ক্লাস এইটে। মেধাবী ছাত্র,—ওর মা বলত অর্থাভাবে স্কুলে ভর্তি করাতে দেরী হয়েছে।

মাসখানেকের মধ্যেই বুঝতে পারলাম কাজটা ভাল করিনি। ও আগুন বাড়ির ভিতর না আনাই উচিত ছিল। বছর দুই আগে আমার ছোট ছেলেটির বিয়ে দিয়েছিলাম। তাই আশা ছিল এবার বুঝি তার স্বভাব পালটাবে। কিন্তু সে সুখ আমার কপালে লেখেননি বিশ্বনাথ। যাই হোক আমার দুঃখের কাহিনী আর বিস্তারিত করে কি লাভ ? সংক্ষেপেই বলি, যে অংশটা আপনি বিস্তারিত জানতে চান আমাকে প্রশ্ন করবেন বরং।

মাস তিনেক আগে মধ্যরাত্রে একটা চেঁচামেচিতে আমার ঘুম ভেঙে গেল। প্রথমটা বুঝতে পারিনি কি ব্যাপার। আমি দ্বিতলে থাকি। আমার পরিবারের সকলেই দ্বিতলে থাকে। একতলায় রান্নাঘর, খাবারঘর, স্নানের ঘর, ঠাকুরঘর এবং চাকর বাকরেরা শোয়। সে রাত্রে সামনের মাঠে রামলীলা হচ্ছিল—চাকর বাকরেরা তাই শুনতে গেছে। মনে হল চেঁচামেচিটা একতলা থেকে আসছে। তাড়াতাড়ি চটিটা পায়ে গলিয়ে দরজা খুলে নিচে নেমে গেলাম। সিঁড়ির পাশেই একটা ছোটঘরে থাকতেন ঐ বামুন দি। দিনের বেলা সেটা আমাদের ঠাকুর ঘর। শিবলিঙ্গ ছিল মাটিতে গাড়া। তাঁর ঘরের

দরজাটা খোলা। সিঁড়ির নিচে উবুড় হয়ে পড়ে আছেন আমার ছোট পুত্রবধূ তার মাথায় জল দিচ্ছে বিজয়, মানে আমার ছোট ছেলে।

চমকে উঠে বলি, এ কি! বৌমা এখানে পড়ে কেন?

বিজয় জবাব দিল না। চোরের মতন বামুনদির ঘরের ভিতর উঁকি মেরে কী দেখল যেন। সে ঘরে ঢুকে দেখি বামুনদি মেজেতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। তাঁর শাড়িটা টেনে খুলে ফেলার চেষ্টা হয়েছে; গায়ের ব্লাউজটা পিঠের দিকে ছেঁড়া। আর চৌকির ওপাশে তাঁর ছেলেটি পড়ে গেছে। তার পা দুটো শুধু দেখা যাচ্ছে খাটের উপর, মাথাটা চৌকির উল্টো দিকে ঝুলছে —নাক-মুখ দিয়ে রক্তের ধারা মেজেতে পড়ে ভেসে যাচ্ছে! সে এক নারকীয় বীভৎস দৃশ্য। বৌমার জ্ঞান অবশ্য সহজেই ফিরে এল। পরদিন মূর্ছা ভাঙল বামুনদির। মুশ্‌কিল হল ছেলেটিকে নিয়ে। সেই রাত্রেই তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়েছিল। প্রচুর রক্তক্ষরণে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল সে। আঘাতটা লেগেছিল বামভ্রূর উপরে এবং সম্ভবত মাথার পিছন দিকেও। মনে হয় তাকে বিজয় প্রচণ্ড একটা ঘুষি মেরেছিল কপালে, ফলে মাথাটা তার শিবলিঙ্গে ঠুকে যায়।

সে রাত্রে বস্তুত ঠিক কী ঘটেছিল তা আমি আজও জানি না। বৌমাকে প্রশ্ন করতে প্রবৃত্তি হয়নি। বিজয়কে জিজ্ঞাসা করতে ঘৃণা হয়েছে। বাকি থাকে যে দুজন, তার মধ্যে ছেলেটি হাসপাতাল থেকে ফিরে এল পাগল হয়ে। সে বোবা হয়ে গেল। কথা বলে না, মানুষ চেনে না, হাসে না, কাঁদে না। কী যে হয়েছিল তা একমাত্র বলতে পারতেন ঐ বামুনদি, কিন্তু যেদিন কাশীর বড় ডাক্তারবাবু বললেন ছেলেটি আর কোনদিন কথা বলবে না, সে পাগল হয়েই বেঁচে থাকবে—সেরাত্রেই তার মা আত্মহত্যা করেন।

—ডাক্তার সাহেব, এ ছেলেটি আমার কেউ নয়। তবু একে আপনার কাছে নিয়ে এসেছি। এ আর কোনদিন ভাল হবে না। শুনেছি, আপনার এখানে পাগলদের মারধোর করা হয় না, যত্ন নেওয়া হয়। আপনি ওকে আশ্রয় দিন। পুলিশ কেস চালায়নি। ছেলেটি পাগল হয়ে যাওয়াতেই যে তার মা আত্মহত্যা করেছিলেন এটাই প্রমাণ হয়েছিল—ছেলেটি যে কেন পাগল হয়ে গেল সে প্রশ্ন যাতে না ওঠে সে ব্যবস্থা করেছিলাম আমি। বেশ কিছু খরচ হয়ে গেছে আমার। আপনার কাছে সবই অকপটে স্বীকার করব। সে যা খরচ করেছি তা আমার বংশের সুনাম বাঁচাতে। কিন্তু বিবেককে কি বলে প্রবোধ দিই?

ডাক্তার সদারঙ্গনী বললেন, ছেলেটি কোথায়?

—বাইরেই বসে আছে আমার এক কর্মচারীর হেপাজতে।

—নিয়ে আসুন তাকে। আগে কেসটা দেখি। প্রিয়দর্শীকে পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে পরীক্ষা করে ডাক্তার সাহেব আবার বিনয়কৃষ্ণর কাছে ফিরে এলেন। বললেন, খুবই কঠিন কেস। তবে একেবারে হতাশ আমি হইনি। ভাল হতে এর সাত আট বছর লেগে যেতে পারে—

—ভাল হবে ও? সত্যি বলছেন?

—হবেই, এ কথা বলছি না। হলে আশ্চর্য হব না। মোট কথা কেসটা আমি হাতে নিতে রাজী আছি।

—আহ্! বাঁচালেন আমাকে। আপনাকে মাসে কত করে টাকা দিতে হবে?

—মাসে নয়, আমাকে নগদে দশহাজার টাকা দিতে হবে।

—দ-শ-হাজার! চমকে ওঠেন বিনয়কৃষ্ণ—ইন্সটলমেণ্টে হয় না?

—না, হয় না। আমি আন্দাজ করছি ওর ভাল হতে আট বছর লাগবে। মাসিক একশ টাকা হিসাবে খরচ হলে আট বছরে প্রায় হাজার দশেক টাকাই হয়। আপনি আট বছর না বেঁচে থাকতে পারেন। অথচ ওর চিকিৎসা যদি আমি শুরু করি তবে শেষ পর্যন্ত আমাকে দেখতে হবে। মাঝপথে আপনি ইন্সটলমেণ্ট দিলেন না বলে ছেলেটিকে আমি গেটের বাইরে পাঠিয়ে দিতে পারব না।

বিনয়কৃষ্ণ একবার শেষ চেষ্টা করেন, দেখুন ডাক্তার সাহেব, ছেলেটিকে আমি যে কোন স্টেশনে নামিয়ে দিয়ে হাত ধুয়ে বাড়ি যেতে পারতাম। যে কোন তৃতীয় শ্রেণীর পাগলা গারদে অনেক কম খরচে ওকে ঢুকিয়ে দিতে পারতাম—সে সব কিছুই আমি করিনি। আপনার নাম শুনে সেই কাশী থেকে এতদূর নিজে এসেছি ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে—আপনি যদি একটু বিবেচনা করেন—

ডাক্তার সদারঙ্গনী কঠিন স্বরে বলেন, আমার বক্তব্য আমি বলেছি, এখন আপনার বিবেক যা বলে তাই করুন। ফেরার পথেও ঐ পরের ছেলেটিকে যে কোন স্টেশনে নামিয়ে দিয়ে আপনি হাত ধুয়ে বাড়ি যেতে পারেন আজ, তাতে নিজের ছেলের জন্য আরও দশহাজার টাকা ভবিষ্যতে ব্যাঙ্কে রেখে যেতে পারবেন আপনি!

বিনয়কৃষ্ণ মাথাটা নিচু করেন। তারপর মাথাটা তুলে আবার বলেন, এ তিরস্কার আমার প্রাপ্য। আমি আপনার প্রস্তাবে রাজী। দশহাজার টাকার চেকই দিয়ে যাচ্ছি আমি। কিন্তু একটা কথা! আপনি আমাকে মুক্তি দিলেন তো?

—এ কথার মানে ?

—তার মানে আপনি কি ধরনের মানুষ তা জেনেই আপনার কাছে ছুটে এসেছি। তাই আপনার আদালতে অসঙ্কোচে আত্মসমর্পণ করে বিচার চাইতে এসেছি। আপনার শাস্তি আমি মাথা পেতে নিলাম। এবার বলুন, আমার প্রায়শ্চিত্ত এতে হ'ল কিনা।

ডাক্তার সাহেব বলেন, এসব আপনি কি বলছেন ? আমি বিচারক নই।

—আপনিই আমার বিচারক।

হেসে ডাক্তার সদারঙ্গনী বলেছিলেন, বেশ, তাই যদি হয় তাহলে বলি, আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত এখানেই হ'ল—কিন্তু আপনার পুত্রের বিচার বাকি থাকল। আরও উপরে একটি আদালত আছে। সেখানে তাকে আমি দায়রায় সোপর্দ করলাম।

আবার মাথাটা নিচু করেন বিনয়কৃষ্ণ। যেন মাথা পেতে গ্রহণ করলেন এ অভিশাপ। চশমাটা চোখ থেকে খুলে চোখটা মুছে নিয়ে বলেন, কিন্তু ধরুন, যদি আট বছর পরে দেখা যায় ছেলেটি তখনও ভাল হয়নি ?

—সে দায় আমার। আপনাকে আমি মুক্তি দিয়েছি। শুধু তাই নয়, ও যদি পাঁচ ছয় বছরে ভাল হয়ে ওঠে তবে মাসিক একশটাকা হিসাবে টাকা কেটে নিয়ে বাকি টাকা আপনাকে আমি ফেরতও পাঠাবো !

—না, না, না ! প্রায় চীৎকার করে ওঠেন বিনয়কৃষ্ণ। বলেন, না, ডাক্তার সাহেব। সে ক্ষেত্রে বাকি টাকাটা দান হিসাবে লিখে নেবেন আপনার চাঁদার খাতায়। আপনার আদালতে দশহাজার টাকা জরিমানা হয়েছে আমার—ও টাকার এক কপর্দকও আমি ফেরত দিতে পারব না !

—বেশ তাই হবে !

ডাক্তার সাহেব থামতেই শ্রবণা বলে, তারপর ?

—তারপর থেকে প্রিয়দর্শী আমার কাছেই মানুষ হয়েছে। ওর কেসটা বড় অদ্ভুত। প্রথম দু-তিনমাস ও কথাই বলেনি। ছেলেটা হাসে না, কাঁদে না, কথাও বলে না। কোন উপদ্রব নেই। অতি শান্ত প্রকৃতির। মেলাঙ্কোলিয়া নয়, ওর সমস্ত চেতনাই অসার হয়ে গিয়েছিল। খেতে দিলে খায়—না দিলেও খেতে চায় না। প্রায় তিনমাস অক্লান্ত পরিশ্রম করার পর একদিন ওর মুখে কথা ফুটল। ও প্রথম কথা কি বলেছিল আন্দাজ করতে পার ?

—না। কী ?

—মানুষ মাত্রেই প্রথম যে শব্দ উচ্চারণ করে—'মা'! ওর সমস্ত কেসটা লিখে রেখেছি এই ফাইলে। যদি জানতে চাও কবে ও প্রথম 'মা' বলেছিল, তাও বলে দেওয়া যায়। ক্রমে ক্রমে ও আম-জাম-জল-বাড়ি-গাড়ি সব চিনল, সব উচ্চারণ করতে পারল। আর সব কিছুই স্বাভাবিক হয়ে এল ওর, এল না কেবল স্মৃতি। অন্যান্য কমপ্লিকেশন্সের সঙ্গে ওর যা হয়েছিল, তাকে বলে 'ট্রম্যাটিক্ এ্যামনেশিয়া'। আঘাতজনিত কারণে স্মৃতি বিভ্রম।

ডাক্তার সাহেব বুঝিয়ে বলতে থাকেন, এ রোগে যে ভোগে তার স্মৃতিকে সরাসরি জাগরূক করতে নেই। তাকে বলতে নেই—তোমার নাম অমুক, তোমার বাড়ি অমুক জায়গায়, মনে পড়ছে? বরং ঘুর পথে তাকে সে পথে চালিত করতে হয় যাতে তিল তিল করে আপনা থেকেই তার স্মৃতি তির্যক পথে ফিরে আসে। এমনও দেখা গেছে আবার একটা নূতন আঘাতে তার স্মৃতি ফিরে এসেছে। এ ক্ষেত্রে ডাক্তার সাহেব ওর নাম ধাম পূর্বকথা নিজেই কিছু জানেন না। কী করবেন? শেষে তিনি বিনয়কৃষ্ণের বাড়িতে গেলেন। ওদের কাশীর বাড়ির পাড়ার, গঙ্গার ঘাটের নানান ফটো তুলে নিয়ে এলেন। এতদিনে প্রিয়দর্শী সব কথাই প্রায় বলতে শিখেছে। ভাষা ফিরে পেয়েছে। শিব-দুর্গা-কালী-গণেশের ছবি দেখলে বলে দিতে পারে। আর পাঁচখানা গণেশের ছবির সঙ্গে মিশিয়ে ওদের সেই কাশীর গলির সামনে তোলা ঢুণ্ডি-গণেশের ফটোটা মেলে ধরে প্রশ্ন করেন ডাক্তার সাহেব। অন্যান্য সবগুলোই চিনে ফেলে প্রিয়দর্শী, ওদের পাড়ার সেই ঢুণ্ডি-গণেশের ছবিতে এলেই আটকে যায়। কথা বলে না। আর পাচখানা বাড়ির ছবি দেখলে বলে 'বাড়ি,' কিন্তু ওদের কাশীর বাড়ির ছবিখানা দেখলেই চুপ করে যায়। জবাব দেয় না। ওর মনের গভীরে নির্জ্ঞান আর অবচেতন মনের দ্বন্দ্ব চলেছে নিয়ত। ডাক্তার সাহেবের ধারণা হল, বোধকরি ঐ বাড়ি, ঐ পাড়া, ঐ পরিবারের কথাটা ভুলে থাকার একটা তাগিদ আছে রোগীর অবচেতন মনে। হয়তো দুর্ঘটনার রাত্রে সে এমন একটা কিছু গ্লানিকর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছিল, যা ও চাইছে নির্জ্ঞান মনের গভীরে ধামা চাপা দিতে।

ডাক্তার সাহেব মতটা বদলালেন। পথটাও। স্থির করলেন, রোগী যদি তার অতীত অধ্যায়ের কথা ভুলে থাকতে চায়, তাহলে তাকে সেটা ভুলে যেতে দেওয়াই তো মঙ্গলকর। সেটুকু বাদ দিয়েই যাতে প্রিয়দর্শী স্বাভাবিক হয়ে ওঠে সেই চেষ্টাতেই মনোনিবেশ করলেন অতঃপর। এরপর থেকে প্রিয়দর্শীর দ্রুত উন্নতি হতে থাকে। অঙ্ক শেখে, হিন্দী শেখে, ইংরাজি শেখে—দেশ বিদেশের

জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানান বই পড়ে। ছবি আঁকার দিকে ওর একটা সহজাত প্রবণতা ছিল। একজন চিত্রশিল্পীকে পেয়ে গেলেন ঘটনাচক্রে। তিনিই ছবি আঁকা শেখানোর ভার নিলেন।

শ্রবণা বলে ওঠে, আচ্ছা, ওঁর মায়ের একখানা ফটো ছিল—

—হ্যাঁ, সেটার কথা বলা হয়নি। আমি যখন কাশী গিয়েছিলাম, তখন ওর মায়ের যা কিছু জিনিসপত্র ছিল নিয়ে আসি। তারমধ্যে ছিল ঐ ফটোখানা। ভারী আশ্চর্যের কথা, ঐ ছবিখানাকে সে স্বীকার করে নিল। কাশীর বাড়ির যাবতীয় স্মৃতিকে প্রত্যাখ্যান করলেও ঐ ছবিখানাকে সে আঁকড়ে ধরল। শোকে তাপে মুহ্যমান বুড়ি যেমন সব হারানোর দুঃখ ভুলতে ছোট্ট গোপালকে আঁকড়ে ধরে, ও যেমনি ঐ ফটোখানাকে আঁকড়ে ধরল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেটার দিকে তাকিয়ে বসে থাকত। বালিশের নিচে ছবিখানা না রাখলে ওর ঘুম হতনা!

—আচ্ছা, এমন কেন হল? ও যদি কাশীর বাড়িকে ভুলেই থাকতে চায় তবে এ ছবিখানাকে সে স্বীকার করে নিল কেন?

ডাক্তার সাহেব একটু ভেবে নিয়ে বলেন, ঠিক কারণটা বলা কঠিন। তবে আমার একটা থিয়োরি আছে। প্রিয়দর্শী হয়তো তার বাপকে কখনও দেখেনি। মা-কে সে পুরোপুরি নিজের করে পেয়েছিল। প্রচণ্ড ভালবাসত মাকে। তারপর হয়তো সেরাত্রে সে এমন কিছু দেখেছিল যাতে সেই মায়ের উপর থেকে তার মনটা ঘুরে যায়। এ ছবিটা মায়ের কুমারী জীবনের। ত্রিশ বছরের বাস্তব মায়ের কাছ থেকে প্রতিহত হয়ে ও এই মায়ের ছবিটার মধ্যে ওর ভালবাসার মাকে খুঁজে পেল। এই প্রতীকটাই হল ওর নতুন মা। জানি না, আমার এ ধারণা ঠিক কিনা। তবে এমন হওয়া অসম্ভব নয়। ছবিখানা সে কখনও কাছ ছাড়া করত না। এখনও ওর কাছে আছে।

শ্রবণা বলে, না, ডাক্তার সাহেব, ছবিখানা ওর কাছে নেই। চুরি গেছে। আমি সেটা দেখিনি।

—তাতে ক্ষতি হয়নি কিছু। ওর ডুপ্লিকেট আমার কাছে আছে।

—আছে। ডুপ্লিকেট আছে?

—হ্যাঁ আছে। কোথায় আছে অবশ্য খুঁজে দেখতে হবে। যখন বুঝলাম, ঐ ছবিখানাই ওর নবজীবনের ভারকেন্দ্র তখন আমি আর কোন রিস্ক নিইনি। পাছে ছবিখানা সে হারিয়ে ফেলে তাই ছবিটার নেগেটিভ করিয়ে রেখেছি।

—আমাকে এককপি প্রিন্ট দেবেন ?

—তুমি কী করবে ? ও বুঝেছি !—হাসেন ডাক্তার সাহেব। বিয়ের রাতে সেটাই উপহার দিতে চাও, তাই না ?

শ্রবণা লাজুক হাসি হাসে !

ডাক্তার সাহেবও ছেলেমানুষের মত হাসেন, বলেন, এক কাজ করি, কোন ফটোগ্রাফারকে দিয়ে ওটা এনলার্জ করিয়ে আনি। তারপর সেটা লুকিয়ে এনে তোমাকে দেব। তুমি ওকে উপহার দেবে। বেশ মজা হবে।

পরদিন সন্ধ্যায় ওরা চারজনে তাশ খেলতে বসেছে। শ্রবণা আর প্রিয়দর্শী একদিকে, আর তার বিপরীতে বসেছেন ত্রিবেদী আর অলকা। খেলাটা বসেছে প্রিয়দর্শীর ঘরে। রামদয়াল সেইমাত্র চা আর মুড়ি-পেঁয়াজির পাত্রটা নামিয়ে দিয়ে গেছে। খেলা জমে উঠেছে বেশ। হঠাৎ ঘরে ঢুকলেন ডাক্তার সাহেব। তাঁর বগলে একটা কাগজে-জড়ান ছবি। এসেই হাঁক পাড়েন, শ্রবণা, এ ঘরে এস।

ত্রিবেদী বলে, একটু পরে স্যার। বসুন আপনি। এই মাত্র চা দিয়ে গেল।

—চা জুড়িয়ে গেলে আবার দেবে। এস তুমি।

ডাক্তার সাহেবের বগলে কাগজের প্যাকেটটা দেখেই শ্রবণা ব্যাপারটা আন্দাজ করেছে। ফটোখানা এনলার্জ হয়ে এসেছে। তারও আর সবুর সইছে না। হাতের তাশটা উবুড় করে রেখে বেরিয়ে আসে বাইরে। সদারঙ্গনী ওকে নিয়ে পাশের ঘরে ঢোকেন। পাছে আর কেউ এসে এই গোপন ব্যাপারটা জেনে ফেলে তাই দরজার ছিটকিনিটা বন্ধ করে দেন। তারপর বলেন, সুন্দর এনলার্জ করেছে ছবিখানা ! আসলে এটা ওর মায়ের ফটো নয়, মায়ের একখানা পোর্ট্রেটের ফটো।

কথা বলতে বলতেই কাগজের মোড়কটা খুলে ফেলেন। ফুলসাইজ এনলার্জমেণ্টখানা একটু দূরে ধরেন আলোর সামনে। প্রথমটা ওঁর নজর ছিল হাতের ছবিখানার দিকে। তারপর শ্রবণার দিকে তাকিয়েই চমকে ওঠেন ডাক্তার সাহেব। শ্রবণার চোখ দুটো যেন অক্ষি-কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে ; হাত পা থর থর করে কাঁপছে তার। কী হল ওর ? শ্রবণা ছুটে এসে কেড়ে নিল ছবিখানা। ঝুঁকে পড়ে কি যেন দেখল। কয়েকটা মুহূর্ত যেন বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর সবলে ছবিখানা জড়িয়ে ধরল বুকে।

—কী হল? অমন করছ কেন?—বলে ওঠেন ডাক্তার সাহেব।

শ্রবণা কোন জবাব দেয় না। চোখ দুটো বুজে আসে ওর। খাড়া দাঁড়িয়ে ছিল সে। সংজ্ঞা হারিয়ে সশব্দে আছাড় খেয়ে পড়ল মাটিতে।

প্রথমটা ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছিলেন সদারঙ্গনী। কিন্তু পরমুহূর্তেই তিনি ঝুঁকে পড়েন ওর উপর! জ্ঞান নেই তার। এদিকে দ্বারে করাঘাত হচ্ছে। পতন-জনিত শব্দে ওরাও ছুটে এসেছে বোধহয়।

—ডাক্তার সাহেব! কি হয়েছে?

সদারঙ্গনী বুঝতে পারেন ঐ ছবিখানার মধ্যেই রয়েছে কিছু দুর্জ্ঞেয় রহস্য। ছবিখানাকে প্রথমেই তিনি সরিয়ে ফেলেন। তারপর খুলে দিলেন দরজা।

—শ্রবণা হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গেছে।

—পড়ে গেছে? কেন? কি করে? হিষ্টিরিয়া ছিল নাকি ওর?

প্রিয়দর্শী কুঁজো থেকে জল নিয়ে এসে মাথা মুখে ছিটায়। ডাক্তার সাহেব শ্রবণাকে কোলপাঁজা করে তুলে দিলেন বিছানায়। টেবিল ফ্যানটা এনে ত্রিবেদী বসিয়ে দিলেন মাথার কাছে। অলকা কোথা থেকে একটা স্মেলিং সল্টের শিশি নিয়ে নাকের কাছে ধরতে যাচ্ছিল। কি ভেবে বাধা দিলেন ডাক্তার সাহেব। ওর নাড়িটা দেখলেন। তারপর বলেন, ভয় নেই। তোমরা যাও, আমি দেখছি। অলকা একটু ব্র্যাণ্ডি মেশানো গরম দুধ নিয়ে এস। আর হট-ব্যাগ পায়ে দিতে হবে।

কেন এমন ঘটল, কি হয়েছে কেউ কিছু আন্দাজ করতে পারে না। সবাই বেরিয়ে যেতেই ডাক্তার সাহেব শ্রবণার নাকের কাছে স্মেলিং সল্টের শিশিটা ধরলেন। অল্প পরেই জ্ঞান হল শ্রবণার। অবোধদৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে সে।

—কথা বল না। চুপ করে শুয়ে থাক।

অলকা ইতিমধ্যে ব্রাণ্ডি মেশানো দুধ নিয়ে এসেছে। নিজে হাতে ডাক্তার সাহেব সেটা খাইয়ে দিলেন রোগিনীকে। ত্রিবেদী আর প্রিয়দর্শী আবার এসে দাঁড়াল দরজার কাছে। পায়ের কাছে রাখা হল হট-ব্যাগ।

হঠাৎ রুক্ষস্বরে ডাক্তার সাহেব চাপা ধমক দেন, লেট দি পেসেণ্ট বি এলোন! কেউ আসবে না এ ঘরে। অলকা, তুমিও যাও।

এ আদেশ অমোঘ। কিছু একটা ঘটেছে। কী ঘটেছে তা কেউ আন্দাজ করতে পারছে না। অলকা নার্স। তার স্থানত্যাগের প্রশ্ন ওঠে না। তবু ওঁর আদেশমাত্র সকলে চলে যায় ঘর ছেড়ে। ডাক্তার সাহেব দরজাটা বন্ধ

করে দিয়ে ফিরে আসেন, বলেন, এখন একটু সুস্থ বোধ করছ!

হঠাৎ ডাক্তার সাহেবের দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে শ্রবণা। সে কান্নার কোন ভাষা নেই, কোন শব্দ নেই। পিঠটা শুধু কেঁপে কেঁপে উঠছে। নিরুদ্ধ যন্ত্রণার নিঃশব্দ ক্রন্দন। ডাক্তার সাহেব কোন বাধা দিলেন না। ওকে প্রাণভরে কাঁদতে দিলেন। প্রায় পনের মিনিট ঐভাবে পড়ে থেকে মুখ তুলল শ্রবণা। যেন অন্য মানুষ!

—এখন আর কোন কষ্ট হচ্ছে?

মাথা নেড়ে শ্রবণা জানায়—না।

ওর মাথায় হাত দিয়ে আলতো আদর করে ডাক্তার সাহেব বলেন, কী হয়েছে শ্রবণা! ওঁকে তুমি চেন? তুমি জান, ও ফটোটা কার?

দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা সজোরে কামড়ে ধরে আবার মাথা নাড়ে মেয়েটা। সম্মতি জানায়।

—আমিও তাই ভেবেছি! প্রিয়দর্শীর মাকে তুমি আগেও দেখেছ। নয়?

আবার মাথা নেড়ে শ্রবণা জানায়—সে আগে এঁকে দেখেনি।

—এঁকে তুমি দেখনি কখনও? অথচ চিনতে পেরেছ নিশ্চয়। কে হনি?

থর থর করে কেঁপে ওঠে আবার। কোনক্রমে দাঁতে দাঁত চেপে বলে, আমার মা!

বলেই আবার উবুড় হয়ে মুখটা গুঁজে দেয় ডাক্তার সাহেবের দুই হাঁটুর মধ্যে! কিন্তু এবার আর ওকে নিশ্চিন্তে কাঁদতে দিলেন না উনি। দুটি কাঁধ ধরে খাড়া করে তুলে ধরেন। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলেন, কী! কি বললে? কার মা?

শ্রবণার চোখ দুটি নিমীলিত। অস্ফুটে বললে, আমার মা, মমতাময়ী রায়ের। বাবার আঁকা ছবি!

ছিটকে সরে যান সদারঙ্গনী। খেয়াল করে দেখেন না নিরবলম্ব ওর মাথাটা কি ভাবে লুটিয়ে পড়ল বিছানায়। মুষ্টিবদ্ধ হয়ে ওঠে ডান হাতটা। বাঁ হাতের তালুতে জোরে জোরে ঘুষি মারেন কয়েক ঘা। তারপর পিছনে হাত দিয়ে পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত জোরে জোরে পা ফেলে ঘরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পদচারণা করে ফিরে আসেন। শ্রবণার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলেন, আর য়ু সিওর?

অবসাদে এতক্ষণে ভেঙে পড়েছে শ্রবণা। অশ্রুর উৎস ওর ফুরিয়ে গেছে। আর কাঁদছে না সে। অসাড় হয়ে গিয়েছে যেন। অস্ফুটে বললে, অরিজিনাল

অয়েল পেন্টিংটা আমাদের বাড়িতে আছে। আমার বাবার আঁকা ছবি। তাঁর নামের আদ্য অক্ষর দুটি লেখা আছে ছবিতে, এইচ. আর.। হিমাদ্রী রায়!

—তার মানে তোমরা আপন ভাই-বোন! দিস্ ইস্ প্রিপস্টারাস্!

খাটের বাজুতে প্রচণ্ড একটা মুষ্ট্যাঘাত করলেন উনি। হাতটা ঝন্‌ঝন্ করে উঠ্‌ল। শ্রবণার কোন ভাবান্তর নেই। হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, জীবন-মৃত্যু সব সমান হয়ে গেছে তার কাছে! বেদনার যে তুঙ্গশীর্ষে উঠ্‌লে মানুষ যন্ত্রণাবোধও হারিয়ে ফেলে ও বোধহয় সেই লোকে পৌঁছে গেছে।

প্রিয়দর্শী আর শ্রবণাকে নূতন সম্পর্কে বেঁধে দেওয়ার তো কোন প্রয়োজন নেই। জন্মসূত্রেই ওরা অতি আপন। একই রক্তের ধারা বহছে ওদের ধমনীতে। হিমাদ্রী রায় আর মমতাময়ী রায় ওদের দুজনের জনক ও জননী। দুটি ভাই-বোন ওরা।

প্রায় দু-ঘণ্টা বাদে বন্ধ-দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন সদাবঞ্চনী। এলেন পাশের ঘরে, যেখানে সময় থেমে আছে রাত আটটা সতেরো মিনিটে। ত্রিবেদী, অলকা আর প্রিয়দর্শী বসে আছে তিনটি চেয়ারে। শ্রবণার ফেলে যাওয়া হাতের তাশগুলো তখনও উবুড় হয়ে পড়ে আছে। ওদের মূর্ছা তখনও ভাঙেনি।

ডাক্তার সাহেবের প্রবেশমাত্র ওরা তিনজনই উঠে দাঁড়ায়।

—বড় অদ্ভুত ব্যাপার হ'ল ত্রিবেদী, ওর জ্ঞান হয়েছে—কিন্তু খুব দুর্বল। কথাবার্তা বলছে না। আজ রাতটা ওকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দিতে হবে। কী হয়েছিল, কাল জিজ্ঞাসা করব।

—উনি পড়ে গেলেন কেমন করে?

—কি জানি! ঘরে ঢুকেই দেখি উত্তরের জানলাটা খোলা, ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে সেটা দিয়ে। আমি জানলাটা বন্ধ করতে এগিয়ে গেলাম। পিছন ফিরে জানলাটা বন্ধ করছি—হঠাৎ পড়ে যাওয়ার শব্দ হল। ঘুরে দেখি, শ্রবণা অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে আছে।

অলকা বলে, কিন্তু দরজার ছিটকিনিটা তাহ'লে কে দিল?

—আমিই দিয়েছিলাম। ঘরে ঢুকেই দরজাটা বন্ধ করেছিলাম।

অলকা আর কিছু বলে না। কিন্তু তার দৃষ্টিতে যে প্রশ্নটা ফুটে ওঠে তারই কৈফিয়ৎ হিসাবে ডাক্তার সাহেব যোগ করেন, প্রিয়র জন্য একটা প্রেজেন্টেসান এনেছিলাম, বিয়েতে দেব বলে। সেটা ওকে লুকিয়ে দেখাতে চেয়েছিলাম।

উপহারটা কি তা কেউ জিজ্ঞাসা করে না। প্রিয়দর্শী একটা কথাও বলে না। চুপ করে শুনে যায়।

—তোমরা খাওয়া দাওয়া মিটিয়ে শুয়ে পড়ো। ফ্লাস্কে করে একটু হরলিক্স রেখে যেও বরং। খেতে চাইলে ওকে দেব। আমি আজ ঐ ঘরেই শোব।

—আপনার ডিনার?—প্রশ্ন করে অলকা।

—না রাত্রে আমি খাব না কিছু। খিদে নেই।

আর কথা না বাড়িয়ে ফিরে যান ওঘরে।

নিষ্প্রভাত রাত্রি নেই। সব দুঃখ রজনীর অবসান আছে। বেদনা যতই তীব্র হ'ক, জীবনের দাবী তার চেয়েও বড়। যা সত্য তাকে মেনে নিতে হবে —হোক না কেন সে দুর্বিসহ। শ্রবণার অসার চিত্তে ধীরে ধীরে ফিরে এল চেতনার আভাস। আজকের এই আঘাতই তো শেষ কথা নয়, কালকের কথাও যে তাকে ভাবতে হবে। জীবন তো নাটক নয় যে, বিয়োগান্ত এ ঘটনায় যবনিকা পড়লে দর্শকেরা জানতে চাইবে না তারপর কী হল? রাত শেষ হবে। কাল সকালে প্রিয়দর্শী এসে জানতে চাইবে, সে কেমন আছে? কি বলে সম্বোধন করবে শ্রবণা?

ডাক্তার সাহেব সামনের খাটে আধশোয়া হয়ে পড়ে আছেন। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন ঘরের সবুজ আলোটার দিকে। কাচের জানলাগুলো সব বন্ধ। ঘরের মধ্যে আটকা পড়েছে একটা বড় মথ্। সার্সির উপর ক্রমাগত মাথা খুঁড়ে চলেছে। মুক্তির পথ বেচারি খুঁজে পাচ্ছে না। দেওয়াল ঘড়িতে এক-টানা টিক্ টিক্ শব্দ। ঘড়ির কাঁটা দুটো দু-হাতে যেন মুখ ঢেকেছে। এক-তলার হলকামরার ঘড়িতে ঢংঢং করে বারোটা বাজল। অল্প পরে এ ঘরের ঘড়িটাও তার ডাকে সাড়া দেয়। দূর থেকে জানায়—আমিও চলেছি, আমার জীবনছন্দও থেমে থাকেনি—যদিও তোমার আমার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। একই মেকের দুটি ঘড়ি। যেন ভাইবোন!

পাশের ঘরে আলো জ্বলে ওঠে। প্রিয়দর্শী বোধহয় বাথরুমে গেল। তারও বোধকরি ঘুম আসছে না। কী ভাবছে সে?

শ্রবণার সঙ্গে আজও মিলনের স্বপ্ন দেখছে না কি! ছি ছি ছি! কী অশ্লীল, কী কুৎসিত চিন্তা! আপন ভাই-বোন!

শ্রবণা উঠে বসে। জলের গ্লাসটার দিকে হাত বাড়ায়।

চট করে উঠে বসেন ডাক্তার সাহেব। বলেন. থাক উঠো না. আমি দিচ্ছি।

জলের গ্লাসটা বাড়িয়ে দেন। ঢক্ ঢক্ করে অনেকটা জল খেয়ে আবার এলিয়ে পড়ে শ্রবণা, বলে, কী হবে ডাক্তার সাহেব ?

—তাই তো ভাবছি শ্রবণা। এর পর কী হবে ?

—আপনি আমাকে কী করতে বলেন ?

—আমি যা বল্‌ব তা মেনে নিতে পারবে ?

—বলুন।

—এইমাত্র যে সত্যটা তুমি জেনেছ, সেটা একেবারে ভুলে যাও।

—না—না—না !—আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে ওঠে শ্রবণা, সে অসম্ভব ! সে অশ্লীল ; কুৎসিত !

—আস্তে কথা বল শ্রবণা ! না হয়, বন্ধ থাক এ আলোচনা। ঘুমাও—

শ্রবণা নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করে। বলে, ঘুম আমার আসবে না। আমি বেশ সুস্থ আছি। আমি কী করব, কাল সকালে কী বলব, ওর সঙ্গে দেখা হলে···না ডাক্তার সাহেব, এসব যতক্ষণ না স্থির করা যাচ্ছে, ঘুম আমার আসবে না !

টুলটা টেনে নিয়ে ডাক্তার সাহেব এগিয়ে এসে বসেন। বলেন, বেশ। তাহলে আলোচনাই করা যাক ; কিন্তু মনে রেখ আমরা বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ করছি, এ্যাকাডেমিক্যাল ডিস্কাশান্স—ব্যক্তি বিশেষের সমস্যা নয়। সমস্যাটা কী ? একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে পূর্ণ যৌবনে পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হল, তাদের বন্ধুত্ব হল। তারা দেখল, তাদের দুজনের জীবনেই খানিকটা অস্বাভাবিকতার স্পর্শ আছে। দুজনেরই বাল্য ও কৈশোরের অবস্থাটা ধোঁয়াটে, কুয়াশায় ঢাকা। ওদের দুজনের জীবনে প্রভাতকালটা বালার্ক রাগে রঞ্জিত নয়। বাপ-মা-ভাই-বোন—সংসারে এসে যাদের কাছ থেকে আমরা স্নেহ-প্রীতি ভালবাসার প্রথম পাঠ নিই তারা উভয়ের ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত। বোধকরি সেই কারণেই, অথবা স্বাভাবিক ভাবেই ওরা পরস্পরকে ভালবাসল। ওরা দু'জনেই দু'জনের কাছে ধরা দিল, বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবার স্বীকৃতি জানাল। এখন মিলন যখন আসন্ন তখন একজন জানতে পারল অপরজন তার সহোদর। এ ক্ষেত্রে কী হওয়া উচিত ? প্রশ্নটা তো এই ?

শ্রবণা জবাব দেয় না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ফেলে শুধু শুনে যায়।

—ভাই বোনে বিয়ে না হওয়ার কারণটা কি ? এটা একটা সামাজিক বিধান। সমাজ এ জাতীয় বিবাহ মেনে নেয়নি—তার অনেক কারণ। জৈবিক একটা কারণও আছে। মেণ্ডেলের থিওরি—ক্রোমোসমস্ হাইপথেসিস্—'জিন',

ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা নাই করলাম ; মোদ্দা কথাটা হচ্ছে ভাই-বোন যেহেতু ছেলেবেলা থেকে একই সংসারে একই পরিবেশে বেড়ে ওঠে তাই আপাতদৃষ্টিতে তাদের এমন একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে যেটা যৌন-চিন্তামুক্ত। তারাও পরস্পরকে ভালবাসে, স্নেহ করে, প্রীতির আদান-প্রদান হয় ; কিন্তু সমাজ-হিতৈষীরা মনে করেন সে ভালবাসার জাত আলাদা। মনোবিজ্ঞানী কি মনে করেন সে কথা আলোচনা করতে হলে অনেক সময় দরকার, এবং সে কথা অবতারণা করার আগে আমাকে বুঝতে হবে, তুমি এ বিষয়ে কতটা জান। তুমি ফ্রয়েড-অ্যাডলার-য়ুঙ এর নাম শুনেছ ? ঈডিপাস্-কমপ্লেস কাকে বলে জান ?

শ্রবণা মাথা নেড়ে জানায়, সে জানে না।

—তাহলে এক কথায় তোমাকে সে সব বোঝানো যাবে না। তুমি মনে করবে সদারঙ্গিনী লোকটা বৈজ্ঞানিক নয়, কুৎসিত-অশ্লীল একটা পাগল।

এতক্ষণে শ্রবণা বলে ওঠে, ডাক্তার- সাহেব, একটা কথা আপনাকে বলা হয়নি। আমার বাবা আর মা ছিলেন মাসতুত ভাই-বোন। তাই আমার বাবা চিরদিনের জন্য সমাজ-সংসার ত্যাগ করে প্রবাসী হয়েছিলেন। জীবনে তিনি সুখী হতে পারেননি। মদে ডুবে থাকতেন। রাগী, বদমেজাজি, অসামাজিক লোক তিনি—অথচ তিনি শিল্পী, তিনি সঙ্গীতজ্ঞ, গুণী মানুষ। দুনিয়াকে এমন প্রতিভাধর মানুষটা কিছুই দিয়ে যেতে পারল না, নিজেও সুখী হল না, তার মূলে—কি জানি হয়তো ঐ আদি পাপ।

—তোমার বাবা বেঁচে আছেন ?

—আছেন। জীবন্মৃত হয়ে।

—তিনি প্রিয়দর্শীকে দেখেছেন, চেনেন ?

—হ্যাঁ, যদিও ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের কথা জানতেন না। নানান কারণে আমার বাবা এবং প্রিয় পরস্পরকে ঘৃণা করেন। প্রিয়দর্শীর ঘৃণার কারণ তিনি তাঁর আপন মাসতুতো বোনকে—

—বুঝেছি !

আবার কিছুটা নীরবতা। শেষে ডাক্তার সাহেব বলেন, তুমি কি নিতান্তই পারবে না ?

—না—না—না ! এবার অস্ফুটেই বলল শ্রবণা, প্রবলভাবে মাথা নেড়ে।

—কিন্তু আমি ভাবছিলাম—মাঝপথেই উনি চুপ করে যান।

—বলুন ?

—প্রিয়দর্শী এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেনি। এ আঘাতটা ও সইতে পারবে তো ?

—সহ্য করতে তাকে হবেই।

—হ্যাঁ, তা তো হবেই—তুমি যখন পারবে না বলছ !

আবার দুজনে চুপ করে যায়। শ্রবণাই এবার হারিয়ে যাওয়া কথার সূত্র তুলে নিয়ে বলে, আপনি শুধু বলুন, কী ভাবে তাকে আমি প্রত্যাখ্যান করব ? সত্য কথাটা অকপটে স্বীকার করাই এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভাল নয় কি ?

দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে ডাক্তার সাহেব বলেন, না ! ও সেটা সহ্য করতে, পারবে না। তোমাকে না-পাওয়ার আঘাতটা হয়তো সে সহ্য করবে, কিন্তু ওর সেই মায়ের ছবিখানার উপর কোন আঁচড় সে লাগাতে দেবে না। তুমি এসেছ ওর নূতন জীবনে, ওর দ্বিতীয় সত্তায়—এ জীবনটা সে জানে, বোঝে, এখানে যে আঘাত-প্রতিঘাত ও পাচ্ছে বা পাবে তার জাত আলাদা। সেখানে সে দু-ঘা নিতেও পারে, দু-ঘা দিতেও পারবে। সমস্যা তুমি নও। কিন্তু ওর এই দ্বিতীয় সত্তার যে বনিয়াদ সেখানে আছে চোরাবালির স্তর। সেটা কেমন করে টিকে আছে—কী উপাদানে ওর নূতন জীবনের কাঠামোটাকে খাড়া করে রেখেছে তা সে নিজেও জানে না, আমিও জানি না। এটুকু শুধু জানি যে, সেখানে ক্ষীণতম আঘাত লাগতে দেওয়া ঠিক হবে না। সেই বনিয়াদের ভিত একখানা মায়ের ছবি। ওর ত্রিশ বছরের মা নয়, কুমারী-জীবনের মায়ের প্রতীক একখানা মনগড়া ছবি, যার সঙ্গে বাস্তব একটা ছবিকে সে 'ফেটিশ্' এর মত গ্রহণ করেছে।

—আপনি কি বলছেন তাহলে কোন কারণ না দেখিয়ে আমি ওর জীবন থেকে সরে যাব ?

—সরে যদি নিতান্তই যেতে হয় তাহলে তাই যেতে হবে। ছলনাময়ীর মত !

—বিশ্বাসঘাতিনীর মত বলুন !

আবার বালিশে মুখ লুকায় শ্রবণা। ডাক্তার সাহেব ধীরে ধীরে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। শ্রবণা আবার উঠে বসে, বলে, তাহলে আজ রাত্রেই আমাকে চলে যেতে দিন। কাল সকালে উঠে যা মন চায় ওকে আপনারা বলবেন। ওর মুখোমুখি আমি আর দাঁড়াতে পারব না।

ডাক্তার-সাহেব একটু কি যেন চিন্তা করে বলেন, ডাক্তার হিসাবে তোমাকে

কয়েকটা প্রশ্ন করব। কোন সঙ্কোচ না করে জবাব দাও। তোমাদের পূর্বরাগের পালাটা কতদূর ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ হয়েছিল ?

দৃষ্টিটা নত হয় শ্রবণার, বলে, ঠিক কী জানতে চাইছেন আপনি ?

—তোমরা একঘরে রাত্রিবাস করেছ ?

মাটির দিকে তাকিয়েই শ্রবণা বলে, না !

—ও তোমাকে, মানে···

—না ! আমার গায়ে কোনদিন হাতই দেয়নি সেভাবে। কখনও আমাকে চুমু পর্যন্ত খায়নি !

—আশ্চর্য !

হঠাৎ মুখ তুলে শ্রবণা বলে, আপনি কি মনে করেন, ওদিক থেকে সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়নি।

—না, তা কবি না। আর করি না বলেই তো আশ্চর্য হচ্ছি !

আবার নত হয়ে পড়ে শ্রবণার দৃষ্টি। সলজ্জে বলে, একরাত্রে সে সুযোগও পেয়েছিল। বলেছিল, 'আজ নয় ! আমি আধামানুষ, তুমি মনস্থির করে আমাকে আমন্ত্রণ জানালে, তবেই তোমাকে স্পর্শ করব আমি !'

—বুঝলাম ! তুমি আনুপূর্বিক তোমাদের পূর্বরাগের ইতিহাসটা বলে যেতে পার আমাকে ? কোন সঙ্কোচ না করে ?

মাথা না তুলেই শ্রবণা বলে, পারব !

পরদিন সকালে সদারঙ্গনীর যখন ঘুম ভাঙ্গল তখনও শ্রবণা ঘুমাচ্ছে। ভাল করে আলো ফোটেনি তখনও। পুব আকাশে দপ্ দপ্ করে জ্বলছে একটা তারা। পাখিদের ঘুম ভাঙছে···কলরব উঠেছে পাখি-পাড়ায়। খুব ভোরে ওঠা সদারঙ্গনী সাহেবের চিরদিনের অভ্যাস। প্রায় সারা রাত দুজনে জেগে থাকলেও আজও খুব ভোরে উঠে পড়েছেন। নিঃশব্দে চটিটা পায়ে গলিয়ে নিয়ে আস্তে করে খুলে ফেলেন ঘরের অর্গল। শ্রবণা প্রায় শেষরাত্রি পর্যন্ত জেগে ছিল, অল্পক্ষণ ঘুমিয়েছে। সে যেন না উঠে পড়ে।

দ্বার খুলে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখেন আধা অন্ধকারে সেই দুরন্ত শীতে বারান্দার রেলিঙটা ধরে প্রিয়দর্শী দাঁড়িয়ে আছে। দরজাটা সন্তর্পণে ভেজিয়ে দিয়ে উনি ঘুরে দাঁড়ান তার মুখোমুখি।

—এখন কেমন আছে ও ?

—এস তুমি আমার সঙ্গে, কথা আছে।

প্রিয়দর্শী অনুসরণ করে। নিজের ঘরে ফিরে এসে ডাক্তার সাহেব বলেন, ভেরি স্যাড কেস্ প্রিয়। আয়াম সরি ফর হার, এ্যাণ্ড ফর য়ু।

—কেন, কী হয়েছে?

—তোমার যা হয়েছিল ওরও ঠিক তাই হয়েছে।

—তার মানে?

—ওর জ্ঞান ফিরে এসেছে বটে, কিন্তু সমস্ত অতীতটা ওর মন থেকে মুছে গেছে। এমনিতে সে বেশ স্বাভাবিক, কিন্তু একটি কল্পিত নারীর চরিত্রে ও নিজেকে আরোপ করেছে। ও আমাকে চিনতে পারছে না, তোমাকেও চিনতে পারবে না।

—বলেন কি?

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে প্রিয়।

মিথ্যাভাষণের অভ্যাস ডাক্তার সাহেবের নেই। মনস্তাত্ত্বিক হিসাবে তাঁকে ক্ষেত্র বিশেষে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। এ ক্ষেত্রেও নিতে হচ্ছে; কিন্তু অস্বস্তি বোধ করছেন। প্রিয়র বেদনাহত চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারছেন না। দৃষ্টিটা নত হয়ে যায়। পিছন ফিরে টুকিটাকি নাড়তে নাড়তে বলেন, ঐ যাকে আমরা বলি প্যারামনেসিয়া। স্মৃতিভ্রংশ আর কি। শুধু স্মৃতিভ্রংশ নয়, ও ভাবছে ও অন্য একটি মেয়ে। অর্থাৎ ওর পরিচিত অথবা কল্পিত একটি মেয়ের জীবনে ও নিজেকে প্রক্ষিপ্ত করেছে। ওর ধারণা ও বালবিধবা;—

বাধা দিয়ে প্রিয়দর্শী বলে, নিজের নাম কি বলছে ও—বৈশাখী?

—তুমি কেমন করে জানলে? বৈশাখীকে তুমি চেন? সে কি একটি বাস্তব মেয়ে?

প্রিয়দর্শী জবাবে শুধু বলে, আশ্চর্য!

শুধু প্রিয়দর্শী একা নয়, যে শোনে সেই বলে, আশ্চর্য।

শুধু ডাক্তার ত্রিবেদী বলেন, আশ্চর্য নয় স্যার, এটা অবিশ্বাস্য! ওর আঘাত এত সামান্য যে 'ট্রমাটিক-এফেক্ট' বিশ্বাসই হতে চায় না। আমাদের এখানে তো ফিমেল-ওয়ার্ড এখনও হয়নি, কি করবেন ওঁকে নিয়ে?

—আমার মনে হয় শীঘ্রই ও ভাল হয়ে উঠবে। বিয়েটার তারিখ পিছিয়ে দেওয়া যাক। ও আমার নিজস্ব তত্ত্বাবধানে ওই ঘরেই থাকবে। ওর চিকিৎসা আমিই করব—আমাকে জিজ্ঞাসা না করে ওকে যেন কোন ঔষধ বা ইনজেক্শান না দেওয়া হয়।

—প্রিয়দর্শী—

—হ্যাঁ, প্রিয় আর এখানে থেকে কি করবে। শ্রবণা সুস্থ হওয়া পর্যন্ত যখন বিয়েটা হতেই পারে না তখন সে চলে যাক নাসিকে। কি তার ছবি আঁকার বায়না নেওয়া আছে বলছিল—

সম্মুখ সমস্যাটার একটা মোটামুটি সমাধান হল বটে, কিন্তু এ অভিনয়ে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই হাঁপিয়ে উঠল শ্রবণা। ডাক্তার সাহেবকে জনান্তিকে ডেকে বলল, এ পাগলের অভিনয় করতে গিয়ে আমি সত্যিই পাগল হয়ে যাব ডাক্তার সাহেব, আমাকে আপনি মুক্তি দিন!

সত্যিই এ ওর পক্ষে অসম্ভব!

ডাক্তার সাহেব জবাবে বললেন, কিন্তু মুক্তি তো তুমি নিলে না শ্রবণা। আমি তো বলেছিলাম, নিঃশব্দে ওর জীবন থেকে সরে চলে যেতে—তা তুমি যেতে পারলে না। আমি বলেছিলাম, যে সত্যটা তুমি হঠাৎ জেনে ফেলেছ সেটা ভুলে যেতে—তাও তুমি পারলে না! তৃতীয় একটা সমাধান হতে পারে সব কথা ওকে খুলে বলা। তাতে ও যে আঘাত পাবে সেটা আমাদের রিস্ক করতে হবে। তাতেই যদি তুমি রাজী থাক, তো বল?

শ্রবণার মাথায় বোধকরি সবকথা ঠিক মত ঢুকছে না। অবোধ দৃষ্টি মেলে বলে, সে ক্ষেত্রে পরিণাম কী হবে?

—আগে মনে হয়েছিল সেটা প্রিয় সহ্য করতে পারবে না; কিন্তু তোমার এ অসুখের কথাটা ও যেভাবে শান্ত সমাহিত চিত্তে গ্রহণ করল তাতে মনে হয় এটাও সে সহ্য করতে পারবে।

—তারপর?

—তারপর হয়তো তোমরা দুজনেই দুজনকে নূতন দৃষ্টিতে দেখতে পারবে। নূতন সম্পর্ক গড়ে উঠবে আবার। ভাই বোনের সম্পর্ক। তোমরা দুজনেই হয়তো বিয়ে করবে। তোমার বিয়েতে আনন্দ করবে প্রিয়দর্শী, তুমি বরণ করে আনবে তোমার ভ্রাতৃবধূকে—

—চুপ করুন আপনি!

ম্লান হেসে ডাক্তার সাহেব বলেন, এ ছাড়া আর তো কোন সমাধান হতে পারে না।

অলকার সঙ্গে, ত্রিবেদীর সঙ্গে নতুন করে আলাপ করিয়ে দিলেন ডাক্তার সাহেব। নার্সিসিস্টিক্ নিউরসিসের রুগী শ্রবণা মেলাঙ্কোলিয়ায় ভুগছে। কথা

সে বলে না বিশেষ। এ ছাড়াও জটিলতা আছে ; তার মেলাঙ্কোলিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এ্যাম্‌নেসিয়া। নিজেকে সে একটি বালবিধবা বলে মনে করছে, সেই বালবিধবার জীবনের দুঃখই ওর আপাত মেলাঙ্কোলিয়ার উৎস। ত্রিবেদী বলেন, এমনটা তো হবার কথা নয়, নার্সিসিসটিক নিউরসিস্ তখনই হয় যখন বহির্জগতের কামপাত্র থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে রোগী সম্পূর্ণ নিজের উপর সেই প্রেমাবেগ প্রক্ষিপ্ত করে। ফলে বহির্জগতের প্রতি কোন কারণে রোগীর যে বিতৃষ্ণা জেগেছিল সেই বিতৃষ্ণা গিয়ে পড়ে নিজের উপর। রোগী তখন নিজেকে পীড়ন করে, মরমে মরে থাকে। এক্ষেত্রে এঁর যে প্রেমপাত্র সেই প্রিয়দর্শী—

বাধা দিয়ে ডাক্তার সাহেব বলেন, হোয়াসিও! তোমার দর্শন শাস্ত্রে যেটুকু লেখা আছে, তার বাইরেও দুনিয়া আছে—

ত্রিবেদী চুপ করে যান ; কিন্তু তাঁর সন্দেহটা চুপ করে থাকে না। বার বার তিনি আপন মনেই বলেন, এমন হয় না, এমন হবার কথা নয়। নেহাৎ সদারঙ্গনী বলছেন বলেই মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন ত্রিবেদী, মনে নিতে পারছেন না। তাছাড়া আরও একটা লক্ষণীয় জিনিস, এ কেসটা সম্বন্ধে ডাক্তার সাহেব তাঁর প্রধান সহকারীর সঙ্গে আলাপ পর্যন্ত করছেন না। শ্রবণা বলে নয়, একটা টিপিক্যাল কেস হিসাবে এ সম্বন্ধে যেটুকু জানবার কৌতূহল দেখাচ্ছেন, তাতেও যেন বিরক্ত হচ্ছেন সদারঙ্গনী।

প্রিয়দর্শীর সঙ্গেও শ্রবণাকে নূতন করে আলাপ করতে হয়েছে। ডাক্তার সাহেব সুদর্শন একটি যুবককে পরদিন নিয়ে এসে বলেছেন এ হ'ল প্রিয়দর্শী, আমার ছেলের মত। এখানেই থাকে। খুব ভাল ছবি আঁকতে পারে।

শ্রবণা অবোধ দৃষ্টি মেলে তাকে দেখেছে। প্রিয়দর্শী হাত তুলে তাকে নমস্কার করেছে। প্রতিনমস্কার করতে ভুলে গেছে মেয়েটি। সেই থেকে প্রিয়দর্শী ঘুরে ঘুরে এসেছে ওর ঘরে। নানা অছিলায় আলাপ জমাতে চেয়েছে। শ্রবণা মানসিক অবদমনে ভুগছে, মুখ তুলে তাকায়নি। কথার জবাব দিতে ভুল হয়ে যায় তার। বাগান থেকে ফুল তুলে এনে কাচের গ্লাসে সাজিয়ে রেখেছে ঐ প্রিয়দর্শন যুবকটি, জানতে চেয়েছে, ফুল ভাল লাগে না আপনার?

অন্যমনস্কের মত মাথা নেড়ে শ্রবণা জানিয়েছে—লাগে।

আবার ডাক্তার সাহেবের গ্রামাফোন আর রেকর্ডের বাণ্ডিল টেনে এনে জিজ্ঞাসা করেছে, গান শুনতে ভাল লাগে না?

এবার হয়তো দৌর্মনস্য রুগীটি মাথা নেড়ে জানিয়েছে—না।

তখন তাড়াতাড়ি গ্রামাফোনের সরঞ্জাম ফেরত নিয়ে গেছে ছেলেটি।

আবার হয়তো ফিরে এসেছে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই। এবার তার বগলে নানান জাতের ছবির বই, ছবি দেখতে ভাল লাগবে নিশ্চয়!

বিষাদ-বায়ুগ্রস্তা এই অচেনা মেয়েটিকে খুশী না করে যেন সে থামবে না। কথা না বলে উপায় নেই। শ্রবণা বলতে বাধ্য হয়েছে, আমাকে একটা ছবি এঁকে দেবেন?

পাগলাকে 'লা-ডুবাস্‌না' বলতে নেই। প্রিয়দর্শীকে আর ঠেকিয়ে রাখা যায়নি। রঙ তুলি ক্যানভাস নিয়ে এসে হাজির হয়েছে তৎক্ষণাৎ। ছবি এঁকে দেবে সে। মেয়েটি চেয়েছে যে!

অতক্ষণ বসে সিটিং দিতে রাজী নয় শুনে আবার রঙ-তুলি ফেরত নিয়ে গেছে। হাল ছাড়েনি কিন্তু। বারে বারে ঘুরে ফিরে এসেছে বিষাদ-বায়ু-গ্রস্তার কাছে। তাকে ভুলিয়ে রাখতে সে বদ্ধপরিকর। নানা ছুতায় কথা বলেছে। এক তরফা নিজের কথা বলে গেছে। উপায় নেই, চুপ করে শুনতে হয়েছে শ্রবণাকে। ডাক্তার সাহেবের বাড়ির ঐ ভদ্রলোকের জীবন-কথা শুনতে হয়েছে উদাসীন নির্লিপ্ততায়। নতুন করে জেনেছে ভদ্রলোক অবিবাহিত; কিন্তু বিয়ে ঠিক হয়ে আছে একটি মেয়ের সঙ্গে। শ্রবণা তার নাম। শীঘ্রই সে আসবে এখানে। বোম্বাইয়ের মেয়ে। মা নেই, বাবা আছে। ভাই বোন? না, আর কেউ নেই তার। সে মেয়েটির সঙ্গে কেমন করে আলাপ হল প্রিয়দর্শীর? সে এক ভারি মজার ব্যাপার। একবার প্রিয়দর্শী নাকি ট্রেনে করে দিল্লী যাচ্ছে, মাঝপথে সেই মেয়েটি উঠল এক বৃদ্ধের সঙ্গে! প্রিয়দর্শী প্রথমটা ভেবেছিল মেয়েটিকে বুঝি বৃদ্ধ ভদ্রলোকই সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছেন--

চুপচাপ শুনে যায় শ্রবণা আর মনে মনে ভাবে, কেন এভাবে সে অভিনয় করছে? কিসের আশায়? কী চায় সে? সে নিজেও কষ্ট পাচ্ছে, ওকেও কষ্ট দিচ্ছে! এর চেয়ে তো স্বীকার করে নেওয়াই ভাল, যা অপরিবর্তনীয় সত্য সম্পর্ক! কেন সে প্রিয়দর্শীকে খুলে বলতে পারছে না? সে কি সত্যই সহ্য করতে পারবে না প্রিয়দর্শীর জীবনে ভ্রাতৃবধূর আবির্ভাব! তাহলে ডাক্তার সাহেবের কথা মত রাতারাতি পালিয়ে গেলেই তো হত?

প্রিয়দর্শী একনাগাড়ে বলে চলেছে, ঘুম ঘুম চোখে উঠে বসতেই মেয়েটি বলে—কী ঘুমাচ্ছেন পড়ে পড়ে, ঐ দেখুন! কী দেখলাম বলুন তো জানালা দিয়ে?

দাঁতে দাঁত চেপে শ্রবণাকে বলতে হয়, তাজমহল বুঝি?

চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে প্রিয়দর্শী। হঠাৎ এগিয়ে এসে বলে, কেমন করে বুঝলেন? আমি তো বলিনি আগ্রা স্টেশনে এসে গেছে ট্রেনটা?

শ্রবণা উদাসীনের মত বলে, কী জানি!

আবার চেয়ারে ফিরে গিয়ে বসেন ভদ্রলোক। আবার শুরু করেন তাঁর উপাখ্যান, ভোরের আলো সবে ফুটে উঠ্‌ছে। আকাশের সব কটা তারা তখনও মিলিয়ে যায়নি। সেই প্রথম উষার আলোয় জীবনে প্রথম তাজমহলকে দেখলাম। আমরা দুজনে, একই জানালায় মাথা রেখে। আমরা দুজনেই এমন তন্ময় হয়ে পড়েছিলাম, যে আমাদের কারও মনে ছিল না অমন গায়ে গায়ে ঘন হয়ে বসা বেমানান। মেয়েটির কানের পাশে চুলের গুচ্ছ হাওয়ায় উড়ে এসে আমার গালে লাগছিল। ক্যাম্বারাইডিনের একটা—

—আমাকে একটু জল দেবেন?—হঠাৎ ওকে থামিয়ে দেয় শ্রবণা।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—এই যে দিচ্ছি।

এক গ্লাস জল এনে দেয় প্রিয়। ঢক্ ঢক্ করে সমস্ত জলটা খেয়ে শ্রবণা বলে, আমার বড় ঘুম পাচ্ছে।

—আচ্ছা,আচ্ছা—ঘুমান আপনি। আমি যাই।

চাদরটা ওর গায়ে টেনে দিয়ে বালিশটা ঠিক করে দিয়ে প্রিয়দর্শী চলে যায়।

শ্রবণা বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। ক্লান্তিতে ভেঙে আসে শরীর। কতক্ষণ এভাবে কেঁদেছে খেয়াল নেই। হঠাৎ মনে হল কে যেন এসে বসেছে ওর শিয়রে। আল্‌তো করে হাত বুলাচ্ছে মাথায়। প্রিয়দর্শী ফিরে এসেছে নাকি? আপ্রাণ চেষ্টায় অশ্রুর বন্যাকে রুদ্ধ করে শ্রবণা।

— শ্রবণা! ওঠ, মুখ তোল!

না প্রিয়দর্শী নয়, মাথার কাছে এসে বসেছে—অলকা।

শ্রবণা উঠে বসে। অবোধ দৃষ্টি মেলে বলে, আমি বৈশাখী!

—জানি! কিন্তু আর আমাকে ঠকাতে পারবে না। প্রথম থেকেই আমার সন্দেহ হয়েছিল। এতক্ষণ আড়ালে দাঁড়িয়ে প্রিয়র গল্প শুনছিলাম, আর তোমাকে লক্ষ্য করছিলাম। যে কান্না তুমি কাঁদলে, ওতো মেলাঙ্কোলিয়া রুগীর কান্না নয় শ্রবণা, আমি মেয়ে মানুষ—ও কান্নাকে যে আমি চিনি! কিন্তু কেন এভাবে অভিনয় করছ তুমি? বল, আমার কাছে গোপন কর না!

আর নিজেকে সামলাতে পারেনা শ্রবণা। অলকার কোলে মুখ গুঁজে আবার চোখের জলে ভেসে যেতে থাকে। কিন্তু অলকার অত সময় নেই,

বোধকরি মেজাজও নেই। সে ওর দুটি কাঁধ ধরে সোজা করে বসিয়ে দেয়। একটু রুক্ষ স্বরে বলে—

প্রিয়কে প্রত্যাখ্যান করবার অনেক রাস্তাই তো খোলা ছিল শ্রবণা! এভাবে নিজেকে ছোট করলে কেন? পাগল সেজে সবার চোখে ধুলো দিতে চাইছ কেন? তুমি কি ভেবেছ তোমার এ অভিনয়ে আমরা সবাই বোকা বনে গেছি? এত ভাল অভিনয় জান তুমি? ত্রিবেদী সাহেবও তোমার চালাকি ধরে ফেলেছেন! জানি না, অতবড় মনস্তাত্ত্বিক ডাক্তার হয়ে ডাক্তার সাহেবই বা কেন—

কথাটা তার শেষ হয় না। মুখ তুলে দেখে ডাক্তার সাহেব পিছন ফিরে দরজার ছিটকিনিটা বন্ধ করছেন। পরমুহূর্তেই ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেন, লজ্জা পেওনা অলকা। তোমাদের ডাক্তার সাহেব এবার হার স্বীকার করেছেন। মনস্তাত্ত্বিক হিসাবে এ সমস্যার কোন সমাধান আমি খুঁজে পাইনি। তোমাকে সবকথা খুলে বলব। তুমি হয়তো পারবে। তোমার ইণ্টুইটিভ সাজেস্‌শানটা আমি চাই।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে উনি বসেন। অলকার অপ্রস্তুত ভাবটা কেটে যায়, ডাক্তারবাবুর কথা শুরু হওয়া মাত্র। শ্রবণা আর অভিনয় করছে না। সে কি সত্যই মেলাঙ্কোলিয়ায় ভুগতে শুরু করেছে? নির্লিপ্ত উদাসীনতায় একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে জানালার বাইরে।

সমস্ত কাহিনীটা সংক্ষেপে বলে গেলেন সদারঙ্গনী। অকপটে। জানালেন, কেন এভাবে ছলনার আশ্রয় নিতে হয়েছে। কঠিন বাস্তব-আঘাতে মানসিক ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিল শ্রবণা। দুটি বিপরীত ধর্মী 'লিবিডো' শ্রবণার চিন্তা-ধারায়, ইচ্ছা ও কর্মস্রোতকে পরিচালিত করছে এখন। একটা তার সহজাত হৃদয়বৃত্তি—প্রেম, ভালবাসা, কাম যাই নাম দাও না কেন। সেটা ওকে প্রিয়দর্শীর প্রতি ধাবিত করছে। আর দ্বিতীয়টা, ওর সমাজ-চেতন মনের প্রতিরোধ, সেই কামনাকে ভ্রাতৃপ্রেমে পরিণত করার প্রয়াস। যে মুহূর্তে ও জানতে পারল যে, প্রিয়দর্শী ওর আপন ভাই সেই মুহূর্তেই এই দ্বিতীয় লিবিডো টা ওকে পরিপূর্ণভাবে গ্রাস করল। সে রাত্রে ও চীৎকার করে উঠেছিল—ও চিন্তা কুৎসিত, অশ্লীল! আমি জানতাম সমাজ চেতনা প্রথমটা লড়াইয়ে জিতবে; কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়। হয়তো সে বাধাকে অতিক্রম করে ও প্রিয়দর্শীকে গ্রহণ করতে পারবে। বৈজ্ঞানিক হিসাবে আমি তাতে বাধা দেখি না—যেমন সামাজিক মানুষ হিসাবে শ্রবণার ইচ্ছার বিরুদ্ধে

সবচেয়ে সহজ সমাধান গ্রহণে তাকে বাধ্য করাতে পারি না। আমি ওকে ভাববার সময় দিতে চেয়েছিলাম। ওর যা প্রয়োজন, তা সময়। ও নিজের মনকে যাচাই করে দেখে নিক। কী চায় সে এখন। তাই সবদিক বাঁচিয়ে ওকে রোগী সাজিয়ে রেখেছি।

ডাক্তার সাহেব থামলেন।

অলকা বা শ্রবণা কেউ কিছু বললে না।

—তুমি তো কিছুই বললে না অলকা?

—কী বলব বলুন? এমন ঘটনা যে বাস্তবে কারও জীবনে ঘটতে পারে তা আমি কল্পনাও করিনি।

—কিন্তু আমি যে তোমার ইণ্টুইটিভ সাজেস্‌শান জানতে চেয়েছিলাম।

—শ্রবণা কি চায়?

শ্রবণাকে জবাব দেবার অবকাশ না দিয়ে ডাক্তার সাহেব বলেন, সেটা শ্রবণা জানে না! আমাকে বাধা দিও না শ্রবণা, তুমি সত্যই জান না তুমি কি চাও! দুদিন আগে হলে তুমি আমাকে এত কথা বলতে দিতে না। তার আগেই চীৎকার করে উঠতে—এ অশ্লীল, এ কুৎসিত পাভাশান! আজ তোমার মনে দ্বিধা এসেছে! এসেছে বলেই এত কথা ধৈর্য ধরে শুনতে পারছ! দ্বিধা এসেছে বলেই এ অভিনয় করে সময় কাটাতে রাজী হয়েছ তুমি। নিজের মনটাকে যাচাই করে নিতে চেয়েছ।

হঠাৎ অলকার দিকে ফিরে বলেন, বিশ্বাস কর অলকা, আজ তোমার কাছে সত্যিই আমি পরামর্শ চাইছি। বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধান নয়, একটি শিক্ষিতা আধুনিকা নারীর খোলা মনের কথা।

অলকা মুখটা নিচু করে কিছুক্ষণ ভেবে নেয়। কেউ কোন কথা বলে না তারপর মুখটা তুলে অলকা বলে, আমার মনে হয় এ সমস্যার সমাধান একমাত্র শ্রবণার নিজের পক্ষেই করা সম্ভব। আমি বলি, ওকে প্রিয়দর্শীর সঙ্গে নার্সিকে পাঠিয়ে দিন। প্রিয়দর্শীকে আপনি সাবধান করে দিন, নার্সিসিস্‌টিক নিউরসিসের রুগীর গায়ে যেন ইচ্ছায় বিরুদ্ধে হাত না দেয়। তাতে তার ক্ষতি হতে পারে। ওরা দুজনে সংসার করুক। দু-চার-দশদিনেই শ্রবণা বুঝতে পারবে তার জৈবিক বৃত্তি অথবা সমাজ-চেতনার বাধা কোনটাকে সে মেনে নেবে। ওদের সমস্যার সমাধান একমাত্র ওরাই করতে পারে। আপনি-আমি নয়।

ডাক্তার সাহেব বার কয়েক কক্ষটায় পায়চারি করে ফিরে এসে শুধু বলেন, ওয়াণ্ডারফুল সাজেস্‌শান!

হঠাৎ শ্রবণার দিকে ফিরে বলেন, কী তুমি রাজী ?

এবার শ্রবণাকে জবাব দেবার সুযোগ না দিয়ে অলকা বলে ওঠে, সেটা শ্রবণা জানে না স্যার ! আমাকে বাধা দিও না শ্রবণা, তুমি সত্যই জান না এতে তুমি খোলা মনে রাজী হবে, না লোকলজ্জায় প্রত্যাখ্যান করবে। আপনি আর কোন দ্বিধা করবেন না স্যার। ওদের দুজনকে একান্তে একটা বোঝাপড়া করার সুযোগ করে দিন !

গুণই হ'ক আর দোষই হ'ক ডাক্তার সদারঙ্গনীর চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য হল যে, কোন একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হ'লে সেই অনুযায়ী কাজ না সারা পর্যন্ত তিনি স্থির হতে পারেন না। যে মুহূর্তে তাঁর মনে হল অলকার সাজেস্‌শান্‌টা ওয়াণ্ডারফুল, অমনি কোমর বেঁধে লাগলেন সেটাকে কার্যকরী করতে। অবিলম্বে ডাক পড়ল প্রিয়দর্শীর। তাকে জনান্তিকে কাছে বসিয়ে বললেন, আমি বুঝতে পারছি, ওষুধে আর চিকিৎসায় শ্রবণার মেলাঙ্কোলিয়া ঘুচবে না। অন্য দিক থেকে সে বেশ স্বাভাবিক—ওকে মনের স্ফূর্তিতে রাখতে হবে এবং ক্রমাগত কাজের যোগান দিতে হবে। আমার এখানে অলকা ছাড়া স্ত্রীলোক আর কেউ নেই—তবু এ ক'দিন তুমি এসে ওর সঙ্গে গল্পগুজব করছিলে—কিন্তু তুমি চলে গেলে ও একেবারে একলা পড়ে যাবে। আরও মনমরা হয়ে যাবে—

বাধা দিয়ে প্রিয়দর্শী বলে, তাহলে আমার যাওয়াটা কি পেছিয়ে দিতে বলেন ?

—না, আগিয়ে দিতে। তুমি কালই রওনা দাও। এবং শ্রবণাকে সঙ্গে নিয়ে যাও !

—শ্রবণাকে ? আমি ? এই অবস্থায় ? সেই বা যেতে চাইবে কেন ?

—তাকে আমি রাজী করার ভার নিলাম।

—কিন্তু কী পরিচয়ে তাকে নিয়ে যাব আমি ?

—সেটাও ভেবেছি আমি। ও মনে করছে ও বালবিধবা। তাই মেনে নেওয়া যাক্। তুমি তোমার মাতৃপিতৃহীন বিধবা বোনকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছ।

—কিন্তু শ্রবণা কী রাজী হবে ?

—বললাম তো, সে ভার আমার ! বালবিধবার পক্ষে দ্বিতীয়বার বিবাহ করা অসম্ভব নয়। দেখা যাক ওর মনের গতি কোন দিকে মোড় নেয়। তোমার সংসারে ওকে সর্বদা কাজের মধ্যে মগ্ন থাকতে হবে। রান্না করতে হবে, ঘরদোর সাফ করতে হবে। নানান রকম কাজে ব্যাপৃত থাকতে হবে।

প্রিয়দর্শীকে রাজী হতে হয়।

ডাক্তার সাহেব ওকে সাবধান করে দেন, যতদিন না শ্রবণার মন তৈরী হয় ততদিন সে যেন প্রতীক্ষা করে। কোন রকম ভাবেই যেন তাড়াহুড়া না করে।

শ্রবণাকেও ডেকে নানা রকম উপদেশ দিলেন। বললেন, তুমি দৈনিক ডায়েরি লিখবে, কি ঘটছে তাও লিখ এবং তোমার যা মনে হচ্ছে তাও অকপটে লিখে যেও।

তখনই টেলিগ্রাফ করে দিলেন নাসিকে। সিংজীর নামে।

পরদিন ওদের দুজনকে ট্রেনে তুলে দিয়ে নিশ্চিত হলেন অবশেষে। স্টেশন থেকে ফিরে এসে ডেকে পাঠালেন অলকাকে। তাকে সামনে বসিয়ে ডাক্তার সাহেব বলতে থাকেন,তোমাকে কন্‌গ্র্যাচুলেট করছি। অদ্ভুত সমাধান বাৎলেছ তুমি। এ ছাড়া আর কোন সমাধান আমি খুঁজে পাইনি। এটার মত ইণ্টারেস্টিং কেস আমি আর কখনও পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। সমস্তটা এমন অদ্ভুত যে, এ থেকে মস্তবড একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারব আমরা—

অলকা বাধা দিয়ে বলে, না, আমি ভাবছিলাম—

—জানি তুমি কি ভাবছ। সে ব্যবস্থাও আমি করেছি। শ্রবণাকে বলেছি প্রতিদিনের বিস্তারিত ডায়েরি লিখে যেতে। যদি খুঁটিয়ে সবকথা লিখতে পারে তবে সেটা মনোবিজ্ঞানীদের কাছে একটা মূল্যবান দলিল হবে। জৈবিক বৃত্তি ও সামাজিক সংস্কার এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে—

আবার বাধা দিয়ে অলকা বলে, আমি সে কথা বলছি না স্যার। আমি বলছিলাম এত তাড়াহুড়া করে ওদের না পাঠালেই ভাল হত—

—না না! আমি তোমার সঙ্গে একমত হতে পারছি না। তুমি শ্রবণার অভিনয়টা ধরে ফেলেছ। ত্রিবেদীও ভীষণ সন্দেহ করছিল। ওকে এখানে আর আটকে রাখা কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় ছিল না।

অলকা অধৈর্যের সঙ্গে বলে, আপনি আমার কথাটা একটু শুনুন স্যার!

—বেশ বল।

—আমার মনে হয় আপনারা একটা প্রকাণ্ড ভুল করছেন!

—ভুল! কখনই নয়! এইটেই সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা হয়েছে। ওদের সমস্যার সমাধান একমাত্র ওরাই করতে পারে। এছাড়া অন্য কোন সমাধান কল্পনাই করতে পারিনি। আমি ক্রমাগত কদিন এ নিয়ে ভেবেছি—

অলকা আবার বাধা দিয়ে বলে, তার কারণ আপনি সমাধানের কথাটাই

ভেবেছেন। সমস্যাটার কথা ভেবে দেখেননি।

চোখ দেখে চশমাটা খুলে সদারঙ্গনী বলে, কী বলতে চাইছ তুমি?

—হয়তো আপনার হাইপথেসিস্‌টাই ভুল। সমস্যাটা আপনি যা ভাবছেন হয়তো তা আসলে নয়—

সদারঙ্গনী মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকেন। অলকা বলে, আপনি বিচার করে দেখুন। আপনার মতে শ্রবণা আর প্রিয় আপন ভাই বোন। এ ধারণার পিছনে একটি মাত্র যুক্তি, শ্রবণার স্বীকৃতি—তাই নয়?

—তুমি বলতে চাইছ, শ্রবণা ভুল বলেছে?

—আমি কিছু বলতে চাইছি না। আপনি আমাকে বলুন আমি যা জানতে চাইছি। আপনি ধরে নিয়েছেন প্রিয়দর্শীর মা, যাঁর ছবি আপনি এনলার্জ করিয়েছেন, তিনি শাহজাহানের স্ত্রী। তিনি শিশু প্রিয়দর্শীকে নিয়ে স্বামীর গৃহ ত্যাগ করেন। তাই তো?

—হ্যাঁ তাই।

—এবার বলুন তিনি যখন গৃহত্যাগ করেন তখন প্রিয়দর্শীর বয়স আন্দাজ কত ছিল?

—তা কেমন করে বলব? দুই-তিন-চার-পাঁচ যা হয় হবে।

—না। দুই-তিন-চার হতে পারে না। কারণ শ্রবণার চেয়ে প্রিয়দর্শী পাঁচ বছরের বড়। শ্রবণা যদি মমতাময়ী এবং হিমাদ্রী রায়ের সন্তান হয়, তাহলে মমতাময়ীর গৃহত্যাগের সময় প্রিয়দর্শীর বয়স অন্তত পাঁচ হতেই হবে।

একটু চুপ করে থেকে ডাক্তার সাহেব বলেন, ঠিক কথা!

—কিন্তু প্রিয়দর্শীর বয়স যখন পাঁচ বছর তখন তার মায়ের পক্ষে স্বামীগৃহ ত্যাগ করে যাওয়া অসম্ভব, কারণ তখন তার দ্বিতীয় সন্তান সদ্যোজাত!

এবার আর কোন জবাব দেন না সদারঙ্গনী।

অলকা বলেই চলে, অন্তত শ্রবণা যখন দু বছরের, ধরা যাক, তখন মমতাময়ী গৃহত্যাগ করেছিলেন। তাহলে প্রশ্ন থাকে তিনি সেক্ষেত্রে কেন দু-বছরের নিতান্ত শিশুকে সঙ্গে না নিয়ে সাত বছরের বালকটিকে সঙ্গে নিয়ে গৃহত্যাগ করলেন? সাত বছরের ছেলে বাবাকে চেনে—কোন কুলত্যাগিনী কখনও সাত বছরের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এবং দু-বছরের মেয়েকে ফেলে রেখে যায় না!

সদারঙ্গনী আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। বলেন, অকাট্য যুক্তি! কী আশ্চর্য! এভাবে তো আমি ভাবিনি! তবে কি ওরা আপন ভাই বোন নয়?

অলকা বলে, আপনি এত তাড়াহুড়া করলেন, যে আমি সবকথা আপনাকে গুছিয়ে বলার সুযোগই পেলাম না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওরা আপন ভাই বোন নয়। নিশ্চয় কোথাও ভুল হচ্ছে আপনাদের।

সদারঙ্গনী তখন ঘরময় পায়চারি করছেন। বাঁ হাতের উপর ডান হাতে মাঝে মাঝে ঘুষি মারছেন। বারকয়েক পদচারণা করে ফিরে এসে বলেন, আই এ্যাডমিট্! ভুলই হয়েছে আমার। সমাধানটার সন্ধানেই আমি সমস্ত চিন্তাশক্তি নিয়োগ করেছি—সমস্যাটাকে যাচাই করে দেখিনি!

—কি করবেন এখন?

—তুমি দেখত—সাইকো-এ্যানালিটিক্যাল সোসাইটির বম্বে সেমিনারের নিমন্ত্রণটা আমার অফিস থেকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে কিনা—

—দেখতে হবে না! আমার মনে আছে। প্রিয়র বিয়ে উপলক্ষ্যে আপনি ওদের জানিয়েছেন যে আপনি যেতে পারবেন না।

—এখনি একটা টেলিগ্রাফ করে দিতে বল—আমি যাব।

—বোম্বাই যাবেন আপনি?

হ্যাঁ যেতেই হবে। ঐ শাহজাহান ছাড়া এ জট আর কেউ ছাড়াতে পারবে না।

প্রিয়দর্শী গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে 'কেস'টাকে লক্ষ্য করে চলেছে। আশ্চর্য! ত্রিবেদী-সাহেবের কথাই অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাচ্ছে। আজ নিয়ে সে আটদিন হল এসেছে নাসিকে, শ্রবণাকে নিয়ে। আসার আগে ত্রিবেদী-সাহেব ওকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, নার্সিসিস্টিক্ নিউরসিসের রুগী যখন মেলাঙ্কোলিয়ায় ভোগে তখন তার লক্ষণ কী হয়। তার চিকিৎসা পদ্ধতিই বা কি। ত্রিবেদী বলেছিলেন, এক্ষেত্রে রুগী বাইরের জগত থেকে দৃষ্টি সম্পূর্ণ নিজের উপর নিয়ে আসে। বহির্জগতের কামপাত্রের কাছ থেকে প্রত্যাহৃত হয়েই এভাবে সে নিজের উপর সেই উৎসাহ স্থাপন করে; এবং যেহেতু বহির্জগতের কামপাত্রটির প্রতি তার বিরাগ হয়েছে তাই তখন নিজের উপরেও তার বিতৃষ্ণা জন্মায়। রোগী নিজের প্রতি কঠোর হয়। আত্মপীড়ন করে, সর্বদা মরমে মরে থাকে। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে এই দৌর্মনস্যের লক্ষণ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রকট হয় না। বিষাদবায়ু পর্যায়ক্রমে আসে—এবং দুইটি শোকাহত অবস্থার অন্তর্বর্তী কালে আসে স্ফূর্তির জোয়ার। অর্থাৎ রোগী যেন পালা করে দারুণ স্ফূর্তি এবং দারুণ শোকের মধ্যে হাবুডুবু খায়। মনোবিজ্ঞানীরা এর

নাম দিয়েছেন ম্যানিক্ ডিপ্রেসিভ সাইকোসিস্। ত্রিবেদী প্রিয়দর্শীকে সাবধান করে দিয়েছিলেন—শ্রবণা যদি মানসিক অবসাদ ঝেড়ে ফেলে হঠাৎ বেশীমাত্রায় হাসিখুশী হয়ে ওঠে তাহলে যেন সে ঘাবড়ে না যায়। পর্যায়ক্রমে স্ফূর্তি এবং অবসাদও আসতে পারে তার।

প্রিয়দর্শী লক্ষ্য করে দেখছে শ্রবণার ঠিক পর্যায়ক্রমেই পালা বদল চলছে। প্রায় বারোঘণ্টা পর পর তার চরিত্র বদলে যাচ্ছে। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সে বেশ হাসিখুশী, স্ফূর্তিবাজ—যেন নূতন বধূ এসেছে সংসার করতে; আর সূর্যাস্তের পর থেকেই সে অন্যমানুষ—যেন কী এক অজানা আতঙ্কে সে ম্রিয়মাণ। তখন সে একেবারে একা থাকতে চায়। প্রিয়দর্শীকে সহ্য করতে পারে না তখন। আপন মনে বিছানায় মুখ লুকিয়ে কাঁদে! প্রিয় যদি সান্ত্বনা দিতে এগিয়ে আসে ছিটকে সরে যায় সে, বলে, লজ্জা করে না আপনার এভাবে অরক্ষিত আমার ঘরে ঢুকতে! তখন কে বলবে এই লোকই সকাল বেলা বলেছিল, আজ যদি সকাল করে বাড়ি না ফের আমি কিন্তু কথাই বলব না তোমার সঙ্গে। মনে থাকে যেন।

দিনের আলোয় শ্রবণা 'তুমি' বলে, সন্ধ্যার পর সেটা হয়ে যায় 'আপনি'। কী বিচিত্র এই মনের অসুখ!

প্রথম দিনের কথাটা মনে পড়ছে। ট্রেন থেকে নেমেই দেখে বঙ্কু এসেছে ওদের রিসিভ করতে। প্রেমচাঁদ সিংজী টেলিগ্রাম পেয়ে গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন স্টেশনে। বঙ্কু চঞ্চল ছটফটে মানুষ, প্রিয়দর্শীকে কিছু বলবার সুযোগই দেয় না। প্রিয়দাকে সম্পূর্ণ ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মালপত্র নামিয়ে ফেলে। প্রিয়দর্শী বেশ গুছিয়ে নিয়ে শ্রবণার পরিচয়টা দিতে যাবে তার আগেই বঙ্কু তড়বড়িয়ে ওঠে, আরে থাক্ থাক্ দাদা! তোমাকে আর অত কায়দা ক'রে ফরমাল ইণ্ট্রোডাকসান করতে হবে না। আসুন ভাবীজি; আমার পরিচয়,—আমি বঙ্কু। ইলেকট্রিক মিস্ত্রী। সম্পর্কে আপনার দেওর। আমার আরো দুটো পরিচয় আছে। আমি বারে বারে চা খাই এবং সবরকম খাদ্য দ্রব্যাদি খেতেই আমি ভালবাসি!—প্রিয়র দিকে ফিরে বলে, এসব কথেরা প্রথমেই মিটিয়ে ফেলা ভাল। না হ'লে রোজরোজ ভাবীজিকে জিজ্ঞাসা করতে হবে—ঠাকুরপো একটু চা খাবেন নাকি? ঠাকুরপো ক্ষিদে পেয়েছে?

প্রিয়দর্শী তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলে—তুমি একটা প্রচণ্ড ভুল করছ বঙ্কু! এঁকে তুমি ঠিক চিনতে পারনি, ইনি মানে—

বঙ্কু হো হো করে হেসে ওঠে, বলে, এঁকে আমি ঠিকই চিনেছি। এঁর

ছবিও আছে আমার কাছে।

—ছবি?—এতক্ষণে শ্রবণাও কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

—জী হাঁ! দাদার আঁকা! দেখাব আপনাকে। ট্রেনের জানলা দিয়ে আপনি আর দাদা তাজমহল দেখছেন!

প্রিয়দর্শী ঘেমে ওঠে!

শ্রবণা নির্লিপ্তের মত বলে, দেখাবেন তো ছবিটা!

—আলবাৎ দেখাব! চলুন এখন গাড়িতে ওঠা যাক্।

সারাটা পথ বন্ধু বক্ বক্ করে চলে। এটা কী, ওটা কী চিনিয়ে দিতে থাকে। বলে, দাদা আগেই লিখেছিলেন রাঁচিতে বিয়ে করে আপনাকে নিয়ে আসবেন। তবে এত তাড়াতাড়ি যে বিয়েটা হয়ে যাবে তা আমি ভাবিনি। আমি কিন্তু বিয়ের ফর্মাল নিমন্ত্রণ পত্র পাইনি! খাওয়াটা আমার পাওনা আছে ভাবীজি।

প্রিয়দর্শী কাঠ হয়ে বসে থাকে।

শ্রবণা বলে, বেশ তো। খাইয়ে দেব আপনাকে। কী খাবেন বলুন?

—ঝোল-ভাত! রুটি-মাংস খেতে খেতে পেটে চড়া পড়ে গেছে! কতদিন ভাল করে মাছের ঝোল ভাত খাইনি।

বেশ, তাই খাওয়াব আপনাকে।

প্রিয়দর্শী বুঝে উঠতে পারে না, শ্রবণা কেন প্রতিবাদ করছে না!

ছোট্ট দু-কামরার বাড়ি! খাপরার ঘর। সামনে একফালি বারান্দা। পিছনে রান্নাঘর। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটা বাগান। বাগানের শেষপ্রান্তে কুয়ো এবং স্নানাগার। বন্ধুই ড্রাইভারের সঙ্গে হাতে হাতে মালপত্রগুলো টেনে নিয়ে আসে, বলে, এবার বলুন ভাবীজি, বাড়ি পছন্দ হয়েছে?

—বেশ বাড়ি! আপনি কোথায় থাকেন?

—আমি ঐ সিনেমা হাউসেই একটা চারপাই পেতে পড়ে থাকি। খাই হোটেলে। এবার থেকে কিন্তু এখানে খাব। দাদা, আমি কিন্তু তোমার পেইং গেস্ট।

প্রিয়দর্শীকে জবাব দেবার সুযোগ না দিয়ে শ্রবণা বলে, নিশ্চয়ই। নিত্য দুবেলা মাছের ঝোল ভাত!

বন্ধু বলে, সে গুড়ে বালি। অত চাল পাবেন কোথায়? এ যে আটা-ময়দার রাজ্য। মাছও পাবেন না রোজ। তবে বাজার আমি করব। দাদার দ্বারা ওসব হবে না! আর্টিস্ট মানুষ, যত পচা শুকনো মাল গছিয়ে দেবে দাদাকে।

শ্রবণা বলে, বাসন মাজার একজন—

—সে আর বলতে হবে না। বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া ইত্যাদি ঠিকে ঝিতে করে যাবে। দুধের কথাও বলে রেখেছি, আধসের করে সকালে দিয়ে যাবে। আর যা যা লাগবে বলবেন, ব্যবস্থা করে দেব।

তা দিয়েছিল বঙ্কু। করিৎকর্মা লোক। অফিস থেকে খানতিনেক চেয়ার এনে রেখেছিল আগেই। চৌকি কেনেনি, বলেছে—পাকা মেঝে—মাটিতে শুতেও অসুবিধা হবে না। চান যদি খাটও ভাড়া পাওয়া যায়। জানলায় পর্দা দেওয়া হয়নি। ভাবীজিকে নিয়ে সে সন্ধ্যাবেলা বাজারে যাবে, পছন্দসই পর্দা কিনে দেবে। বাসনপত্রও কিছু কিছু কিনতে হবে। এ বেলা হোটেলে বলে রেখেছে। হোটেলটা সামনেই। বাড়িতে দিয়ে যাবে খাবার। প্রিয়দর্শীকে ওরা হাত লাগাতে দিল না, নিজেরাই টানাটানি করে মালপত্র এঘর ওঘর করল। পেরেক পুঁতল, কাপড় মেলার দড়ি টাঙাল। মোটামুটি গুছিয়ে দিয়ে বঙ্কু বলল, এবার তাহলে চলি ভাবীজি ?

—তাই কি হয় ? আপনার মজুরী ? টি-পট নিয়ে সামনের দোকান থেকে তিন কাপ চা নিয়ে আসুন। আর গরম সামোশা যদি পাওয়া যায়।

কোথাও কিছু নেই বঙ্কু খপ্ করে ভাবীজির পায়ের ধুলো নিয়ে নেয়।

শ্রবণা হেসে ব্যাগ থেকে পয়সা বার করে দেয়।

বঙ্কু চা আনতে চলে গেলে প্রিয়দর্শী ইতস্তত করে বলেছিল, বঙ্কু একটা মারাত্মক ভুল বুঝেছে ! সত্যি কথাটা ওকে—

চাপা হাসি দিয়ে ঢেকে শ্রবণা বলে, সত্যি কথা কোনটা ? আমি আপনার বিধবা বোন ? সেটাই কি সত্যি ? আমি আপনার বোন ?

প্রিয়দর্শী আমতা আমতা করে, না, তাও অবশ্য সত্যি নয়, মানে—

—বঙ্কু-ঠাকুরপোর এমন দৃঢ়মূল ধারণা হয়েছে যে এখন প্রতিবাদ করাও বোধহয় ঠিক হবে না।

—তা ঠিক। তাহলে কিন্তু ওর সামনে আমাকে 'আপনি' 'আপনি' কর না। ও কী ভাববে ?

মুখ টিপে শ্রবণা বলেছিল, বেশ তো, আর না হয় তোমাকে 'আপ' করব না। শুধু 'ডাউনই' করব এবার থেকে—

বলেই সচকিত হয়ে ওঠে শ্রবণা। লক্ষ্য করে দেখে প্রিয়দর্শী কেমন উদাস হয়ে গেছে। কী যেন ভাবছে সে। মাথার চুলগুলো ধরে টানছে অন্যমনস্ক ভাবে।

কী ভাবছেন বলুন তো ?

—না, কিছু না।

—আমি জানি আপনি কী ভাবছেন !

—কী ?

—আপনি ভাবছেন, ঠিক এই ভাষাতে আপনাকে আগেও কেউ বলেছিল। তাই না ?

—কী আশ্চর্য ! তুমি কেমন করে জানলে বৈশাখী ?

—আমারও যে প্রায়ই অমন হয় ! স্টেশনে যখন বন্ধু বলল আমার ছবি সে দেখেছে—ট্রেনের জানলা দিয়ে আমি তাজমহল দেখছি, তখন আমারও মনে হল—ঠিক ঐ ঘটনা বুঝি আমার জীবনে ঘটেছে। অথচ তা তো সত্য নয় !

প্রিয়দর্শী কি বলবে ভেবে পায় না !

ঠিক তখনই ফিরে এল বন্ধু, গরম সিঙাড়া আর চা নিয়ে।

এই এক সপ্তাহে, লক্ষ্য করে দেখেছে প্রিয়দর্শী, যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে শ্রবণার। রাঁচিতে থাকতে শ্রবণা কথাই বলত না। হাসত না পর্যন্ত। এখানে এসে সে যেন ছেলেমানুষ হয়ে উঠেছে। ঘর দোর গোছাচ্ছে, সাজাচ্ছে, বাগান করছে। সে যেন এই নতুন পাতা সংসারের নববধূ। প্রিয়দর্শী আরও লক্ষ্য করে দেখেছে অতীতের আলোচনা শ্রবণা করতে চায় না। প্রিয়দর্শী যদি তার গল্প করতে বসে শ্রবণা তাকে থামিয়ে দেয়। প্রিয়দর্শী-শ্রবণার পূর্বরাগের কাহিনী উঠে পড়লেই সে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে। প্রিয়দর্শী ভাবে, বাস্তবের শ্রবণা বোধকরি গল্পের শ্রবণাকে ঈর্ষা করে। সে যে নিজেকে বৈশাখী বলে মনে করছে, তাই প্রিয়দর্শীর প্রেমপাত্রী গল্পলোকের শ্রবণাকে সে সহ্য করতে পারে না। এটা আন্দাজ করার পর থেকে ও প্রসঙ্গ আর প্রিয়দর্শী তোলে না। বৈশাখী নিজেও তার জীবনকথা বলতে চায় না। যেন অতীত বলে কিছু নেই। যেন এই নতুন-পাতা সংসার থেকেই যাত্রা শুরু করেছে ওরা দুজন। আজকের কথা বল। গতকালকের কথাটা থাক। ভাবখানা যেন এই রকম। বন্ধুর পাল্লায় পড়ে বিকালে বেড়াতে যেতে হয়। সারাটা দিন প্রিয়দর্শী ছবি আঁকে সদ্যসমাপ্ত সিনেমা-হাউসের দেওয়ালে। বন্ধু ইলেকট্রিক তার নিয়ে টানাটানি করে আর পাঁচটা মিস্ত্রির সঙ্গে। সন্ধ্যাবেলা দুই বন্ধু ফিরে আসে। শ্রবণা ওদের চা-খাবার দিয়ে তৈরী হয়ে নেয়—তারপরের অধ্যায়ের জন্য। সান্ধ্যভ্রমণ।

কিন্তু এও লক্ষ্য করে দেখেছে প্রিয়দর্শী, রাত্রে বেড়িয়ে ফিরে আসার পর

বন্ধু চলে যাবার পরই যেন হঠাৎ একটা পরিবর্তন আসে শ্রবণার। আচমক গম্ভীর হয়ে যায় সে। আর প্রিয়দর্শীর দিকে চোখ তুলে তাকায় না। এড়িয়ে এড়িয়ে বেড়ায়, পালিয়ে পালিয়ে থাকে। হঠাৎ 'তুমি' ছেড়ে 'আপনি' ধরে বলে, খেয়ে নেবেন নাকি এবার? রাত অনেক হল।

আটটা বাজে কি বাজে না খাওয়া-দাওয়া মিটিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে শ্রবণা দরজায় খিল দেয়। প্রিয়দর্শী বাইরের ঘরে একা বসে থাকে। কখনও বই পড়ে, কখনও একা একা আপন মনে জেগে থাকে গভীর রাত পর্যন্ত। বেশ বুঝতে পারে পাশের ঘরে বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে শ্রবণা তখন বোধকরি সে দৌর্মনস্যের রুগী। বিষাদ-বায়ুর প্রকোপে আত্মপীড়নরত নারী! তখন সে বালবিধবা। পরপুরুষ প্রিয়দর্শীর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পর্যন্ত পারে না।

কিন্তু আবার পরদিন সকালে সে অন্য মানুষ। দিনের বেলা ঐ বালবিধবার স্মৃতিটা ওর একেবারেই থাকে না। না হ'লে বন্ধুর আনা মাছ সে অমনভাবে খেতে পারত না। দিনের বেলা বন্ধু-ঠাকুরপোর সঙ্গে তার নানান ফাষ্টিনষ্টি। প্রিয়দর্শীর প্রতি প্রিয়বান্ধবীর ব্যবহার। গুন্ গুন্ করে গান গায়। ফাই ফরমাশ করে অনায়াসে। বলে, উনানে ডালটা বসানো থাকল, নজর রেখ, আমি স্নানটা সেরে আসি। হুকুম চালায় নির্বিবাদে, আলুর পাঁপড় পাওয়া যায় কিনা দেখবে তো বাজারে।

প্রিয়দর্শী বলে, ও কথা বন্ধুকে ব'ল বরং। ওসব আলুর পাঁপড় আর লঙ্কার আচার কোথায় পাওয়া যায় আমি জানি না।

শ্রবণা মুখ টিপে হেসে বলে, বন্ধু-ঠাকুরপোর কি মাথা-ব্যথা পড়েছে বাজারে যাবার? সে তো আর পাতানো-বোন নিয়ে সংসার পাতেনি!

তখন ভেবেই পায় না প্রিয়দর্শী এই মানুষ কেন সেদিন ওভাবে ক্ষেপে উঠে বলেছিল, লজ্জা করে না আপনার সন্ধ্যার পর এভাবে আমার ঘরে ঢুকতে?

ধুরন্ধর বন্ধুর সন্ধানী দৃষ্টিকে কিন্তু বেশীদিন ঠেকিয়ে রাখা গেল না। কদিন পরে সে নিজে থেকেই প্রশ্নটা তুলল দুপুর বেলা। ভারার উপর দাঁড়িয়ে এগ্-টেম্পারা ওয়াশ লাগাচ্ছিল প্রিয়দর্শী ম্যুরাল ছবির গায়ে। নিচে থেকে বন্ধু হাঁক পাড়ে, দাদা, তোমার ও শিল্পের স্বর্গ থেকে একটু অধঃপতন করবে নাকি? দু-ভাঁড় চা এনেছিলাম।

প্রিয়দর্শী হাসে। চা-চা মন করছিল ওর নিজেরও। তুলিটা ধুয়ে নিয়ে

ঘরাঞ্চি বেয়ে নেমে আসে নিচে। বেঞ্চির কোণায় বসে পড়ে বঙ্কুর পাশে। শুধু চা নয় দু-টুকরো বান্-রুটিও নিয়ে এসেছে বঙ্কু। দু-বন্ধু চা-রুটি খেতে থাকে মৌজ করে।

চোখবুজে রুটি চিবাতে চিবাতে বঙ্কু বলে, ভাবীজির সঙ্গে ঝগড়া হল কি নিয়ে?

—ঝগড়া? ঝগড়া হবে কেন? কে বলেছে?

এক চুমুক চা খেয়ে নিয়ে বঙ্কু বলে, লছমনিয়া!

—লছমনিয়া কে?

—তোমার বাড়ির ঠিকে ঝি।

—কী বলেছে সে?

বঙ্কু রুটিতে আর এক কামড় দিয়ে বলে, দেখ প্রিয়দা, জেরা করব আমি। তুমি আসামী, জবাব দিয়ে যাবে। তা নয়, তুমিই জেরা করে চলেছ ক্রমাগত!

—কিন্তু লছমনিয়া কী বলেছে না জানলে কি কৈফিয়ৎ দেব? লছমনিয়া দেখেছে আমরা দুজন ঝগড়া করছি?

না, তা দেখেনি; কিন্তু সে দেখেছে সকাল বেলা তোমার বিছানাটা গোটানো থাকে বাইরের ঘরে। ভাবীজি সেটা রোজ নিয়ে যায় শোবার ঘরে, আর সন্ধ্যাবেলা তুমি সেটা এঘরে টেনে আন। বল, মিছে কথা বলছি?

প্রিয়দর্শী জবাব দেয় না। আপন মনে রুটি চিবাতে থাকে।

গম্ভীর হয়ে বঙ্কু বলে, এটা কি ঠিক হচ্ছে দাদা? কচি-কাচা একটা বউ নিয়ে এসেছ, বাপ মায়ের কাছ থেকে কত দূরে! তারপর এসব কি?

হো হো করে প্রিয়দর্শী হেসে ওঠে, কচি-কাচা আবার কোথায় দেখলি তুই?

বঙ্কু কিন্তু গম্ভীর হয়েই বলে, কথা চাপা দিও না দাদা। বল, এসব কি ভাল?

বাধ্য হয়ে গম্ভীর হতে হয় প্রিয়দর্শীকেও। বলে, সে অনেক কথা রে বঙ্কু! তুই বুঝবি না! ও দিনের বেলায় একরকম রাতের বেলায় অন্যরকম।

বঙ্কু বলে, সে ভাবীজি একা নয়। সব মেয়েছেলেই তাই। দিনকা মোহিনী, রাতকা বাঘিনী! আবার উল্টোটাও আছে। সারাদিন ধরে যে মেয়ে তার মরদকে খিস্তি-খেউর করলো, রাতের বেলা তারই গলা জড়িয়ে ধরে ঘুমায় নিশ্চিন্তে।

প্রিয় বলে, এর ব্যাপার তা নয়; এ অন্য জিনিস—তোকে বোঝাতে পারব না।

—বোঝাতে হবে না আমাকে। কবে থেকে ভিন্ন শয্যার পালা গানট চলছে বাৎলাও দিকিনি!

প্রিয়দর্শী একটা সিগ্রেট ধরিয়ে বন্ধুকে একটা বাড়িয়ে দেয়। হাতে মুঠোয় ধরে সেটাতে হুস্ হুস্ করে ক'টা টান দেয়, তারপর এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে, মাইরি বলছি প্রিয়দা, কিছু মনে কর না, তুমি একটি মাকড়া!

—মাকড়া মানে?

—মাকড়া মনে মাকাল ফল! ন্যালাক্যাবলা! এমন খানদানী খাবসুরৎ বদন তোমার, আর বউ ঘরে শুতে দেয় না তোমাকে—

প্রিয়দর্শী বলে, তুই একটা যাচ্ছেতাই!

হো হো করে হেসে ওঠে বন্ধু, বলে—ঠিক আছে! তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না—আমিই ম্যানেজ করে দেব!

—না না, এসব ব্যাপারে তুই মাথা গলাস্ নে! এ অত্যন্ত ডেলিকেট ব্যাপার।

হ্যাঁ হ্যাঁ জানা আছে আমার!—হাসতে হাসতে চলে যায় বন্ধু।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় দুই বন্ধু ফিরে এসে দেখে শ্রবণার তখনও গা ধোয়া হয়নি।

—ভাবীজি শিগ্‌গির! এক্ষণি তৈরী হয়ে নাও। আজ সিনেমা দেখাব তোমাকে।

সিনেমা? সিনেমা কোথায় হবে!

আমাদের 'হলে'ই। ট্রায়াল শো। প্রজেক্টার মেসিন-এর পরীক্ষা হবে! সাড়ে ছয়টায়; ঝট পট তৈরী হয়ে নাও!

শ্রবণা বলে, ওমা, আগে বলনি কেন, আমি যে রাতের কিছু রান্না করে রাখিনি।

—তার জন্যে চিন্তা নেই। আজ আমি তোমাদের খাওয়াব, রেঁধে খাওয়াতে পারব না। হোটেলে অর্ডার দিয়ে আসছি। তন্দুরী রুটি আর মুর্গী। পাঞ্জাবি খানা।

বন্ধু যা করবে তা করে ছাড়বে। শ্রবণা দু একবার আপত্তি করেছিল। জানুয়ারী মাসের নির্মেঘ আকাশে অকালে মেঘ জমেছে। রাত্রে ঝড় বৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু সে সব কথা কে শোনে! বৃষ্টি যদি নেহাৎই হয় তবে ভিজতে

হবে। তাই বলে 'ট্রায়াল শো' তো আর কাল হবে না ? ওঠ ওঠ ; তৈরী হয়ে নাও। বঙ্কু তখনই হোটেলে অর্ডার দিয়ে আসতে ছোটে।

প্রিয়দর্শী বলে, কি করবে ? যাবে সিনেমা দেখতে ?

শ্রবণা নির্বিবাদে বলে, তোমার যদি আপত্তি থাকে তুমি খালি বাড়ি পাহারা দাও ! আর কেউ তো কখনও সিনেমা দেখবার নামও করে না ! আমি কেন যাব না ?

অগত্যা প্রিয়দর্শীকেও সঙ্গে যেতে হয়।

সিনেমা হল ফাঁকা। যন্ত্রের পরীক্ষা হচ্ছে। পুরো একটি ফিল্ম দেখানো হচ্ছে। দেখা হচ্ছে সব যন্ত্রপাতি ঠিকমত কাজ করে কিনা। প্রিয়দর্শী আর শ্রবণা গিয়ে বসে এক ধারে। দ্বিতলের ফাঁকা ড্রেসসার্কেলে। বঙ্কু চায়ের জোগান দেয়। অন্যান্য কর্মীরা এসে জিজ্ঞাসা করে যায়, কেমন দেখছে, কেমন লাগছে।

শো ভাঙল রাত প্রায় নয়টায়। ইতিমধ্যে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। পথে জল কাদা। একটা টাঙ্গা ভাড়া করে ওরা ফিরে এল আবার প্রিয়র বাড়িতে। বঙ্কুর ব্যবস্থা মত খাবার এল হোটেল থেকে। খাওয়া দাওয়া মিটতে যার নাম রাত দশটা ! প্রিয়দর্শী লক্ষ্য করে দেখে শ্রবণার দ্বিতীয় সত্তাটা এখনও মাথা তোলেনি। বেশ স্ফূর্তিবাজের মতই সে খাবার পরিবেশন করছে। হাসিখুশী মানুষটা এখনও একতিলও বদলে যায়নি। অথচ অন্যদিন সন্ধ্যার পর থেকেই যে কেমন যেন গম্ভীর হয়ে যেতে থাকে। আজ তার কোন লক্ষণই নেই !

বঙ্কু মুর্গীর ঠ্যাঙ চিবাতে চিবাতে বলে, জানেন ভাবীজি, দিল্লীতে দাদা একদিন আমাকে বলেছিল—'ঐ তোমাদের প্যার-প্রেম-মহব্বৎটা আমি বুঝিনা ! কেউ যদি আমাকে বিরক্ত না করে তবে সারাজীবন একা একাই থাকতে চাই আমি !'

শ্রবণা হেসে বলে, বিয়ের আগে সব পুরুষ মানুষই তাই বলে।

তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে বঙ্কু, কক্ষনোও নয় ! আমি তা মোটেই বলি না। আপনার বোন টোন যদি থাকে পরখ করে দেখতে পারেন।

শ্রবণা বলে, বোন অবশ্য আমার নেই। তবে সেজন্য দুঃখ নেই। লক্ষ্মীমন্ত একটি বউ শিগ্‌গিরই জোগাড় করে দেব আমরা !

বঙ্কু বলে, এই আশ্বাস পাব বলেই তো ভাবীজিকে সিনেমা দেখাচ্ছি, মুর্গী খাওয়াচ্ছি !

খাওয়া দাওয়া মিটিয়ে দু-বন্ধু যখন সিগারেট ধরালো তখন আবার বৃষ্টি নামল নতুন করে। প্রিয়দর্শী বলে, এঃ! আবার বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। বঙ্কুর খুব অসুবিধা হবে তো। টাঙ্গা পাওয়া যাবে এত রাত্রে?

বঙ্কু টান টান হয়ে পড়ে। বলে, বঙ্কুর কোন অসুবিধা হবে না। সে তোমাকে ভাবতে হবে না দাদা। যে ভরপেট খেয়েছি, আজ রাতে আর নড়ছি না আমি। ভাবীজি, একটা কম্বল-টম্বল দিয়ে যান। এ ঘরেই পড়ে থাকব রাতটা।

প্রিয়দর্শীর গুটিয়ে রাখা বিছানাটা সে পেতে নেয়। হাত দিয়ে ঝেড়ে ঝেড়ে দিব্যি গুটি গুটি মেরে শুয়ে পড়ে!

প্রিয়দর্শী রীতিমত ঘাবড়ে যায়, বলে, তাই কি হয়? তুমি না ফিরলে ওরা ভীষণ ভাব্‌বে যে?

—ওরা আবার কারা? রামদীন দারোয়ান? সে মোটেই ভাববে না। তাকে বলেই এসেছি, রাত বেশী হয়ে গেলে আমি আর ফিরছি না!

শ্রবণা কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকে।

প্রিয়দর্শী তার দিকে একনজর দেখে নেয়। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায় ওর। এইবার বোধহয় শ্রবণার পরিবর্তনটা আসছে। এখনই কান্নায় ভেঙে পড়বে বুঝি সে। কিন্তু সে সব কিছুই হল না। নিঃশব্দে সে চলে গেল পাশের ঘরে। প্রিয়দর্শী বঙ্কুর হাত দুটি ধরে ফিস্ ফিস্ করে কি যেন বলতে চায়—কিন্তু সুযোগ হল না। শ্রবণা ফিরে এল একটা কম্বল হাতে নিয়ে। বললে, তাহ'লে রাত করে আর লাভ কি? শুয়ে পড়া যাক্। প্রিয়র দিকে ফিরে বলে, তুমি কি বঙ্কুর কাছেই শোবে নাকি?

প্রিয়দর্শী জবাব দেবার আগেই হাঁ হাঁ করে ওঠে বঙ্কু, আরে সর্বনাশ! তাহ'লে তো এই বৃষ্টি মাথায় করে এখনই আমাকে রওনা দিতে হয়। যাও যাও, দাদা!

কি করবে, কি বলবে স্থির করে উঠ্‌তে পারে না প্রিয়।

শ্রবণাই তখন বলে, আমার ঘরের দরজা খোলাই রইল। আমি শুয়ে পড়ছি। বড্ড ঘুম পাচ্ছে!

বাইরে তখন অঝোরধারে অকাল বর্ষণ হচ্ছে!

* * * *

ভোর রাতে একটা হাঁকাহাঁকিতে ঘুমটা ভেঙে গেল বঙ্কুর। ধাক্কা খেয়ে ঘুম ঘুম চোখে উঠে বসে বেচারি, কী ব্যাপার?

—তোর ভাবীজি নেই !

—ভাবীজি নেই মানে ? কোথায় নেই ?

—কোথাও নেই !

—সে কি ?

সবে সকাল হচ্ছে তখন। বৃষ্টিধৌত আকাশে লেগেছে প্রথম আবীরের ছোঁওয়া। ফুলের বাগানের উপর কাল রাতে ঝড় বয়ে গেছে। চন্দ্রমল্লিকা আর ডালিয়াগুলো কাত হয়ে পড়েছে। জল জমে আছে এখানে ওখানে। দুই বন্ধু সমস্ত বাড়িটা তন্নতন্ন করে খোঁজে ! নেই, কোথাও নেই শ্রবণা। সদরের দরজাটা খোলা। শ্রবণার হাত ব্যাগটাও নেই। থাকার মধ্যে আছে একখানা চিঠি। শ্রবণার বালিশের তলা থেকে শেষ পর্যন্ত উদ্ধার হল সেটা। কোন সম্বোধন নেই তাতে। শুধু লেখা আছে :

"পারলাম না। আমাকে মাপ ক'র। খুঁজবার চেষ্টা ক'র না আমাকে। তোমার স্ত্রী অথবা বিধবা বোন পুরোপুরি কোনটাই হ'তে পারব না আমি।— শ্রবণা।"

বন্ধু বলে, এর মানে ?

উদাস দৃষ্টি মেলে বসেছিল প্রিয়দর্শী, বলে, জানি না !

ধমকে ওঠে বন্ধু, কাব্যি করার সময় নয় এটা প্রিয়দা ! ভাবীজির নাম তো বৈশাখী, শ্রবণা কে ? শ্রবণা লিখল কেন ভাবীজি ?

প্রিয়দর্শী বলে, আমিও তো তাই ভাব্‌ছি !

—শ্রবণা কে, তা তুমি জান না ?

জানি ! কিন্তু সেকথা বোঝাতে গেলে তোকে অনেক কথা বলতে হবে।

—তবে থাক ! চল, এক্ষণি স্টেশনে যেতে হবে। এখন কোন ট্রেন আছে নাকি ? গেলে কোথায় যেতে পারে ভাবীজি ?

—রাঁচিই যাবে বোধ হয়, অথবা বোম্বাই !

—ভাবীজির বাপের বাড়ি কোথায় ?

—বোম্বাই !

—ঠিক আছে !

দুই বন্ধু তখনই রওনা হয়ে পড়ে স্টেশনের উদ্দেশ্যে।

স্টেশনের দিকে কিন্তু শ্রবণা আদপেই যায়নি। বাসস্ট্যাণ্ডে গিয়ে প্রথম

বাস ধরে সে চলেছিল বোম্বাই। পূর্বদিন খবরের কাগজে সে দেখেছিল ডাঃ ভি. সদারঙ্গনী বোম্বাইয়ে মনোবিজ্ঞানীদের কি একটা সম্মেলনীতে বক্তৃতা দিয়েছেন। সম্মেলনী এখনও চলছে। ডাক্তার সাহেবকে বোম্বাইতেই পাওয়া যাবে।

ইণ্ডিয়া গেটের কাছে বিখ্যাত তাজ হোটেল। সেখানেই এসে উঠেছেন ডাক্তার সদারঙ্গনী পালিতা কন্যাকে নিয়ে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের নানান প্রতিষ্ঠানে, ক্লাবে, মনোবিজ্ঞানীদের সম্মেলনীতে বক্তৃতা-পার্টি-ডিনারের নানান আমন্ত্রণে ডাক্তার সাহেবের প্রতিটি মিনিট কর্মচক্রে বাঁধা। চার-পাঁচ দিন সকাল-সন্ধ্যে ডাক্তার সাহেবের এনগেজমেণ্ট-প্যাডে একটুও ফাঁক নেই। কিন্তু তারই মধ্যে তাঁকে সময় করে নিতে হল। এই উদ্দেশ্যেই তাঁর বোম্বাইয়ে আসা। শ্রবণা যে এভাবে এসে হাজির হতে পারে এটা তিনি আশঙ্কা করেন নি। তাকে কোন প্রশ্ন করলেন না তিনি। কেন এভাবে ছুটে পালিয়ে এসেছে, ডায়েরিটা সে আদৌ লিখেছে কিনা, সঙ্গে এনেছে কিনা—কোনও প্রশ্ন করলেন না। সহজ গলায় বললেন, ভালই হয়েছে তুমি এসেছ। আমার পক্ষে কাজটা সহজ হবে।

—কোন কাজ?

—তোমার বাবাকে খুঁজে বার করা। আমার মনে হয়, কোথাও একটা প্রচণ্ড ভুল হয়েছে তোমার। তুমি এবং প্রিয় সহোদর ভাই বোন হতেই পার না!

শ্রবণা অবোধ দৃষ্টি মেলে শুধু তাকিয়ে থাকে।

বিশ্বাস হচ্ছে না, না? কিন্তু না, আর একটা কথাও নয়। তুমি এখনি তৈরী হয়ে নাও। আমি তোমাকে নিয়ে তোমার বাবার কাছে যাব।

একটা ট্যাক্সি নিয়ে দুজনে তখনই রওনা হয়ে পড়েন জুহুর দিকে। শ্রবণার নির্দেশে ডাইনে-বাঁয়ে বাঁক নিতে নিতে অবশেষে ট্যাক্সিটা এসে দাঁড়ায় ওদের বাড়ির কাছাকাছি রাস্তাটার উপর। দুজনে ট্যাক্সি থেকে নেমে এগিয়ে আসেন। শ্রবণা অবাক হয়ে দেখে যেখানে ছিল তাদের নড়বড়ে ভাঙা বাড়িটা সেখানে প্রকাণ্ড একটা ধ্বংসস্তূপ। অনেক লোকজন কাজ করছে জায়গাটায়—ইট-কাঠ-জানলা-দরজা থাক দিয়ে রাখা হচ্ছে একদিকে। লরী বোঝাই হয়ে চলে যাচ্ছে—কে জানে কোথায়।

কোন্‌টা তোমাদের বাড়ি প্রশ্ন করেন সদারঙ্গনী।

সেকথার উত্তর না দিয়ে শ্রবণা এগিয়ে যায় ধ্বংসস্তূপের দিকে। হ্যাট মাথায় খাঁকি প্যাণ্ট পরা যে ছেলেটি মজুরদের নির্দেশ দিচ্ছিল তাকে প্রশ্ন করে—এ বাড়িতে যাঁরা থাকতেন তাঁরা কোথায়?

ছেলেটি শ্রবণাকে আপাদ-মস্তক একবার দেখে নিয়ে বলে, ধ্বংসস্তূপের নিচে নয় নিশ্চয়।

—আপনি জানেন না তাঁরা কোথায়?

—না।

ডাক্তার সাহেবও এগিয়ে এসেছেন ততক্ষণে, কি ব্যাপার বল তো?

—বাপি এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। কোথায় তা ইনি জানেন না।

—পাড়ায় অন্য কেউ বলতে পারবে?

—সম্ভবত নয়। পাড়ার কারও সঙ্গে তাঁর বিশেষ সদ্ভাব ছিল না।

—বুঝলাম। এখন তাহলে কি করা যায়?

—প্যাটেল সাহেবের বাড়িতে চলুন।

—চল। কিন্তু প্যাটেল সাহেব কে?

ট্যাক্সিতে উঠে বসে শ্রবণা বোঝাতে থাকে। বলে, যে সুরযভাই প্যাটেল হচ্ছেন সেই কোম্পানীর ম্যানেজার যেখানে ওর বাপি কাজ করতেন। এই প্যাটেলের বাড়িতেই প্রথমটায় প্রিয়দর্শী অতিথি হয়ে উঠেছিল।

প্রিয়দর্শীর প্রসঙ্গ ওঠায় সদারঙ্গনী জানতে চান শ্রবণা তাকে কী কৈফিয়ৎ দিয়ে এসেছে এভাবে হঠাৎ চলে আসার। শ্রবণা তার চিঠি লিখে আসার কথা স্বীকার করে। তাদের সাতদিনের নূতন সংসারের মোটামুটি একটা বর্ণনা দেয়। বন্ধুর পরিচয় দেয়। শুধু বর্ষণসিক্ত শেষরাত্রির অভিজ্ঞতাটা আর বলে না।

আবার ঘুর পথে ট্যাক্সি চলতে থাকে— জুহু থেকে বান্দ্রার দিকে। সমুদ্রের কিনারে কিনারে। ডাক্তার সাহেব পাইপটা ধরিয়ে নেন। হঠাৎ কী কারণে এমনভাবে ছুটে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হল শ্রবণা বুঝে উঠতে পারেন না। এ বিষয়ে তাঁকে জেনে নিতে হবে, কিন্তু এখন সে পরিবেশ নয়। ডায়েরিটা লিখেছে কিনা নির্দেশমত তাও জানতে হবে।

নির্দিষ্ট ঠিকানায় ট্যাক্সিটা এসে দাঁড়াল।

শ্রবণা নেমে গিয়ে কলিংবেলটা স্পর্শ করে।

অল্প পরে দ্বার খুলে বেরিয়ে এলেন স্বয়ং প্যাটেল সাহেব। হঠাৎ দ্বারপ্রান্তে শ্রবণাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়ে যান।

—কী? চিনতে পারছেন না, না কি?—প্রশ্ন করে শ্রবণা।

—না, আমি তো ঠিকই চিনতে পারছি; কিন্তু আপনি আমাকে চিনছেন কেমন করে?

—কেন? আপনাকে না চিনবার কি আছে? এ কয়দিনে এমন কি পরিবর্তন হয়েছে আপনার?

এতক্ষণে ডাক্তার সাহেবও নেমে এসেছেন ট্যাক্সি থেকে। শ্রবণা তাঁর সঙ্গে সুরযভাইয়েব পরিচয় করিয়ে দেয়, ডাক্তার ভি. সদারঙ্গনী, বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ চিকিৎসক, বোম্বাইয়ে এসেছেন মনোবিজ্ঞানীদের সম্মেলনীতে যোগ দিতে;—আর ইনি মিঃ সুবযভাই প্যাটেল, দিভেচা প্রডাকসন্সের প্রডাকসন ম্যানেজার।

প্যাটেল ডাক্তার সাহেবের হাতটা আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করে। করমর্দন করে, বলে, আপনার নাম শুনেছি, পরন্তু কাগজে আপনার বিবৃতিও পড়েছি, আজ চাক্ষুষ দেখার সৌভাগ্য হল। আসুন।

তাবপর শ্রবণার দিকে ফিরে বললে—আমাব পরিচয়টা কিন্তু ঠিক হল না শ্রবণা দেবী। আমি দিভেচা প্রডাকসন্সের ম্যানেজার নই আর।

তাই নাকি? আপনি নিজে থেকে ছাড়লেন, না দিভেচা ছাড়ল আপনাকে?

সে প্রশ্নটাই ওঠে না। কোম্পানি উঠে গেছে।

—বলেন কি! শুভ-সংবাদ!

বলছি সব। আসুন ভিতরে গিয়ে বসি।

প্যাটেল বিপত্নীক, একাই থাকে এ ফ্ল্যাটে। ছেলে-মেয়েরা অন্যত্র ছাত্রাবাসে থেকে পড়াশুনা করে। এ বাড়িতে আগেও এসেছে শ্রবণা, স্টুডিওতে যাওয়ার পথে। তিনকামরার ফ্ল্যাট। এক তলায় দুখানি ঘর, একটা বাইরের লোকদের নিয়ে বসাবার ঘর, দ্বিতীয়টি সুরযভাইয়ের শয়ন কক্ষ। এ ছাড়া গ্যারেজের উপর মেজানাইনে আর একখানা নিচু-মাথা কামরা আছে ওর, সেটা গেস্টরুম। সেটাতেই থাকতে দিয়েছিল প্রিয়দর্শীকে। ওর ছেলে-মেয়েরা ছুটি-ছাটায় এলে ঐ ঘরেই আশ্রয় নেয়। অতিথিদের নিয়ে এসে বসায় ড্রইংরুমে।

সুরযভাই সদারঙ্গনী সাহেবের দিকে ফিরে বলে, শ্রবণা দেবী যে এত শীঘ্র ভাল হয়ে উঠবেন, তা আমি ভাবিনি। আপনি যাদু জানেন!

শ্রবণা বলে, তার মানে? আমি আবার খারাপ হলাম কবে?

সুরযভাই জবাব দেয় না। ইতস্ততঃ করে।

সদারঙ্গনীই অতঃপর প্রশ্ন করেন, শ্রবণার যে স্মৃতিভ্রংশ হয়েছিল তা আপনি কি করে জানলেন?

—প্রিয়দর্শী আমাকে রাঁচি থেকে চিঠি লিখে সব কথা জানিয়েছিল।

ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে শ্রবণার দৃষ্টি বিনিময় হয়।

সদারঙ্গনী এ প্রসঙ্গের ছেদ টেনে বলেন, এঁর বাবা কোথায় আছেন, আপনি বলতে পারেন?

পারি। তিনি আমার এখানেই আছেন।

—আপনার এখানে? মানে এই বাড়িতে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। উপরের ঘরে।

আবার দৃষ্টি বিনিময় হল দুজনার।

শ্রবণা সামলে নিয়ে বলে, এ বাড়িতে কতদিন এসেছেন উনি? হঠাৎ বাড়িই বা ছাড়তে হল কেন?

সুরযভাই সদারঙ্গনীর দিকে ফিরে বলে, আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল।

দুজনে বাইরে বেরিয়ে এলে সুরযভাই বলে; সব কথা কি আমি শ্রবণা দেবীর সামনে খুলে বলতে পারি? মানে···ওঁর বর্তমান মানসিক অবস্থাটা

—না না, ঠিক আছে। আপনি সব কথাই খুলে বলুন। চলুন ঘরে গিয়ে বসা যাক।

অনুমতি পেয়ে প্যাটেল আনুপূর্বিক ইতিহাসটা বিবৃত করে। শ্রবণা নিরুদ্দেশ হওয়াতে শাহজাহান প্রথমটা ভীষণ ক্ষেপে ওঠে। সে সময় শ্রবণা কিম্বা প্রিয়দর্শীর সাক্ষাৎ পেলে শাহজাহানকে বোধকরি খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়তে হত। এদিকে দিভেচার সঙ্গে নিশিনাথের একটা প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ ঘটে। নিশিনাথ কেমন করে যেন জানতে পারেন তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রিয়দর্শীকে সরাবার উদ্দেশ্যে দিভেচা একটা জঘন্য চক্রান্ত করেছিল। এ ছাড়া দিভেচার চরিত্রের আর একটা কেদাক্ত দিকও হঠাৎ নজরে পড়ে যায় নিশিনাথের। সংঘর্ষ যখন চরম আকার ধারণ করে তখন অনেক লোকসান করে দিভেচা ছবি-তোলার ব্যবসাটা একেবারেই গুটিয়ে ফেলে। স্টুডিও বিক্রি হয়ে যায়। নূতন মালিক শাহজাহানকে দারোয়ান দিয়ে বার করে দেয়। লোকটা এমনিতেই আধ পাগলা ছিল, এবার একেবারে দেহে-মনে ভেঙে পড়ে। এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল শাহজাহানের বাড়িওয়ালা। ভাড়াটিয়া উচ্ছেদের শেষ চেষ্টা শুরু করে দিল সে পূর্ণ উদ্যমে। রাতের অন্ধকারে গলির মুখে কারা

এসে শাহজাহানকে প্রচণ্ড প্রহার করল একদিন। নিশিনাথ খবর পেয়ে সুরযভাইকে নিয়ে শাহজাহানের সঙ্গে দেখা করলেন। সে তখন শয্যাশায়ী। বাধ্য হয়ে তাকে স্থানান্তরিত করা হল। সুরযভাইয়ের ফ্ল্যাটে একটা বাড়তি কামরা ছিল। আপাতত তাতেই এনে তোলা হয়েছে তাকে। ফিল্ম এমপ্লইজ বেনিফিসিয়ারি ফাণ্ড নামে একটা তহবিল খোলা হয়েছিল কয়েক বছর আগে। নিশিনাথ তার একজন ট্রাস্টি। প্রধানত তাঁরই প্রচেষ্টায় এই পঙ্গু চিত্রশিল্পীর জন্য একটা পেনসনের ব্যবস্থা হল। শাহজাহান আর বিশেষ নড়াচড়া করতে পারে না। কোন রকমে উঠে বাথরুম পর্যন্ত যেতে পারে। একতলায় নামতে পারে না।

ডাক্তার সাহেব প্রশ্ন করেন, শ্রবণার উপর ওর মনোভাবটা কেমন? সে দেখা করতে এসেছে শুনলে শাহজাহান খুশী হবে, না ক্ষেপে উঠবে?

একটু ভেবে নিয়ে প্যাটেল বলে, সে কথা বলা অসম্ভব। কিছু দিন আগে পর্যন্ত তো সে শ্রবণা দেবীর নামটা পর্যন্ত সহ্য করতে পারত না কিন্তু প্রিয়দর্শীর চিঠিখানা আসার পর—

—প্রিয়দর্শীর চিঠি শাহজাহান দেখেছে?

—হ্যাঁ দেখেছে। সুযোগ পেলে আমি হয়তো তার কাছ থেকে ব্যাপারটা গোপন রাখতাম, কিন্তু সে সুযোগ আমি পাইনি। চিঠিটা যখন এসেছিল তখন আমি বাড়ি ছিলাম না। চাকরটা ডাকবাক্স থেকে সেটা নিয়ে শাহজাহানকেই প্রথমে দেয়। সেই প্রথমে পড়েছিল প্রিয়দর্শীর চিঠিখানা।

—খামে চিঠি দেয়নি প্রিয়দর্শী?

—দিয়েছিল, খামের উপর প্রেরকের নামও লেখা ছিল। কিন্তু শাহজাহানকে আপনি চেনেন না—এসব সৌখীন এটিকেটের ধার সে ধারে না। অম্লানবদনে আমার চিঠিখানা খুলে পড়েছিল।

—কি লিখেছিল প্রিয়দর্শী।

—যে শ্রবণা দেবী একটা মানসিক ব্যাধিতে ভুগছেন। মানুষজন চিনতে পারছেন না। আপনার চিকিৎসায় বাঁচিতে আছেন। ওঁদের বিবাহ আপাততঃ স্থগিত রাখতে হয়েছে।

একটুক্ষণ চুপ করে ডাক্তার সাহেব কি যেন ভেবে নেন। তারপর বলেন, আপনি শাহজাহানকে আমার পরিচয়টা দিন। বলুন যে, আমি দেখা করতে চাই তার সঙ্গে।

—শ্রবণা দেবীও যে এসেছেন সে কথা জানাব?

—না। আমি একাই এসেছি।

—বেশ।

প্যাটেল উপরে উঠে যায়। ডাক্তার সাহেব শ্রবণাকে বলেন, তুমি দরজার পাশে থাকতে পার। সব কথাই জানতে পারবে তুমি। তোমার কাছ থেকে গোপন করার কিছুই নেই।

একটু পরে প্যাটেল ফিরে আসে। ডাক্তার সাহেবকে নিয়ে যায় উপরের ঘরে। গ্যারেজের উপর মেজানাইন ঘরে। নিচু চাল লম্বাটে ধরনের ঘর। ঘরের শেষ প্রান্তে আর একটি দরজা, বোধহয় বাথরুম আছে সেদিকে। জানলার নিচে চৌকিতে শুয়েছিল শাহজাহান। তার পায়ের কাছে দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে একটা বড় অয়েল পেইন্টিং। ছবিটি দেখেই চিনতে পারেন। ডাক্তার সাহেব হাত তুলে নমস্কার করেন শাহজাহানকে, একটা টুল টেনে নিয়ে বসেন চৌকির পাশে। শাহজাহান প্রতি-নমস্কার করে না। ভ্রূকুটি কুটিল দৃষ্টিতে সদারঙ্গনীকে যাচাই করতে থাকে। ডাক্তার সাহেব বসবার আগেই বলে, আপনাকে এখানে কে পাঠিয়েছে? আমি পাগল নই। আমার চিকিৎসারও কোন দরকার নেই। আমাকে বিরক্ত করবেন না।

সুরযভাই মরমে মরে যায়। ডাক্তার সাহেবের হাঙ্গিতে সে স্থান ত্যাগ করে অবশেষে। সদারঙ্গনী পাইপটা বার করে পাউচ থেকে তামাক বার করতে করতে বলেন, আপনার চিকিৎসা করতে আমি আসিনি। আপনি পাগল যখন নন তখন আমার মত ডাক্তারকে রাঁচি থেকে বোম্বাই এনে চিকিৎসা করাতে গেলে কত খরচ হতে পারে তার হিসাবটা নিশ্চয় করতে পারবেন? কে দিচ্ছে আপনাকে অত টাকা? এ্যাঁ?

শাহজাহান অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে চুপ করে তাকিয়ে থাকে। পাইপটা ধরিয়ে ডাক্তার সাহেব বলেন, আমি এসেছি ঐ ছবিখানার সম্বন্ধে আলোচনা করতে—

পাইপটা উঁচু করে ছবিখানা তিনি দেখিয়ে দেন।

—বটে! কিন্তু আমি আপনার মত অর্বাচীন চিত্ররসিকের সঙ্গে ঐ শিল্পকর্মটি নিয়ে আলোচনা করব এ ধারণা হল কেন আপনার?

সদারঙ্গনী চোখ বুজে পাইপটা টানতে টানতে বলেন, আমার ধারণা আপনার নিজের গরজেই তা আপনি করবেন।

শাহজাহান বালিশের তলা থেকে বিড়ি দেশলাই বার করে। ফুঁ দিয়ে বিড়িটাকে ঠিক করে নেয়। ঠোঁটের কোণায় সেটাকে চেপে ধরে আগুন জ্বালে। তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে, এখানেও ভুল হয়েছে আপনার।

আপনার পেসেণ্ট মরল কি বাঁচল আমার কোন গরজ নেই তাতে !

—আমার পেসেণ্ট মানে ?

—মানে যে মেয়েটা তার অথর্ব পঙ্গু বাপকে ফেলে নাগরের হাত ধরে পালিয়ে গিয়েছিল এবং আপনার পাগলা গারদে আটক আছে !

সদারঙ্গনী হেসে বলেন, কিন্তু আপনারও যে ভুল হল শাহজাহান সাহেব। আমার পেসেণ্ট আপনার মেয়ে শ্রবণা নয়, তার মা মমতা !

একেবারে চুপ করে যায় শাহজাহান। বার কতক হুস্ হুস্ করে বিড়ি টানে। তারপর হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠে বলে, কথার প্যাঁচে আমাকে কাবু করতে পারবেন না ডাক্তার সাহেব। মমতাকে আপনি দেখেননি, চেনেন না—নামটা শুনেছেন মাত্র শ্রবণার কাছে। এ ছবিটির কথাও তার কাছে শুনেছেন। এ ছবিটি জীবনে এই প্রথম দেখলেন আপনি।

সদারঙ্গনী চুপ করে শুনে যান। বিজ্ঞের হাসি হেসে শাহজাহান আবার বলে, কথা বলছেন না যে ?

—এ ছবির কোন কপি আপনার মেয়ের কাছে ছিল ?

—না, কেন ?

ডাক্তার সাহেব পাশে রাখা ফোলিও ব্যাগ থেকে কাগজ মোড়ানো একটা ছবি বার করে শাহজাহানের হাতে দিলেন নিঃশব্দে।

—এটা কি ?—প্যাকেটের মোড়কটা খুলে শাহজাহান স্তম্ভিত হয়ে যায়। বলে, এ ছবি আপনি কোথায় পেলেন ?

—আপনার স্ত্রীর কাছে।

—সে বেঁচে আছে ?

ডাক্তার সাহেব নির্বাক বসে থাকেন।

—আপনি জবাব দেবেন না ?

—দেব। যদি আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দেন।

বিড়িটায় একটা অন্তিম টান দিয়ে সেটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় শাহজাহান। বলে, কি জানতে চাইছেন আপনি ?

—সে তো আগেই বলেছি। ঐ ছবিটার সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাই।

হঠাৎ ক্ষেপে ওঠে শাহজাহান, ছবির সম্বন্ধে কী আলোচনা করবেন আপনি ? ছবির কি বোঝেন যে, আলোচনা করবেন ? ওটা কিসের ছবি তাই বলুন তো আগে ?

—একটি স্ত্রীলোকের পোর্ট্রেট !

—আজ্ঞে না! ওটা স্টিল লাইফ!

—স্টিল লাইফ মানে?

—ওটা তাজমহলের ছবি। তাজমহল চেনেন? তাজ?

সদারঙ্গনী জবাব দেন না। দুজনেই কিছুটা চুপচাপ। তারপর হঠাৎ সদারঙ্গনী উঠে দাঁড়ান। ছবিখানা শাহজাহানের হাত থেকে ফেরত নিয়ে ব্যাগে ভরে নেন। দ্বারের দিকে চলতে শুরু করতেই শাহজাহান বলে, কি হল? চলে যাচ্ছেন নাকি?

—অগত্যা! আমি এসেছিলাম ঐ ছবিটির সম্বন্ধে জানতে। ধারণা ছিল, ওটা আপনার স্ত্রীর ছবি—মমতাময়ী রায়ের পোর্ট্রেট। তা যখন নয়, তখন আর সময় নষ্ট করে কি হবে?

শাহজাহান দ্বিতীয় একটি বিড়ি বার করে, বলে, বসুন আপনি।

সদারঙ্গনী বসেন। দ্বিতীয় বিড়িটা ধরিয়ে শাহজাহান বলে, আমি বাজে কথা বলিনি! অন্য কেউ বুঝবে না, কিন্তু আপনি পণ্ডিত ব্যক্তি। আপনি বুঝলেও বুঝতে পারেন।

বিড়িতে বার কয়েক টান দিয়ে বলে, কোন শিল্পকর্মেরই বস্তুগত মূল্যমান বলে কিছু থাকতে পারে না। আর্টের ইনট্রিনসিক ভ্যালু বলে কিছু নেই। চিত্রের বেলায় চিত্রকর এবং দর্শকের বোধের নিরিখেই তার মূল্যের বিচার। মনে করুন আমি একটি ফুলের পাপড়ি আঁকতে গেলুম, কিন্তু আঁকার পর আমার সন্দেহ হ'ল ভুল করে একটি রমণীর অধর এঁকে ফেলেছি বুঝিবা। এবং মনে করুন তারপর যখনই আমি সেই ছবিটির দিকে তাকাই একটি অভিমানক্ষুব্ধা রমণীর অধর বই আর কিছু দেখি না। এক্ষেত্রে আমার কাছে সেটা কিসের ছবি হবে? ফুলের পাপড়ি না নারীর অধর? আপনিই বলুন।

সদারঙ্গনী বলেন, আমার তো বলার পালা নয়, আমার এখন শুধু শোনার পালা।

—তবে শুনেই যান। আপনারা মনে করেন শিল্পকর্ম-মাত্রই অনড়, স্থির—অনুভব করতে পারেন না যে তারও বিবর্তন থাকতে পারে, বিশ্বাস করেন না যে তারও রূপ বদলায়। ডোরিয়ান গ্রে'-র ছবি আপনাদের কাছে গল্প-কথা ছাড়া কিছু নয়; কিন্তু শিল্পীর কাছে শিল্পের রূপ বদলায়। কোন রমণীর চিত্র তাজের স্বপ্নে রূপান্তরিত হতে পারে।

ডাক্তার সাহেব এতক্ষণে বলেন, মেনে নিলাম। কিন্তু আপনি নিজেই বলেছেন 'চিত্রের মূল্যমান নির্ভর করে চিত্রকর এবং দর্শকের বোধের নিরিখে।'

এক্ষেত্রে দর্শক যদি চিত্রকরের সঙ্গে একমত না হয় আপনি তাকেই বা দোষ দেবেন কেমন করে ?

বার কয়েক বিড়িতে টান দিয়ে শাহজাহান বলে, না। দোষ দেব না।

—সে ক্ষেত্রে দর্শকের কৌতূহল চরিতার্থ করবার দায়ও আপনার। কেন ওর ওষ্ঠপ্রান্তে ঐ ছলনাময়ীর হাস্য, কেন ওর দৃষ্টিতে ঐ কৌতুকময়ীর লাস্য ?

আরও বার কয়েক বিড়ি টেনে শাহজাহান বলে, প্রশ্ন করার হক্ আছে আপনার। বলব। আপনাকেই বলব সব কথা। একথা জীবনে কখনও কাউকে বলিনি। আমি আর বেশী দিন নেই। সে হারামজাদীর জ্ঞান-বুদ্ধি যদি কোনদিন ফিরে আসে তাকেও বলবেন ; তাহলে সে হয়তো বুঝবে বাপি লোকটাকে যতখানি ঘৃণা সে করত, অতটা হয়তো তার বাপির পাওনা ছিল না। কিন্তু একটা কথা আমাকে শুধু বলুন। মমতা বেঁচে আছে ?

ডাক্তার সাহেব জবাব দেন না। নীরবে পাইপ টেনে চলেন।

—ঠিক আছে। আপনার এখনও শোনার পালা চল্‌ছে। আমি বক্তা, আপনি শ্রোতা। শুনুন তাহলে। হিমাদ্রী রায়ের গল্প।

জানলা দিয়ে দূর নীলাকাশের দিকে দৃষ্টি মেলে শাহজাহান শুরু করে তার কাহিনী, নৈর্ব্যক্তিক উদাসীনতায়। প্রথম থেকেই তার কোন জড়তা ছিল না। কোন লজ্জা, কোন সঙ্কোচ এসে তাকে বাধা দিল না। যেন তার লেখা একটা গল্পের প্লট বলে চলেছে উর্দু-সাহিত্যিক শাহজাহান। দ্বারের বাইরে উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করে শ্রবণা।

দূর বাঙলা-মুলুকে ক'লকাতার কাছাকাছি চন্দননগরে তার দেশ। বনেদী জমিদার বাড়ি। দোল-দুর্গোৎসব লেগেই থাকত সে বাড়িতে। একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবার। চক মেলানো বিরাট দালান। হুগলী জেলার বিস্তীর্ণ সোনা ফলানো ধানী জমি ছিল ওদের, আয় ছিল জলকর থেকে। পূর্বপুরুষেরা দুহাতে ব্যয় করতেন, চার হাতে আদায় করতেন। এমনি এক সম্ভ্রান্ত বনেদী পরিবারে জ্যোতির্ময় রায়ের মধ্যমপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন হিমাদ্রী রায়। অতবড় একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবারে যে কয়জন স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজের চৌকাঠ মাড়িয়েছেন তা হাতে গুণে বলা যায়। লেখাপড়ার চর্চা মোটেই ছিল না সে পরিবারে। দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের মত হিমু রায় একবারও না ঠেকে টপাটপ স্কুলের ধাপগুলো পার হয়ে ভর্তি হল হুগলীর মহসীন কলেজে। ছোটবেলা থেকেই ছবি আঁকার দিকে তার ঝোঁক। মডেল গড়ার সখ। হিমু রায়ের ঘরে রঙ-তুলি-ঈজেল, কাদা-মাটি-প্ল্যাস্টার অফ প্যারিসের স্তূপে এমন অবস্থা

য়ে থাকত যে, মনে হত শয়নকক্ষ নয়, সেটা কোন আর্টিস্টের স্টুডিও। কি একটা মডেলের হাত বাড়ির ঝি অসাবধানে ভেঙে ফেলেছিল, সেই অপরাধে হিমু রায় কাউকে ঢুকতে দিতে না তার ঘরে। ফলে ঝাঁট পড়ে না ঘরে, পালটে দেয় না কেউ বিছানার চাদর। এমন কি মাকে পর্যন্ত সে ওঘরে ঢুকতে দিত না। অনেক চেষ্টা-চরিত্র করেও যখন কিছু হল না, তখন গাল ছেড়ে দিলেন জাহ্নবী। খুব কিছু দুঃখ ছিল না তাঁর—কারণ ছবি আর মূর্তিগুলো নিয়েই মত্ত ছিল তাঁর ঘরমুখী ছেলে—এই বয়সে ও পরিবারের ছেলেদের সচরাচর অন্যান্য যেসব আনুষঙ্গিক দোষ দেখা যেত হিমু রায়ের সেসব বালাই ছিল না। মাছ ধরায় তার উৎসাহ নেই, মদ সে খায় না, মেয়ে মানুষের দিকে চোখ তুলে তাকায় না, এমনকি সিগারেটটা পর্যন্ত খায় না ছেলেটা। ঘরকুনো ছেলেটা যখন কলেজ থেকে নাম কাটিয়ে ঘরে এসে বসল তখন হিমু রায়ের কাকা আহত হলেও ওর মা জাহ্নবী দেবী দুঃখিত হননি। জ্যোতির্ময় রায় মারা গিয়েছেন তখন তাঁর ছোট ভাই মৃন্ময় রায় তখন বাড়ির কর্তামশাই। হিমু একদিন তাঁকে গিয়ে ধরল, আমি ক'লকাতার কলেজে ভর্তি হব।

—কেন, মহসীন কলেজে কি অসুবিধা হচ্ছে?

—না অসুবিধার কথা নয়; আমি আর্ট কলেজে ভর্তি হব। ছবি আঁকা শিখব।

—ছবি এঁকে কোন চতুর্বর্গলাভ হবে?

—বি. এ, এম. এ, পাশ করেই বা কোন চতুর্বর্গ লাভ হবে?

হিমু রায়ের কথাই ছিল ঐ রকম। ভয়-ডর তার ছিল না একেবারেই। কর্তামশাইয়ের সামনে এমন মুখে মুখে কথা বলতে আর কেউ সাহস করত না।

শেষ পর্যন্ত কর্তা রাজী হলেন। হিমাদ্রী রায় গিয়ে নাম লেখালো সরকারী আর্ট কলেজে।

হিমুরা তিনভাই, এক বোন। বোনের বিয়ে আগেই হয়ে গিয়েছিল। হিমুর দাদারও বিয়ে হল। হিমু ফতোয়া জারি করেছিল—বিয়ে সে করবে না; তাই ওর ছোটভাই বীরেশের বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে। এই সময়ে এমন একটা ঘটনা ঘটল যাতে মোড় ঘুরে গেল ওর জীবনে।

হিমাদ্রীর মেসোমশাই ছিলেন পণ্ডিত ব্যক্তি। জাহ্নবীদেবীর আপন নয়, দূর বোনের স্বামী। ৺বিজয়ায় একখানি করে বাৎসরিক প্রণামী আশীর্বাদীর আদান-প্রদান ছাড়া বিশেষ যোগাযোগ ছিল না দুই পরিবারে। হিমাদ্রী

তো তার মাসী অথবা মেসোকে জীবনে কখনও দেখেইনি। শুনেছিল মেসোমশাই ছিলেন দর্শনের অধ্যাপক, এলাহাবাদের কোন কলেজে অধ্যাপ করতেন। হঠাৎ কদিনের জ্বরে ওর মাসী এবং মেসো একমাসের মধ্যেই মা গেলেন। যতই জানাশোনা না থাক, এমন বিপদে জাহ্নবী চুপ করে থা পারলেন না। সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র তিনি রওনা হলেন এলাহাবাদ, হিমাদ্রি মাকে নিয়ে গেল। মাসতুতো বোন মমতাময়ীকে সেই প্রথম দেখল জীবনে দেখল চরম দুঃখের দিনে। অতিথিদের সে আমন্ত্রণ জানায়নি, তাদে সেবাযত্ন করেনি, মামুলী কুশলপ্রশ্নটা পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করেনি—দুঃখের চর আঘাতে সে মূক হয়ে গিয়েছিল, কান্নার উৎসও বুঝি ফুরিয়ে গিয়েছিল তার তৈলচর্চিত রুক্ষ কেশদাম, বিনাকাজলে কালো দুটি ভাষাহীন চোখ, আ সর্বাবয়বে বিষাদের একটা ব্যঞ্জনা—মমতাময়ীকে দেখে একমুঠো বাসী শিউলি ফুলের কথা মনে পড়েছিল হিমাদ্রী রায়ের।

চন্দননগরে ফিরে এল ওরা। রায় বাড়িতে আশ্রয় লাভ করল অনাথ মেয়েটি। মমতা ছিল বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান—অত্যন্ত আদরে মানুষ স্কুলে পড়ছিল সে। হিমাদ্রী মাকে ধরে পড়ে—এখানেও মমতাকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিতে হবে। কিন্তু তা কেমন করে সম্ভব? রায় বাড়ির কোন মেয়ে সাতজন্মে স্কুলে পড়েনি। গৃহশিক্ষকের কাছে তাদের অক্ষর পরিচয় হত, নামতা আর শুভঙ্করীর আর্যা মুখস্ত করতে হত—তারপর ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরলেই তাদের গহনা আর রাঙা চেলিতে প্যাক করে শ্বশুর বাড়িতে পাচার করার চিরাচরিত ব্যবস্থা ছিল। ফলে এ প্রস্তাবে রায়বাড়ির কর্তৃপক্ষ সায় দিতে পারলেন না। হিমাদ্রী রায়ও নাছোড়বান্দা। বোনকে সে স্কুলে ভর্তি না করে ছাড়বে না। শেষপর্যন্ত কর্তামশাইকে এ বিরোধে মীমাংসা করতে এগিয়ে আসতে হল, বেশ তো, মমতা যদি পড়াশুনা করতে চায় তো করুক না; কিন্তু স্কুলে ভর্তি হওয়ার কি প্রয়োজন?

—কিন্তু কে পড়াবে ওকে? ও ক্লাস নাইনে পড়ে। রমা-মীরার মাস্টার মশাই ওকে কি পড়াতে পারেন?

হিমু পড়াক তাহলে।

কিন্তু হিমাদ্রীর বিদ্যাতে কুলাচ্ছে কই? মমতাময়ী ইংরাজি ছাড়া আর সব কিছুই যে পড়ে হিন্দিতে। এখন সে বাঙলায় পারবে কেন?

—হিমু না পারে তাহলে উপযুক্ত একজন শিক্ষকের সন্ধান কর। আমাদের বাড়ি থেকে কোন মেয়ে কস্মিন কালে স্কুলে পড়তে যায়নি, মমতাও যাবে না।

যে হাঁা, দিনকাল পালটে যাচ্ছে—সে যদি পড়াশুনা করতে চায় আমি বাড়ির কর্তা হয়ে তাতে বাধা দেব না। ওর বাপও ছিলেন পণ্ডিতমানুষ—ও ডুক, পারে তো ম্যাট্রিকটাও পাশ দিক। কিন্তু প্রাইভেটে; স্কুলে নয়।

মমতা জনান্তিকে হিমাদ্রীকে বলেছিল, ছেড়ে দাও হিমুদা, পড়াশুনা আমার হবার নয়।

কিন্তু অত সহজে হাল ছাড়বার পাত্র হিমাদ্রী রায় নয়। সে অনেক খুঁজে খুঁজে বার করল একজন উপযুক্ত শিক্ষককে। নিখিলেশ ত্রিপাঠি। বেনারস হিন্দু য়ুনিভার্সিটির ছাত্র। বি, এ, পাশ। হিন্দি ভাষার মাধ্যমেই পড়াশুনা করেছে। বাজারের এক মারোয়াড়ির গদিতে কাজ করে। অল্প রোজগার। সে পড়াতে রাজী হল। বয়সে হিমাদ্রীর চেয়ে বছর চারেকের বড়ই হবে। এত অল্পবয়সী গৃহশিক্ষক রাখতে আপত্তি জানালেন কর্তামশাই। কিন্তু তাঁর সে আপত্তি ধোপে টিকল না। হিন্দিওয়ালা বৃদ্ধ শিক্ষক কোথায় পাওয়া যাবে চন্দননগরে? অগত্যা নিখিলেশকে বহাল করা হল গৃহ শিক্ষক রূপে।

বছর দুই কেটে গেল তারপর। মমতা সেবার ম্যাট্রিক দেবে। হিমাদ্রীর সেটা আর্ট কলেজে ফাইনাল ইয়ার। ইতিমধ্যে হিমাদ্রী রায়ের যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। সে যতটা বদলেছে তার চেয়েও বেশী বদলেছে তার ঘরটা। দিনে দুবার করে সে ঘরখানায় ঝাঁট পড়ে—বিছানার চাদর কাচা হয়। প্রথমটা প্রবল আপত্তি করেছিল হিমাদ্রী; কিন্তু শেষে হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। মমতা কোন বাধা মানেনি। ক্রমে হিমু উপলব্ধি করেছে, এতে তার অসুবিধার চেয়ে সুবিধাই হয়েছে বেশী। বহুদিন আগে হারিয়ে যাওয়া বার্ণ্ট সিয়ানা আর প্রাশিয়ান ব্লু টিউব দুটো খুঁজে পাওয়া গেল—তিন নম্বর স্যাবল হেয়ার ব্রাশটাও দেখা গেল খোয়া যায়নি। রঙ-তুলি-ঈজেল-পেনসিল-ইরেজার সব কিছুই হাতের কাছে পাওয়া যায়। পেন্সিল বাড়তে হয় না তাকে। যখনই হাত বাড়িয়ে পেন্সিলটা তোলে, দেখে ঠিকমত সীস বাড়ানো আছে। মাটির মডেলগুলোর উপরে জড়ানো ন্যাকড়ায় ঠিক পরিমাণ মত জল পড়ে—শুকিয়ে শক্ত হয়ে যায় না। রঙের টিউবগুলোর মুখ ঠিকমত বন্ধ থাকে—রঙ জমে নষ্ট হয় না আর। মমতাময়ী হিমু রায়ের সহকারী হয়ে ওঠে ক্রমে। হিমাদ্রী বলে, ছবি আঁকা শিখবে?

—ওরে বাবা! ও আমার দ্বারা হবে না। আমার অত ধৈর্য নেই।

তা ঠিক। মেয়েটা চঞ্চল। বাঙ্গী শিউলি ফুল নয়, এখন ওকে দেখলে

খঞ্জনা পাখীর কথা মনে পড়ে যায় হিমাদ্রীর। এ কথাও সে বোঝে যে, চো করলেই কেউ শিল্পী হতে পারে না। সেটা ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা। কিন্তু ইচ্ছা অধ্যবসায় থাকলে শিল্পরসিক হওয়া যায়। অগত্যা মমতাকে সে শিল্পের একত্ত প্রকৃত সমজদার করে তোলার চেষ্টা করে। ইম্প্রেশানিজম্, রিয়ালিজম কিউবিজম, সারবিয়ালিজম সম্বন্ধে জ্ঞানদানের আয়োজন করে। বুঝুক ন বুঝুক মমতা মন দিয়ে শোনে।

একদিন মমতা হঠাৎ বলে বসে, আমার একখানা ছবি এঁকে দেবে হিমুদা

হিমাদ্রী ছদ্মগাম্ভীর্যে জবাব দেয়, না।

—না কেন? আমার বুঝি সখ হয় না?

—তোমার সখ হলে তো চল্‌বে না। দেখতে হবে আমার সখ হচ্ছে কিনা। তোমার চেহারাখানা এমন কিছু আহা-মরি নয় যে, ছবি এঁকে বাঁধিয়ে রাখতে হবে।

—ঈস্! তাই বইকি! আর কারও চোখে সুন্দর হই না হই আমি জানি তোমার চোখে আমি সুন্দরী।

—বটে! সবজান্তা ঠাকুরঝানির এ ধারণা হল কেন শুনি?

—আমি জানি মশাই! বাজে কথা রাখ, বল না এঁকে দেবে?

—দূর! ওরা কী ভাববে?

'ওরা' যে কারা তা বুঝতে অসুবিধা হয় না মমতার। সে মুখ টিপে হেসে বলে, ওরা আবার কী ভাববে? আমি তো তোমায় কিছু ন্যুড-স্টাডি আঁকতে বলছি না।

—ফাজিল মেয়ে কোথাকার!—চী-স্কোয়ারটা তুলে বোনকে ঠ্যাঙাতে যা হিমাদ্রী—মমতা ছুটে পালায়।

মমতার জিদই বজায় থাকল শেষপর্যন্ত। হিমাদ্রী বোনের পোর্ট্রেট আঁকতে শুরু করে। 'ওরা' কে কি ভাবছে এরা তার খোঁজ রাখে না হিমাদ্রীর মা শুধু একবার বলেছিলেন, ওর ঘরে দিনরাত গিয়ে বসে থাকি কেন?

মমতা বলে, সে কথা তোমার ছেলেকেই জিজ্ঞাসা কর মাসী। ও খেয়ালের কি অন্ত আছে? তোমার পাগল ছেলে আমার ছবি আঁকছেন যে

—ও আবার কি কথা? মেয়ে মানুষ আবার ছবি আঁকায় না কি?

তা আঁকায়। মেয়ে মানুষ শুধু ছবিই আঁকায় না, আরও অনেক কি করে। তারা তিল তিল করে মোহজাল বিস্তার করে, রহস্যের কুয়াশা

পুরুষমানুষের সরল স্বচ্ছ দৃষ্টিকে ধোঁয়াটে করে তোলে, বন থেকে আপেল কুড়িয়ে এনে আধখানা ভেঙে দেয়—তার রসাস্বাদনে প্রলুব্ধ করে। হিমাদ্রী রায়ের স্বচ্ছ দৃষ্টিটাও কেমন যেন ঘোলাটে হয়ে ওঠে ক্রমশঃ। এসব কী অদ্ভুত চিন্তা, অশালীন স্বপ্ন! মমতাকে ঘিরে তার মনে এভাবে মোহময়ী দিবাস্বপ্ন জাগছে কেন? মমতা তার মাসতুতো বোন—দুদিন পরেই বিয়ে হবে তার; পরের ঘরে চলে যাবে সে। তার উপর এতটা নির্ভর করছে কেন প্রতি কাজে? তাকে ঘিরে দিবারাত্র তার কল্পনার জাল আপনা আপনি বুনে চলেছে কিসের জন্য। বিবেকের তাড়নায় বেচারি ছটফট করে। শেষে শুভ বুদ্ধিরই জয় হল। সংযত হল হিমাদ্রী। গুটিয়ে নিল নিজেকে। কেমন যেন একটা অপরাধ বোধে নিজের বিবেকের কাছেই অপরাধী হয়ে পড়ে সে।

মমতাময়ী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। হিমাদ্রীর মনের প্রতিটি কথা সে বুঝি অনায়াসে পড়তে পারে। তার প্রতিটি হাসি, প্রতিটি কান্নার ইতিকথা বলে দিতে পারে। ধরা দেওয়া-না-দেওয়ার সীমান্তলোকে সে এমন সন্তর্পণ পদসঞ্চারে ঘোরাফেরা করে যে, হিমাদ্রী আরও পাগল হয়ে ওঠে। ওর মোহজাল বিদীর্ণ করে বিবেকের কেন্দ্রাতিগ বিকর্ষণে ছুটে বেরিয়েও যেতে পারে না ঐ চৌম্বক ক্ষেত্রের বাহিরে; সরাসরি কিছু বলতেও পারে না। রহস্যময়ী রমণীর ভূমিকায় মমতা শুধু হাসে, শুধু মজা দেখে। জালে আটকানো পাখীর ছটফটানি দেখে কৌতুকময়ী শবরী।

ঠিক এই সময়ে এমন একটা ঘটনা ঘটল যাতে প্রচণ্ড আঘাত পেল হিমাদ্রী। মমতাময়ীর অঙ্কের খাতা থেকে আবিষ্কৃত হল একখানি প্রেমপত্র। নিখিলেশের। অর্থাৎ মমতার পূজ্যপাদ মাস্টার মশায়ের। কথাটা জাহ্নবীর কানে গেল। কর্তার কানে অবশ্য ওঠেনি। অনাথা মেয়েটিকে বেশী শাসন করা গেল না, যদিও চিঠির ভাষা থেকেই বোঝা যায় এ পক্ষের যথেষ্ট প্রশ্রয় না থাকলে এতদূর সাহস হত না ও তরফের। চিঠিখানি মমতার পূর্বপত্রের প্রত্যুত্তর।

মাস্টারমশাইকে বিদায় দেওয়া হল। অন্য অজুহাতে। প্রকাশ্যে স্বীকারই করা হল না ব্যাপারটা। মমতাকে অবশ্য গোপনে ডেকে শাসন করলেন জাহ্নবী। হিমুর মা।

মমতা হাঁ-না কিছুই বলে না। মুখটি বুজে সহ্য করে গেল সব তিরস্কার। কর্তামশাই মাস্টার-বিদায়ের সংবাদটা জানতে পেরে প্রশ্ন করলেন, মাস্টারকে হঠাৎ বিদায় করলেন কেন বৌঠান? মমতা কি আর পড়বে না?

মাথার ঘোমটা আর একটু টেনে নিয়ে জাহ্নবী উত্তরে বলেছিলেন, পড়বে না কেন? তবে মেয়ে বড় হয়েছে—এখন আর বাইরের লোকের কাছে পড়া ঠিক নয়। হিমুই পড়াবে ওকে এবার থেকে।

—কিন্তু হিমু যে হিন্দি জানে না?

—আর তো দু-মাস বাকি আছে পরীক্ষার। যা পারে ওই পড়াবে। কিন্তু আপনি মমতার জন্য পাত্রের সন্ধানও করুন।

—পাত্রের সন্ধান তো করছিই আমি। মদনপুরের মুখুজ্জে মশাই আগামী বুধবার ওকে দেখতে আসছেন। মুখুজ্জে মশায়ের ছেলেটির কথা তো আপনাকে আমি আগেই বলেছি। বনেদী ঘর, ছেলেটিও শিক্ষিত—

হিমাদ্রী কিন্তু রাজী হল না বোনকে পড়াবার ভার নিতে। জাহ্নবী ক্ষুণ্ণ হলেন, রুষ্ট হলেন—তবু হিমাদ্রী তার মত পরিবর্তন করে না। শেষে মমতাকেই পাঠিয়ে দিলেন তিনি—দাদাকে রাজী করাতে।

মমতা ঘরে এসে দেখে হিমাদ্রী একমনে একটা ছবিকে মাউন্ট করছে। যে পরিমাণ সাড়াশব্দ তুলে মমতা ঘরে ঢুকেছে তাতে মুনি-ঋষিরও ধ্যান ভেঙে যায়, কিন্তু হিমাদ্রীর একাগ্রতা নষ্ট হল না।

—মাসিমা জিজ্ঞাসা করতে বললেন, আমি পরীক্ষা দেব কিনা।

কাঠের ফ্রেমে পেরেক ঠুকতে ঠুকতে হিমাদ্রী বলে, তুমি পরীক্ষা দেবে কিনা তা আমি কেমন করে জানব?

—বারে! আমাকে পড়া দেখিয়ে দেবে কে?

—আমি আর মাস্টার খুঁজে দিতে পারব না।

—তাহলে তুমি নিজেই নাও না আমার ভার!

—না!

—আহা, আমি তো আমার গোটা দেহের ভারটা নিতে বলছি না, আমাকে পড়ানোর ভার।

হাতুড়িটা একপাশে সরিয়ে রেখে হিমাদ্রী ঘুরে বসে। বলে, প্রগলভতারও একটা সীমা আছে মমতা!

মমতা কিন্তু রাগ করে না, মোহময়ী হাসি হেসে বলে, তা তুমি অত চটছ কেন? নিখিলেশ তো আর তোমার রাইভাল নয়।

চোখ পাকিয়ে হিমাদ্রী শুধু বলে, মমতা!

খিল খিল করে হেসে ওঠে মমতা, বলে, হায়-হায়-হায়! আমি কী বোকা! একেবারে বুঝতে পারিনি! তা আমারই বা কি দোষ বল? তুমি

কি আমাকে বুঝবার সুযোগ দিয়েছ কখন ?

—কী বলতে চাইছ তুমি ?

—বল্‌ছি, তুমি ভারি হিংসুটে। তা বেশ তো, ঘরের মধ্যেই যদি প্রেম করার লোক পাই—বাইরের লোকের দিকে আমি নজর কেন দেব, বল ?

হিমাদ্রীর ইচ্ছে করে ওর চুলের মুঠি ধরে আচ্ছা করে ঘা-কতক দিয়ে দেয়। কিন্তু সে ইচ্ছাকে দমন করতে হল। কারণ ঠিক সেই মুহূর্তেই ভেজানো দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন জাহ্নবী। অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, মমতা ! ছি-ছি-ছি ! তোমাকে বারণ করে দিচ্ছি—এ ঘরে তুমি আর আসবে না ! কী কালসাপই ঘরে এনেছি আমি। যাও—চলে যাও !

হঠাৎ হিমাদ্রী বলে বসে, কিন্তু মা, ওর পরীক্ষার যে আর মাত্র একমাস বাকি ! আমি না দেখিয়ে দিলে—

—চুপ্ কর তুই। লজ্জা করে না তোর ! ও না তোর ছোটবোন !

—মা, তুমি কী বলছ ?

জাহ্নবী দৃপ্তকণ্ঠে বলে ওঠেন, এ নিয়ে আর একটি কথা নয় ! ওর সঙ্গে কোন ছুতায় আর কথা বলবি না তুই।

মমতার হাত ধরে তিনি বেরিয়ে যান ঘর ছেড়ে···

শাহজাহান থামতেই সদারঙ্গনী বলেন, তারপর ?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শাহজাহান বলে, কী হবে ডাক্তারসা'ব সে সব কথা বিস্তারিত জেনে ? আমি একটা ঈডিয়ট ! আমাকে দিয়ে বাদরনাচ নাচিয়েছিল মেয়েটা। ওর নাম ছিল মমতাময়ী, আমি কাব্যি করে বলতাম ছলনাময়ী। সবাই ওকে ডাকত মমতা, আমি নির্বোধের মত বলতাম : মমতাজ ! আমার এই নামকরণটা সেই করেছিল—শাহজাহান ! এ নাম আমার গৌরবের পদবী নয়, লাঞ্ছনার। সেই লাঞ্ছনার বোঝা সারাটা জিন্দেগী আমি বয়ে বেড়ালাম ! কারণ সব বুঝেও, সব শুনেও আমি অস্বীকার করতে পারিনি যে, আমার প্রেমে কোন খাদ ছিল।

সহানুভূতির সঙ্গে সদারঙ্গনী বলেন, বেশ, বিস্তারিত নাই বা বললেন—তারপর কি হ'ল সেটুকু শুধু সংক্ষেপে বলুন।

শাহজাহান বলে, তার আগে এবার আপনি বলুন—মমতাজ কি বেঁচে আছে ? সে কি পাগল হয়ে গেছে ? সে কি—

ডাক্তার সাহেব ধীরে ধীরে বলেন, না ! সে দীর্ঘদিন আগেই মারা গেছে।

শাহজাহান একটা বিড়ি ধরায় আবার। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বলে,

বেঁচে গেছে বলুন! আর তার ছেলেটা?

—ছেলে ছিল নাকি তার?

—আপনি জানেন না? তার একটি ছেলেও হয়েছিল।

—তা হবে। আপনার গল্পটা শেষ করুন এবার।

বিড়িতে বার কয়েক টান দিয়ে জানলার বাইরে দৃষ্টি মেলে দিয়ে শাহজাহান সংক্ষেপে শেষ করে তার বঞ্চনার ইতিহাস, একদিন ওকে নিয়ে পালালাম। পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ওর। অবশ্য আমারও সায় ছিল। আমার মা যদি সেরাত্রে এসে ওভাবে আমার সঙ্কোচটা না ভেঙে দিতেন, যদি আমাদের দেখাশোনার মেলামেশার পথে ও ভাবে পাহারা না বসাতেন তাহলে বোধহয় এতটা বেপরোয়া হতাম না আমি; কিন্তু যে মুহূর্তে বুঝলাম আমার শুভবুদ্ধির উপর, আমার চরিত্রবলের উপর আমার মা আস্থা রাখতে পারছেন না—বাহ্যিক বাধা আরোপ করে আমাকে মমতাজের কাছ থেকে দূরে রাখতে চাইছেন সেই মুহূর্তে আমিও ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌লাম। মমতাকে আমার ঘরে আসতে দেওয়া হত না; মমতাকে আমার সঙ্গে কথা বলতে দেওয়া হত না। আমার মা বস্তুত আমাদের দুজনকেই নজরবন্দী করে ফেললেন। মমতাজকে দেখে গেল কোন এক মুখুজ্জে মশাই। মেয়ে অপছন্দ হবার নয়। তার উপর আপদ বিদায় করবার শুভবুদ্ধির প্রেরণায় আমার মা আশাতীত যৌতুক স্বেচ্ছায় দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসলেন। বিয়ের দিন স্থির হয়ে গেল। নিভৃতে মমতাজের সঙ্গে দুটো কথা বলবার জন্য পাগল হয়ে উঠ্‌লাম আমি—কিন্তু মায়ের সতর্ক পাহারা ডিঙিয়ে সে সুযোগ পেলাম না। আমার তখন এমন অবস্থা যে, ভালমন্দ বোধ আমার তিলমাত্র অবশিষ্ট ছিল না। সে আমাকে সম্পূর্ণ মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলেছিল। কথা বল্‌তে পারছি না, কিন্তু দূর থেকে তাকে দেখতে তো পাচ্ছি। ওর চোখের ভাষায় আমি ওর মনের কথা পড়তে পারতাম! চোখে চোখে আমাদের পরামর্শ হত, চোখে চোখেই আমি ওকে আশ্বাস দিতাম।

মায়ের এই বাধানিষেধের কদর্য বেড়াটাকে ভেঙে ফেলবার যখন কোনও পথই দেখতে পারছি না, বিদ্রোহীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার কোন সুযোগের সন্ধানই যখন পাচ্ছি না তখন পেলাম মমতাজের গোপন পত্র! ঘর ছাড়ার মন্ত্র। সুনিপুণ পরিকল্পনাকারের মত সে সব কিছু গুছিয়ে লিখেছিল। সঙ্গে কী নিতে হবে, কোন ট্রেন ধরে যাব আমরা, কোথায় যাব, রাত কতটার সময় সুটকেশ হাতে খিড়কির দরজার কাছে হাজির থাকতে হবে আমাকে—সব।

মায়ের নামে একখানা চিঠি লিখে এসেছিলাম আমি। সব অপরাধ স্বীকার করেছিলাম। মার্জনা আমি চাইনি—জানতাম—এ অপরাধের ক্ষমা নেই। বলেছিলাম, মা যেন মনে করে তার মেজ ছেলে মরে গেছে। অথবা মুসলমান হয়ে গেছে।

মুসলমান হব, স্থির করেছিলাম। না হ'লে মমতাজকে আমার বৈধ স্ত্রীরূপে পাব না। তাকে শয্যাসঙ্গিনী হিসাবে পেতে চাইনি আমি, সহধর্মিণীর মর্যাদা দেবার সঙ্কল্প ছিল আমার।

ভোর রাতের প্রথম লোকাল ধরে এসেছিলাম হাওড়া স্টেশন। সঙ্গে ছিল একটা সুটকেশ আর ঐ ছবিখানা। প্রথম ট্রেনেই রওনা দিলাম হাওড়া থেকে কাশীতে। কোথায় উঠ্‌ব, কোথায় থাকব, কার কাছে যাব, কেমন করে ঘর-ছাড়া দুটি মানুষের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হবে সে চিন্তা ছিল না। মমতাজ বলেছিল, আমার গায়ে যা গহনা আছে তাতেই দু এক মাস চলে যাবে। এ ছাড়া আর কোন পথ নেই।

পথ সত্যিই ছিল না। কারণ মুখুজ্জে পরিবারের বধূ হয়ে মমতার চলে যাবার দিন আর বাকি ছিল না একেবারে। বস্তুত পাকা দেখার পূর্বদিন রাত্রে বাড়ি ছাড়লাম আমরা দুটি কুলাঙ্গার।

আবার চুপ করে যায় শাহজাহান। বেশ বোঝা যায় এ অধ্যায়টা তার কাছে শুধু বেদনার। বারে বারে তাই ক্লান্ত হয়ে থেমে পড়ছে। কিন্তু সদারঙ্গনীর উপায় নেই। শেষপর্যন্ত জেনে নিতে হবে তাঁকে। বলেন, দুজনে বেনারসে এলেন?

হাসল শাহজাহান, হ্যাঁ, এলাম। অগতির গতি—কাশীধাম! কোনও ধর্মশালায় প্রথমটা উঠ্‌ব ভেবেছিলাম। মমতা বললে—না, আমরা উঠ্‌ব বেনারস লজে। একটা ঠিকানাও বাড়িয়ে ধরে সে।

কী ব্যাপার? কেমন যেন খটকা লাগে আমার। প্রশ্ন করি—এর আগে বেনারসে এসেছ নাকি?

মমতা আমার কথাটা শুনতে না পাওয়ার ভঙ্গি করে নিজের সুটকেশটা তুলে নিয়ে এগিয়ে যায় স্টেশন গেটের দিকে।

একটা টাঙ্গা নিয়ে দুজনে এসে পৌঁছালাম নির্দিষ্ট হোটেলে। সেখানে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল একটা চরম বিস্ময়! এমন রোমান্টিক নাটকটার যবনিকা যখন নেমে এল, দেখি সেটা একটা প্রচণ্ড প্রহসন!

হঠাৎ হাহা করে হেসে ওঠে শাহজাহান। হাসির দমকে বেচারির চোখ

দিয়ে জল বেরিয়ে আসে। বালিশ ঢাকা দিয়ে চোখ-মুখ মুছে নিয়ে বলে, আন্দাজ করতে পারেন ডাক্তার সা'ব, কে আমাদের রিসিভ করতে এগিয়ে এল হোটেল থেকে ?

—কে ?

—নিখিলেশ ত্রিপাঠি !

আমি বললুম—এ কি ! আপনি এখানে ?

আমি যে কতবড় বে-হেড বুড়বক্ তা তখনও বুঝিনি আমি ! আমি যে বাঁদর-নাচ নাচছিলাম এতক্ষণ তাও টের পাইনি !

ত্রিপাঠি বললেন, মালপত্র নামিয়ে ভিতরে এস। পথের মাঝে কি এসব কথা হয় ?

মমতা মাথা নিচু করে সেই যে হোটেলের বাথরুমে ঢুকে গেল আর বেরিয়ে এল না। ঘরে ঢুকে নিখিলেশ আমার হাত দুটি ধরে বলে, এ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না ভাই। তোমাদের বাড়িতে এমন কড়া পাহারা বসিয়েছিলে যে, ওকে উদ্ধার করে আনার আর কোন রাস্তাই খুঁজে পাইনি আমরা।

পুরো পাঁচ মিনিট আমি কোন কথা বলতে পারিনি।

শেষে বলি, মমতাকে ডাকুন। তার মুখ থেকে আমি সবকথা শুনতে চাই।

—সেটা ওর পক্ষে কী ভীষণ কষ্টকর এটুকু বোঝা উচিত তোমার !

প্রচণ্ড ধমক্ দিয়ে উঠি, চুপ করুন ! সে যদি এসে সবকথা স্বীকার না করে আমি চেঁচিয়ে লোক জোগাড় করব !

মমতা বেরিয়ে আসে বাথরুম থেকে। মাথা নিচু করে বললে,—তোমার কাছে ক্ষমা চাইবার মুখ আমার নেই। ক্ষমা আমি চাইব না—জানি, অভিশাপ ছাড়া আর কিছু দিতে পারবে না আজ ! কিন্তু এছাড়া বাঁচবার আর কোন পথও আমি দেখতে পাইনি।

আমার পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে গেল। আমি তখন ভাবছিলাম —কী আশ্চর্য ! মমতাজ তো মাকে লেখা আমার চিঠিখানা পড়েনি ! অথচ কাল রাত্রে মাকে আমি যে চিঠিখানা লিখেছি তারই চারটে লাইন যেন আউড়ে গেল মেয়েটা ! মাকে লেখা কথাগুলো রাত পোহালে আমার কাছে ফিরে এল যেন !

মমতা বললে, তুই বাড়ি ফিরে যাও ! মাসিমাকে বল, তোমার কোন দোষ নেই। আমিই তোমাকে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছি—

—চুপ কর তুমি!—ধমকে উঠি আমি।

নিখিলেশ বলে, বিশ্বাস কর—হিমাদ্রী, আমাদের আর কোন উপায় ছিল না। এভাবে ওকে না নিয়ে এলে তোমরা ওকে মদনপুরের মুখুজ্জে বাড়ি পাঠিয়ে দিতে। কিন্তু তিনমাসের মধ্যেই ওকে ফিরে আসতে হত। তোমরা জান না, মমতা মা হ'তে চলেছে!

ইচ্ছা হল একটা প্রচণ্ড ঘুষি মারি বর্বরটার মুখে। কিন্তু সে ইচ্ছা দমন করতে হল। ঘুষি মারতে হলে নিজের মুখেই মারতে হয় আগে! আমি এতবড় নির্বোধ, এতবড় বুড়বক্ যে, কিছুই আন্দাজ করতে পারিনি? শুধু ভালবেসেই তো ক্ষান্ত হইনি আমি, ভালবাসা পেয়েছি বলেও যে বিশ্বাস করেছি।

মমতাজ নিখিলেশের সন্তানকে জন্ম দিতে চলেছে শুনে আমি কতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না। সম্বিত ফিরে পেলাম নিখিলেশের প্রশ্নে, তুমি কি পরের ট্রেনেই চন্দননগর ফিরে যাবে?

—আমি কোথায় যাব, কি করব, তা তোমাদের ভাবতে হবে না। তবে আমি এখনই এ স্থান ত্যাগ করছি!

সুটকেশটা হাতে তুলে নিই। তারপর কি ভেবে ঐ ছবিখানাও তুলে নিলাম হাতে। হঠাৎ হাসি পেল আমার। হেসেই বলি, তোমাকে কনগ্র্যাচুলেট করছি নিখিলেশদা! তুমি হয়তো ভাবছ এতকথার পরেও ঈডিয়টটা কোন আক্কেলে এই ছবিখানা নিয়ে যাচ্ছে? তাই নয়?

নিখিলেশ জবাব দেয়নি। সে বোধকরি বিশ্বাসই করেনি খোলা মনে তাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলাম আমি—ওটা আমার খেদোক্তি নয়। তাই আবার বলি, জানি, তোমরা বিশ্বাস করবে না, এ ব্যাপারের পর ও কথাটা মারাত্মক মেলোড্রামার মত শোনাবে—তবু যাবার আগে স্বীকার করে যাচ্ছি—তোমার স্ত্রীকে আমি ভালবাসতাম, তাকে আজও আমি ভালবাসি! আর এ ছবিটা? এটা তোমার স্ত্রীর ছবি নয়। এটা তাজমহলের ছবি—ও তুমি বুঝবে না!

নিখিলেশ ওসব কাব্য কথার ধার ধারে না। সোজা বাস্তবে ফিরে এসেছিল সে, তোমার তো কোন দোষ নেই হিমাদ্রী। তুমি কিন্তু চন্দননগরেই ফিরে যেও। সব কথা ওঁদের খুলে বল—

হেসে বলি, তা হয় না নিখিলেশদা! আমি ছিলাম একটা নাটকের হিরো। সে পার্টটা কেড়ে নিলে তুমি। বাকি রইল আর দুটো পার্ট!

আমাকেই বেছে নিতে দাও। আমি 'ফুল' হতে চাই না, 'নেভে'-র চরিত্রটাই অভিনয় করি বরং!

মমতা মাথাটা তুলতে পারেনি!

তার দিকে ফিরে বলি, বাড়ি ফিরে যাবার মুখ আমার নেই মমতাজ! আমার মাকে আমি চিঠিতে লিখে রেখে এসেছি ঐ কটা কথাই—যা তুমি আমাকে এখনই বললে। চন্দননগর রায়বাড়িতে হিমাদ্রী রায়ের মৃত্যু হয়ে গেছে কাল-রাত্রে। বেঁচে যে রইল সে শাহজাহান! নামটা তোমার দেওয়া! হিমাদ্রী রায় মরুক, তাতে ক্ষতি নেই—কিন্তু তুমি সুখী হও এই আশীর্বাদ করে গেল তোমার শাহজাহান!

শেষ কথাগুলো ভারী হয়ে এল শাহজাহানের। বিড়িটা তুলে নিয়ে কাঁপা হাতে সেটাতে অগ্নিসংযোগ করে।

—মমতাময়ীর যে পুত্রসন্তান হয়েছিল সে খবর পেলেন কেমন করে?

শাহজাহান জবাব দিল না।

সদারঙ্গনী আবার পেশ করতে যাচ্ছিলেন তাঁর প্রশ্নটা; তার আগেই তাঁর পিছন থেকে কে বলে উঠল, আমি তাহলে কে?

সদারঙ্গনী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। শ্রবণা কখন এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর পিছনে? উত্তেজনায় শাহজাহানও উঠে দাঁড়িয়েছে। দুই হাত সে বাড়িয়ে দেয় শ্রবণার দিকে, বলে, বনি! তুই!

—হ্যাঁ, আমি তাহলে কে বাপি?

—তুই ভাল হয়ে গেছিস্?

পায়ে পায়ে সে এগিয়ে আসে শ্রবণার দিকে। দৃঢ় আলিঙ্গনে ওর মাথাটা বুকে চেপে ধরে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলে, তুই এই বুড়বক শাহজাহানের বেটিরে পাগলি! তোর মায়ের কথাটা আর জানতে চাস্‌নে। সে হতভাগীর ইতিহাসটা তোর বাপের চেয়েও করুণ! তোকে জন্ম দিতে গিয়েই মরেছে সে হতভাগী!

—দু'হাতে শ্রবণা জড়িয়ে ধরল তার বাপিকে।

ধীর পদে সদারঙ্গনী বেড়িয়ে যান ঘর ছেড়ে। ওদের অলক্ষ্যে। মনের ব্যাপারী বুঝে নিয়েছেন, এ দৃশ্যে তাঁর স্থান নেই—এখানে তিনি বাহুল্য।

পাখীর পালকের মত হালকা একটা মন নিয়ে শ্রবণা বসেছিল তাজ হোটেলের সাতশ উনিশ নম্বর সুইটের জানলার ধারে একটা গদি-আঁটা কৌচে। সামনে

বিস্তারিত সফেন সমুদ্র। বামে ইণ্ডিয়া-গেটের তলায় নানান জাতের মানুষজন ঘোরাফেরা করছে। পিঁপড়ের সারি দেখে আমরা যেমন অনুভব করি না ওরা পরস্পরকে শুঁড় নেড়ে কত কি মনের ভাব ব্যক্ত করছে, শ্রবণাও তেমনি ভেবে দেখল না ঐ পিপিলিকা-সারির মত মানুষগুলো পরস্পরকে কতভাবে সম্ভাষণ করছে। ওদের ঘিরেও ঘুরছে এক একটা জগৎ, যে জগতের সুখ-দুঃখ হাসি অশ্রুর সংবাদ সে রাখে না। যেমন ওদের কেউ যদি দেখতে পায় তাজ হোটেলের বাতায়নবর্তিনী এই মেয়েটিকে, তবে সেও আন্দাজ করতে পারবে না—কী প্রচণ্ড তুফান পাড়ি দিয়ে সে এতদিনে নিশ্চিন্তে নোঙর ফেলেছে নিরাপদ বন্দরে। তার সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। প্রিয়দর্শী তার কেউ নয়, প্রিয়দর্শী তার সব! নিখিলেশ ত্রিপাঠি আর মমতাময়ীর সন্তানের সঙ্গে শ্রবণার কোন সম্পর্ক নেই—তাই নিকটতম সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে তার সঙ্গে। কোন সংস্কার, কোন বিবেকের বাধা তাকে আর বেঁধে রাখতে পারবে না। অনেক অশ্রুর বিনিময়ে মুক্তিমূল্য দিতে পেরেছে শ্রবণা।

সমস্ত দিনটা সে ছুটাছুটি করেছে। বোম্বাই শহরের এ প্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে। দিনান্তে এখন ফিরে এসেছে ক্লান্ত দেহে। সদারঙ্গনী সাহেবের দিন ভিন্ন কর্মসূচীতে বাঁধা। কোথায় কোন ডাক্তারদের ক্লাবে তাঁকে বক্তৃতা দিতে হবে, কোথায় কার সঙ্গে লাঞ্চ খেতে হবে—সেসব লেখা আছে তাঁর এনগেজমেণ্ট প্যাডে। শুধু রাত্রে ডিনার-পার্টিতে ওঁদের দুজনেরই নিমন্ত্রণ আছে। সদারঙ্গনী সাহেব তাঁর পালিতা কন্যাকে নিয়ে হোটেলে উঠেছেন, এ খবরটা জানাজানি হয়ে গেছে। ফলে শ্রবণার নামে পৃথক একটি আমন্ত্রণ লিপি এসেছে রাত্রের ডিনার-পার্টিতে। ডাক্তার সাহেব সন্ধ্যায় কোথায় যেন একটা টি-পার্টিতে যোগদান করবেন। কথা আছে, সেখান থেকে তিনি সোজা আসবেন তাজ হোটেল রাত সাড়ে সাতটায়, শ্রবণাকে তুলে নিয়ে যাবেন ডিনার-পার্টিতে। আজই ডাক্তার সাহেবের বোম্বাই-প্রবাসের শেষদিন। কথা ছিল, আগামী কালকার ফ্লাইটে কলকাতা যাবেন। সে টিকিট ফেরত দিয়েছেন। কাল নয়, পরশু ফিরবেন তিনি। কাল একটা গাড়ি নিয়ে তাঁকে একবার নাসিক যেতে হবে—কী একটা জরুরী কাজ আছে।

সন্ধ্যার পূর্বেই তাই শ্রবণা ফিরে এসেছে হোটেলে। সারাটা দিন ঘোরাঘুরি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বেচারি। জানাশোনা যে যেখানে ছিল দেখা করবার চেষ্টা করেছে। মধ্যাহ্ন আহার সেরেছে নিশিদার সঙ্গে। নিশিনাথ খুব খুশী

হয়েছেন শ্রবণা ফিরে আসায়। সে কেন হঠাৎ পালিয়ে গিয়েছিল, কোথায় ছিল, কেনই বা ফিরে এসেছে এসব বিস্তারিত শুনবার সময় নেই নিশিনাথ চাটুজ্যের, মেজাজও নেই। তার চেয়ে অনেক বড় খবর রয়েছে যে। সেগুলো বোঝাতে থাকেন শ্রবণাকে পেয়ে। ওঁর বুঝি কি একটা ফিল্‌ম্ ওয়ার্কস্-কোয়াপারেটিভ খুলেছেন। নিশিনাথ তার সেক্রেটারী। উনি এবং ওঁরই মতন আরও কয়েকটি উন্মাদ একটা অবাস্তব পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করবার দুঃসাহস নিয়ে কোমর বেঁধে লেগেছেন। চলচ্চিত্র শিল্পকে কয়েকজন বক্স-অফিস-প্রেমিক মুনাফাবাজ দৈত্যের হাত থেকে উদ্ধার করেন ওঁরা। এজন্য চিন্তাশীল উদারচেতা নব্যপন্থী শিল্পীদের কাছে আবেদনপত্র বিলি করা হয়েছে। শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের সমন্বয়ে সমবায়ের ভিত্তিতে একখানা পুরো ছবি তুলতে ওঁরা বদ্ধপরিকর। শেয়ার ছাড়া হবে বাজারে। দশখানার বেশী শেয়ার কাউকে রাখতে দেওয়া হবে না। সমবায় প্রতিষ্ঠানটা রেজিষ্ট্রি হবার অপেক্ষা। রেজিষ্ট্রার ভরসা দিয়েছেন—আগামী সপ্তাহেই সোসাইটি বিধিবদ্ধ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, 'তাজের-স্বপ্ন'ই তুলবেন ওঁরা। গল্পটার চিত্রস্বত্ব নিশিনাথ ক্রয় করেছেন, সোসাইটির তরফে। নামমাত্র মূল্যে। গল্পটা অবশ্য ঢেলে সাজাতে হবে। নাচ-গানগুলো বাদ যাবে, অন্তত খুব কমে যাবে। থীমটা ভাল, সুন্দর একটি রোমান্টিক ছবি হবার মত উপাদান আছে গল্পটায়। নূতন করে স্ক্রিপট লিখেছেন নিশিনাথ। শাহজাহান যদি পারে তবে তাকেই 'ডায়লগ' লিখবার ভার দেবেন! লোকটার কলমের জোর আছে! নিজস্ব য়ুনিটের আর সবাই তো আছেই। যে অংশটা তোলা হয়েছে? না, সেটা বাতিল করতে হবে। ঈস্টম্যান কালারে ছবি তুলবার মত মূলধন নেই সমবায় সমিতির। যদিও রঙিন ছবি হলেই 'তাজের স্বপ্ন' উৎরাতো ভাল। বিশেষ করে তাজমহলের দৃশ্যগুলো। কিন্তু কী করা যাবে? অত টাকা কোথায়? সাদা-কালোতেই তোলা হবে প্রথম ছবি। হ্যাঁ, নায়ক-নায়িকার কোন বদল হবে না। শ্রবণা তো এসেই গেছে। সে এবার কিছু শেয়ার কিনুক। প্রিয়দর্শীকেও আনিয়ে নেওয়া যাক এবার—

বাধা দিয়ে শ্রবণা বলে, তাঁর ঠিকানা জানেন?

—আমি নাই বা জানলাম, তুমি তো জান।

—আমি জানি, তাই বা আপনি জানলেন কেমন করে?

—আরে বাপু রোমান্টিক ছবি তুলছি আর এটুকু আন্দাজ করতে পারি না? তুমি ভেবেছ কাসলিং করে তোমার রাজাকে এমন লুকান লুকিয়েছ যে, আমরা তার নাগাল পাব না, কেমন?

শ্রবণা মুখ লুকিয়ে হাসে। বলে, তা সেই রাজাকে যদি খুঁজে পান, দেখবেন তাঁর স্যুটিং করার সময় নেই মোটেই—

—কেন কেন? কী এমন রাজকার্য করতে ব্যস্ত তোমার রাজা?

—তিনি এখন বিয়ের বাজার করতে ব্যস্ত!

—গুড নিউজ। খুব ভাল কথা। কিন্তু দেখ বাপু, ছবিটা শেষ হওয়া পর্যন্ত যেন তুমি, মানে অসুস্থ হয়ে পড় না আবার।

কান দুটো লাল হয়ে ওঠে শ্রবণার, এ রসিকতায়। নিশিনাথ কিন্তু রসিকতা করেননি মোটেই; তিনি রীতিমত সিরিয়াস্।

ফোনটা তুলে নেয় শ্রবণা। অপারেটারের কাছ থেকে সার্ভিসের লাইনটা চেয়ে নেয়। এককাপ কফির অর্ডার দেয়। না, শুধু কফি।

ঘড়িটা দেখে। ছটা বাজেনি এখনও। ডাক্তার সাহেবের ফেরার এখনও অনেক দেরী আছে। কফিটা খেয়ে সে গা ধুয়ে নেবে। এই বাথরুমটায় স্নান করতে ভারি ভালো লাগে তার। সাদা পোর্সেলিনের মেঝে আর দেওয়াল। ঠাণ্ডা-গরম দু-রকম জলের ব্যবস্থা। ডাক্তার সাহেব ওকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, ঠাণ্ডা-গরম জল মেশাবার কায়দাটা।

দরজায় শব্দ হল। শ্রবণার অনুমতি পেয়ে ঘরে এল বেয়ারা। ফুলকাটা টি-কোজি দিয়ে ঢাকা কফির পট এবং অন্যান্য সরঞ্জাম এনে রাখল লোকটা টেবিলের উপর। সে চলে যেতেই কফির সরঞ্জাম নিয়ে বসল শ্রবণা; ঠিক সেই মুহূর্তেই ঝন ঝন করে বেজে উঠল টেলিফোনটা।

কফি-পটটা নামিয়ে টেলিফোনটা তুলে নেয়, হ্যালো!

—কে শ্রবণা? ফিরে এসেছ তুমি?—সদারঙ্গনীর কণ্ঠস্বর।

—হ্যাঁ, আমি ঠিক তৈরী থাকব, সাড়ে সাতটায়।

—না, তার দরকার নেই। তুমি এখনি একটা ট্যাক্সি নিয়ে এখানে চলে এস।

—কোথা থেকে বলছেন আপনি?

—মিস্টার প্যাটেলের বাড়ি থেকে।

ডাক্তার সাহেবের কণ্ঠে কেমন যেন উদ্বেগের সুর। তিনি কিছুটা উত্তেজিত। একটু চমকে ওঠে শ্রবণা। বাপি কি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে?

—কেন? কি হয়েছে?

—এখানে এলেই জানতে পারবে! তুমি দেরী করনা—এখনি চলে এস!

হ্যাঁ, ডাক্তার সাহেব শুধু উত্তেজিত নন, বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছেন যেন।

—কোন জরুরী খবর আছে ?

—তা আছে। একটু আগে এখানে প্রিয়দর্শী—

লাইনটা কেটে গেল—

—হ্যালো-হ্যালো-হ্যালো ! ইয়েস আয়াম সাডেনলি কাট অফ্।

কিন্তু দূরভাষী যান্ত্রিক কণ্ঠ একবার হারিয়ে গেলে জোড়া লাগা কঠিন। রিসিভারটা নামিয়ে রেখে শ্রবণা অপেক্ষা করে। ডাক্তার সাহেব আবার তাকে রিং করবেন নিশ্চয়। কী বলতে চাইছিলেন তিনি ? কী জরুরী খবর ? 'একটু আগে এখানে প্রিয়দর্শী'—কী ? এসেছে ? প্রিয়দর্শী এসেছে ? প্যাটেলের বাসায় ? তা কেমন করে হবে ? সে তো জানে না শ্রবণা বোম্বাইয়ে এসেছে ? তবে কি সেও নিরুদ্দিষ্টার সন্ধানে বেরিয়েছে শাহজাহানের খোঁজে ? সেও কি ভগ্নস্তূপের বেড়া ডিঙিয়ে অবশেষে এসে পৌঁছেছে সুরযভাই প্যাটেলের ফ্ল্যাটে ? তারা যেভাবে পৌঁছেছিল ?

পুরো পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করেও যখন টেলিফোন বাজল না তখন শ্রবণা টেলিফোন ডাইরেক্টরি হাতড়াতে বসে। না, প্যাটেল সুরযভাইয়ের নামে কোন নম্বর নেই। বোধহয় বাড়িওয়ালার নামেই ফোনটা আছে। নিশিনাথের নম্বরটা পাওয়া গেল। তাঁকেই ফোন করল শেষ পর্যন্ত। কিন্তু দুর্ভাগ্য বেচারির, নিশিনাথ বাড়ি নেই। স্টুডিওতে আছেন। অনেকক্ষণ চেষ্টা-চরিত্র করে একটা স্টুডিও থেকে সুরযভাইয়ের ফোন নম্বরটা অবশেষে জোগাড় করা গেল। সেই নম্বর প্রার্থনা করে শ্রবণা যখন আবার 'রিঙিন-টোন' শুনতে পেল তখন পঁচিশ মিনিট কেটে গেছে। ও প্রান্ত থেকে ভেসে এল : হ্যালো !

—মিস্টার প্যাটেল বলছেন ?

—না, তিনি বাড়ি নেই।

—ডাক্তার সদারঙ্গনী আছেন ? তাঁকে দিন তো ?

—এইমাত্র বেরিয়ে গেলেন তিনি। আপনি কে বলছেন ?

—আপনি কে বলছেন ?

—আপনি আমাকে চিনবেন না ! আমি এখানে আজ এসেছি—

—বাই এনি চান্স, আপনার নাম কি বঙ্কুবিহারী ?

—কি আশ্চর্য ! ভাবীজি ! আপনি এখনও রওনা হননি ?

—তোমরা কখন এসেছ ? তোমার দাদাও এসেছে ?

—হ্যাঁ !

—ওখানে আছে ?

—আছে।

—তাকে টেলিফোনে ডেকে দাও না ভাই।

ও-প্রান্তে নীরবতা।

—কি হল? হ্যালো?

—হ্যাঁ, আমি বন্ধু বলছি। আপনি দেরী না করে এক্ষুণি চলে আসুন!

কেমন একটা অজানা ভয়ে হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে শ্রবণার। বলে, প্লীজ বন্ধু, কী হয়েছে আমাকে বল?

— আপনি চলে আসুন!

তা তো যাচ্ছি; কিন্তু তুমি তোমার দাদাকে ডেকে দিচ্ছ না কেন?

— আমি লাইন কেটে দিচ্ছি। আর ফোন করবেন না —

— হ্যালো, হ্যালো!

ও প্রান্ত থেকে লাইনটা কেটে গেল।

একটা হিমপ্রবাহ নেমে গেল শ্রবণার মেরুদণ্ড বেয়ে। কী হয়েছে? নিশ্চয় সাঙ্ঘাতিক কিছু হয়েছে! কিন্তু কি? এ্যাক্সিডেণ্ট? বন্ধু কেন তা বলল না? এখনই তাকে ওখানে যেতে হবে। যেমন অবস্থায় ছিল তেমনি বওনা হয়ে পড়ে। শুধু তুলে নিল হাত ব্যাগটা।

কফির পটটা ঠাণ্ডা হতে থাকে।

ট্যাক্সিতে যেতে যেতে ব্যাপারটা তলিয়ে দেখতে থাকে। যে কথাটা এতক্ষণ খেয়াল হয়নি, এবার মনে পড়ল সেটা। প্রিয়দর্শী কোনদিন তাদের জুহুর বাড়িতে যায়নি। ওদের বাড়িতে মমতাময়ীর যে পোর্ট্রেটখানা টাঙানো ছিল সেটা সে কখনও দেখেনি। ডাক্তার সাহেব যখন জানতে পারলেন যে, প্রিয়দর্শীর মা হচ্ছে শাহজাহানের স্ত্রী তখন সে কথাটা লুকিয়ে ফেলেছিলেন প্রিয়দর্শীর কাছ থেকে। বলেছিলেন, ওর এই নূতন জীবন খাড়া হয়ে আছে যে বনিয়াদের উপর তার মূলে আছে ঐ ছবিখানা। এতকথা সুরযভাই জানে না, এমন তো হতে পারে সে শাহজাহানের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে; এবং ঘরে ঢুকেই সে দেখেছে শাহজাহানের পায়ের কাছে টাঙানো তার মায়ের ছবি। হয়তো সে জানতে চেয়েছে এ ছবি কার আর হয়তো রূঢ়ভাষী শাহজাহান তাকে এমন কিছু বলেছে যাতে প্রচণ্ড একটা মানসিক আঘাত পেয়েছে প্রিয়দর্শী! হয়তো সেই মুহূর্তে প্রিয় ভেবে নিয়েছে শ্রবণা তার সহোদরা! আপন বোন!

হাত পা হিম হয়ে যায় বেচারির! এ কী হল! এ তুমি কী করলে ভগবান! মনে পড়ে যায় এ সংবাদ যখন প্রথম শুনেছিল তখন সুস্থ সবল শ্রবণা মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল মাটিতে! আর অসুস্থ প্রিয়দর্শী, যার কাছ থেকে একথা গোপন রাখতে চেয়েছিলেন সাইকিয়ার্টিস্ট ডাক্তার সদাবঙ্গনী,সে যদি আচমকা এ খবরটা পায়? তার মনে এমন আঘাত লাগতে পারে যাতে সত্যি কথাটা, আসল কথাটা তাকে আর কোনদিনই বোঝানো যাবে না। সে কি আবার সেই সতের বছর বয়সে ফিরে যাবে তাহলে? কথা বলবে না, হাসবে না, কাঁদবে না· মূক হয়ে যাবে আবার?

—থোড়া জল্‌দি চলিয়ে সর্দারজী!

কিন্তু এর চেয়ে জোরে কেমন করে গাড়ি চালাবে সর্দারজী, জনবহুল বোম্বাইয়ের সড়ক দিয়ে? ট্যাক্সির স্পিডোমিটার কি উদ্বিগ্ন নারীর মনের কাঁটার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে!

ট্যাক্সিটা অবশেষে এসে দাঁড়ায় প্যাটেল সাহেবের দরজায়।

কলিং বেল বাজাতে হল না। ট্যাক্সি থামতেই খুলে গেল সামনের দরজাটা। বঙ্কু ছুটে বেড়িয়ে এল। শ্রবণাকে ভাড়া দিতে দিল না। তাড়াতাড়ি ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে হাত ধরে নিয়ে গেল শ্রবণাকে। বসালো এনে সামনের ড্রইংরুমে। বললে, মনকে শক্ত করুন ভাবীজি! ডাক্তার সাহেব বলেছেন, এসব কিছু নয়। সব আবার ঠিক হয়ে যাবে!

—কী কিছু নয়? কী ঠিক হয়ে যাবে?

আপনি একটু বসুন। ডাক্তার সাহেব এখনই ফিরে আসবেন। তিনিই সব কথা বলবেন আপনাকে! আমি ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না।

তোমার দাদা কোথায়?

—উপরের ঘরে। আপনার বাবার কাছে।

তবে সেখানেই চল।

না! এখন নয়। আগে ডাক্তার সাহেব ফিরে আসুন!

শ্রবণা বঙ্কুর হাত দুটি টেনে নিয়ে বলে, আমাকে আর পাগল করে তুলনা ভাই, কী হয়েছে আমাকে খুলে বল।

—বললাম তো, কী যে হয়েছে তা আমি নিজেই ভাল বুঝতে পারছি না। দাদা আমাদের কাউকে আর চিনতে পারছে না। আপনাকেও বোধহয় সে চিনতে পারবে না।

আস্তে আস্তে সোফায় বসে পড়ে শ্রবণা!

সে যা ভেবেছিল তাই হয়েছে। সমস্ত দুনিয়াটা ওর চোখের সামনে দুলতে থাকে। এখন আর কিছুতেই প্রিয়দর্শীকে বোঝানো যাবে না যে, শ্রবণা তার সহোদরা নয়—শাহজাহান তার বাবা নয়, মমতাময়ী শ্রবণার মা নয়। চিন্তার পারম্পর্য হারিয়ে ফেলেছে প্রিয়দর্শী। সে ফিরে গেছে তার সেই সতেরো বছর বয়সে। সে আর কোন কথা বলবে না, হাসবে না, কাঁদবে না খিদে পেলেও খেতে চাইবে না।

কিম্বা কে জানে সে হয়তো কল্পিত কোন পুরুষমানুষের উপর নিজের জীবনকে প্রক্ষেপ করেছে। হয়তো সে ধারণা করে নিয়েছে তার নাম কুন্তল। বিষাদ-বায়ুগ্রস্ত মানুষটাকে এবার কি শ্রবণা বলবে, আপনি কবে ভালবাসেন? গান ভালবাসেন? ছবির বই দেখতে ভাল লাগে না আপনার? এবার কি পালা-বদল হল নাটকের? এখন থেকে কি শ্রবণা তাকে শোনাবে তার পূর্বরাগের ইতিহাস? বলবে, কেমন ভোর ভোর রাতে কাচের জানলায় ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে ওরা দুজনে দেখেছিল তাজমহলকে—জীবনে প্রথম?

চোখ দিয়ে নেমে এসেছে জলের দুটি ধারা।

হঠাৎ পদশব্দে দুজনেই চমকে ওঠে। দুজনেই উঠে দাঁড়ায়।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে প্রিয়দর্শী। পরণে পায়জামা, গায়ে ঢিলে হাতা পাঞ্জাবি। পায়ে হাওয়াই চপ্পল। উদ্‌ভ্রান্ত উদাস দৃষ্টি মেলে প্রিয়দর্শী ঘরে ঢোকে। দুজনের দিকেই তাকিয়ে দেখে; সে দৃষ্টিতে ওদের স্বীকৃতি নেই। অন্যমনস্কভাবে উদাস মানুষটা জানলার দিকে এগিয়ে যায়।

—কুন্তলবাবু, ইনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। ওঁর নাম শ্রবণা দেবী।

প্রিয়দর্শী কোন জবাব দেয় না। জানলা দিয়ে দূর আকাশের দিকে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি মেলে অনিমেষ তাকিয়ে থাকে। পশ্চিমাকাশে আবীরের রঙ ছড়িয়ে আরব সাগরের উপর অস্ত যাচ্ছে দিনান্তের ক্লান্ত সূর্য। শ্রান্তিতে ভেঙে পড়ছে যেন সে। কয়েকটা সী-গাল না গাংচিল উড়ছে অকারণে। নারকেল আর ঝাউগাছের সারি কোন অন্তর্দাহের জ্বালায় আছাড়ি পিছাড়ি খাচ্ছে সামুদ্রিক ঝোড়ো হাওয়ায়।

বঙ্কুবিহারীর একটা কথাও ওর কানে গেল কিনা সন্দেহ। শ্রবণা আর নিজেকে সামলাতে পারে না। দু-হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ে সোফায়। থর থর করে কাঁপছে তার সারা দেহ। কান্নার ঝোড়ো হাওয়ায় ঐ নারকেল গাছের মাথাটার মত আছাড়ি পিছাড়ি খেতে ইচ্ছা জাগছে তার।

ঠিক তখনই একটা ট্যাক্সি এসে থামল বাড়ির দরজায়। বঙ্কু ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আর লোকলজ্জার বালাই নেই। শ্রবণা ছুটে এল প্রিয়দর্শীর কাছে। জোর করে এদিকে ফিরিয়ে দেয় প্রিয়কে। দু-হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে বললে, এমনি করে শোধ নিলে তুমি! তুমি নিষ্ঠুর! তুমি—

আবার কান্নায় ভেঙে পড়ে শ্রবণা। প্রিয়র বুকে মুখ লুটিয়ে।

তিলমাত্র চেতনা জাগল না প্রিয়দর্শীর।

দূর দিগন্তের দিকে দৃষ্টি মেলে সে তেমনি তাকিয়ে থাকে।

পরমুহূর্তেই ঘরে ঢুকলেন ডাক্তার সদারঙ্গনী, সুরযভাই আর বঙ্কু। সদারঙ্গনী বলে ওঠেন, এইতো, তুমিও এসে গেছ!

শ্রবণা প্রিয়দর্শীকে ছেড়ে ছুটে যায় ডাক্তার সাহেবের দিকে। হঠাৎ জড়িয়ে ধরে তাঁকে। বলে, এ কী হল ডাক্তার সা'ব?

এ আক্রমণের জন্য বোধকরি প্রস্তুত ছিলেন না ডাক্তার সাহেব। পড়ে যেতে যেতে সামলে নিয়ে বলেন, কী হল?

প্রিয়দর্শী এগিয়ে এসে সদারঙ্গনীকে প্রণাম করে, বলে, ও আবার পাগলী হয়ে গেছে স্যার!

—তার মানে? ডাক্তার সাহেব অবাক হয়ে যান।

বঙ্কু খিল খিল করে হেসে ওঠে। দু-হাতে তলপেট চেপে ধরে বসে পড়ে একেবারে মেঝেতে।

শ্রবণা একে একে সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে। তারপর বলে ঐ একই কথা, এর মানে?

কৈফিয়ৎটা বঙ্কুই দাখিল করে। ডাক্তার সাহেব আর সুরযভাইয়ের দিকে ফিরে কোনক্রমে হাসি চেপে বলে, মানে আর কিছু নয় স্যার, পাগলী সেজে ভাবীজী ভাইসাবকে এতদিন একেবারে বুড়বক বানিয়ে রেখেছিলেন, আজ তাই ভাইসাব তার বদলা নিলেন আর কি! ও কিছু নয়, চলুন আমরা সবাই উপরে যাই। শাহজাহান সা'ব বোধহয় এতক্ষণে একা একা হাঁপিয়ে উঠেছেন।

ডাক্তার সাহেব হো হো করে হেসে ওঠেন।

সুরযভাই ও বুঝে নিয়েছে বঙ্কু এতক্ষণ শ্রবণাকে নিয়ে মজা মারছিল। সেও হেসে বলে, চলুন, সবাই তাহলে উপরে যাই।

ডাক্তার সাহেব বলেন, চলুন, আপাতত আমরা তিনজনেই যাই। ওদের দুজনের একটা বোঝাপড়া বাকি আছে মনে হচ্ছে। দুটোই বদ্ধ পাগল তো!

ওসব পাগলের কারবারে আমাদের থাকা ঠিক নয় ; আসুন।

ওঁরা তিনজনে বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে।

যাবার সময় বন্ধুবিহারী দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যায়।

শ্রবণা প্রিয়দর্শীর দিকে এক পা অগ্রসর হতেই দেখে প্রিয়দর্শী দ্বারের দিকে আঙুল তুলে কি যেন দেখাচ্ছে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে শ্রবণা। পিছন ফিরে দেখে বন্ধ-দরজা একটু ফাঁক হয়ে গেছে। বন্ধুর মুণ্ডুটা বেরিয়ে আছে শুধু।

শ্রবণা ফিরতেই মুণ্ডুটা অন্তর্হিত হয়।

শ্রবণা দরজায় ছিটকিনিটা বন্ধ করে দেয়।